চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস এম-এ, ডি-লিট্

৪৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড
ওরিয়েণ্ট
কলিকাতা-নয়

আমার কৈশোর-জীবনের

বাঁকুড়া জিলা-স্কুলের—

৺ পান্নালাল সেনগুপ্ত বি-এস-সি, বি-টি,

শ্রীযুত মহাদেব রায় এম-এ,

শ্রীযুত হরিপদ ভট্টাচার্য এম-এ,

শ্রীযুত রমণীমোহন চৌধুরী এম-এ, বি-টি

শ্রীযুত আদ্যাচরণ সেন বি-এ, বি-টি

শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার মিত্র এম-এ, বি-টি,

৺ জে. সি. গুহ এম-এ, বি-এল, বি-টি, টি-ডি

—প্রমুখ শিক্ষকবর্গের

আদর্শ চারিত্র্য ও শিক্ষণ স্মরণে

এই গ্রন্থ

উৎসর্গিত হ'ল

"চোখে-দেখা এ বিশ্বের গভীর সুদূরে
রূপের অদৃশ্য অন্তঃপুরে
ছন্দের মন্দিরে বসি রেখা-জাদুকর কাল
আকাশে আকাশে নিত্য প্রসারে বস্তুর ইন্দ্রজাল"

বিষয়-সূচী

অয়ং তত্ত্বে অসৌ মন্ত্রে এষ বৃত্তে চ পণ্ডিতঃ।
আরতিস্তু বরা মন্যে চিত্রগীতপরাত্মনি॥

এবার শুদ্ধ-সৌন্দর্যের দিক থেকে কবিকৃতির আলোচনা করা গেল। কবিতা ধ'রে ধ'রে নির্মাণ-কৌশল বিশ্লেষণ করা হয়েছে, প্রধান এবং সুপরিচিত প্রায় সমস্ত কবিতাই সৌন্দর্য-বিচারে পরীক্ষিত হয়েছে। তবু এও দিগ্‌দর্শন মাত্র। স্বভাবতই সামগ্রিক বা কেন্দ্রগত কোনও ভাবসূত্রের দিকে এবার লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখার প্রয়োজন হয় নি। আমাদের ধারণা, কবির রচনা সম্বন্ধে এ-ধরনের বিস্তৃত আলোচনা নূতন। বিদগ্ধ পাঠকের ঔৎসুক্য বর্ধিত করলে শ্রম সফল মনে করব।

স্নেহাস্পদ অধ্যাপক মিহিরকুমার মজুমদার এর নাম-নির্দেশ অংশ প্রস্তুত ক'রে দিয়েছেন। 'গ্রন্থ-নিলয়' কর্তৃপক্ষ উৎসাহিত না করলে লিখতে বিলম্ব হ'ত।

—গ্রন্থকার

প্রাক্-কথা

[১]

কাব্য-সৌন্দর্যের মূলতত্ত্ব

কাব্যস্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং চিত্র এবং সংগীতের মিলনের কথা বলেছেন। কাব্য সম্পর্কে কথাটি বিশেষ মূল্যবান্। চিত্রশিল্পে শুধু চিত্র আছে। তার আবেদন রঙ্ ও রেখার মধ্যবর্তিতায়, জ্ঞানে এবং প্রজ্ঞানময় আনন্দে। সংগীতেও তাই, কিন্তু সুরের প্রাধান্যে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্তিতায়। অথচ কাব্যে, বা আরও ব্যাপকভাবে সাহিত্যে, চিত্র এবং সংগীত দুয়েরই অবস্থান। সাহিত্য যে-চিত্র প্রদর্শন করে তা নির্মাণ করতে হয় ভাষায়। ভাষার যে-বিশেষ প্রকাশ চিত্রনির্মাণ করতে সক্ষম তাকে সাধারণভাবে বলা যায় অলংকার। সে অলংকার অতি সাধারণ বাস্তব বর্ণনার মধ্যেও থাকতে পারে, আবার আতিশয্যময় কাল্পনিক অর্থযোজনার মধ্যেও থাকতে পারে। মোট কথা, কাব্যগত অর্থের চমৎকারিতা যেখানে, যেমন উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা-Epigram প্রভৃতির মধ্যে, সেখানেই বাক্যের চিত্ররীতি। এ রীতি সাহিত্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক, কারণ, যে-প্রবন্ধ শাস্ত্রের কথা বলে না, সাংসারিক ও সামাজিক স্থূল প্রয়োজনের নির্বাহ যার গঠনের কারণ নয়, এমন বিষয়ের বিন্যাস লৌকিকেতর ভাষারীতিরই অপেক্ষা রাখে। কিন্তু এই চিত্র-সম্পদ্ ছাড়া সাহিত্যিক ভাষার আরও একটি সম্পদ্ রয়েছে, সে হ'ল তার সুরধর্মিতা। সংগীতের যেমন সুর, এখানে তেমনি ছন্দ, ধ্বনি-সুষমা, বাক্যে শব্দ-যোজনার, পদস্থাপনের বৈচিত্র্য। গদ্যরীতিতে রচিত গল্প উপন্যাসাদির ক্ষেত্রে এই সব সৌন্দয প্রকট হয়ে ওঠে ঘটনা ও মনস্তত্ত্বের বর্ণন-বৈচিত্র্যে, পরিবেশ-রচনায় এবং গল্পকারের মৌলিক স্টাইলের মধ্যে। চিত্র এবং সংগীতের মিলনে যা দাঁড়ায় তা কি একক চিত্র বা একক সংগীত থেকে দুষ্কর এবং মূল্যবান্ নয় ?

ভাববাদী রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনায় সাহিত্যের লৌকিকেতর ইঙ্গিতময়তার বিষয়টি নানাভাবে বারংবার জানাতে চেয়েছেন। কাব্যের সৌন্দর্যলোক মর্ত্যের ভাববিক্ষুব্ধ, বিষয়-সংস্পর্শে আবিল জগৎ থেকে অবশ্যই স্বতন্ত্র। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে বস্তুময়তা এর প্রত্যক্ষ ভিত্তি। ঠিক

যেমন জীবসাধারণ স্থূল মানবদেহের সঙ্গে একাধারেই রয়েছে মন, বুদ্ধি, আনন্দময় চৈতন্য। সাহিত্য রহস্যময়। রহস্যমাত্রেই অসীম, যেহেতু প্রত্যক্ষ বস্তু-সীমাবদ্ধ বুদ্ধির আয়ত্তের বাইরে। আলংকারিকদের মতে অ-লৌকিক অর্থাৎ লৌকিক বিষয় থেকে ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

রচি শুধু অসীমের সীমা।
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গ'ড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।

তখন অসীম কাব্যলোককেই বুঝাতে চান, "অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ" প্রভৃতির সীমা এবং অসীম, তাঁর রূপ ও ভাবের নিবিড় সম্পর্ক উপলব্ধিরই কথা ব্যক্ত করছে, আধ্যাত্মিক বিষয় নয়। রবীন্দ্রনাথের অসীম বা অরূপ তূরীয় কোনও সত্তা নয়, তা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষতার মধ্যে একান্তভাবে সীমাবদ্ধ, এ তাঁর কাব্যিক উপলব্ধিরই নামান্তর মাত্র। ফলতঃ একথা বলতেই হয় যে রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী হ'লেও যে-পরিমাণে কবি সেই পরিমাণে রূপাত্মক ভাববিলাসী, এমন কি রূপসর্বস্ব বললেও ঐ কথার বিপরীত উক্তির মত এতটা ভ্রমাত্মক হয় না। রূপের সাধক ব'লেই রবীন্দ্রনাথ কবি, শিল্পী এবং এই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ভারতে শুদ্ধ ভাবসাধকের অপ্রাচুর্য নেই। কেবল তাদেরই একজন হ'লে রবীন্দ্রনাথ আমাদের এতখানি হৃদয় জুড়ে বসতেন না। কবি এবং ভাষাশিল্পী, রূপের সন্ধানী এবং চিত্রগীতের প্রতিষ্ঠাতা সমার্থক শব্দে বর্ণিত একই ব্যক্তি। কাব্য-নির্মাণে এবং সমালোচনে রবীন্দ্রনাথের রূপানুগত্য সুপরিচিত। আমরা কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করছি:

"ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিষ মিশাইয়া থাকে, চিত্র এবং সংগীত।

কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়। সাহিত্যে এই ছবি আঁকার সীমা নাই। উপমা-তুলনা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়। 'দেখিবারে আঁখি-পাখি ধায়' এই এক কথায় বলরামদাস কী না বলিয়াছেন?"

"কিন্তু ভাবের বিষয় সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তাহা যে মূর্তিকে আশ্রয় করে তাহা হইতে আর বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।......সেইজন্য রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে; ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে।" [সাহিত্য]

"হে আবিঃ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও, তুমি পরিপূর্ণ, তুমি আনন্দ। তোমার রূপই আনন্দরূপ।"

"বিষয়ে ভাবে বাক্যে ছন্দে নিবিড় সম্মেলনের দ্বারা যদি এই কাব্যে একের রূপ পূর্ণ হয়ে দেখা দেয়,……এই কাব্যে আমরা সৃষ্টিলীলাকে স্বীকার করবো।

গোলাপ ফুলে আমরা আনন্দ পাই। বর্ণে গন্ধে রূপে রেখায় এই ফুলে আমরা একের সুষমা দেখি।"

"এর থেকেই বোঝা যাবে, সাহিত্যতত্ত্বকে অলংকারশাস্ত্র কেন বলা হয়। সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব, যাকে প্রকাশ করতে গেলেই অলংকার আপনি আসে, তর্কে যার প্রকাশ নেই, সেই হল সাহিত্যের। অলংকার জিনিষটাই চরমের প্রতিরূপ। মা শিশুর মধ্যে পান রসবোধের চরমতা—তাঁর সেই একান্ত বোধটিকে সহজ সজ্জাতেই শিশুর দেহে অনু-প্রকাশিত করে দেন। ভৃত্যকে দেখি প্রয়োজনের বাঁধা সীমানায়, বাঁধা বেতনেই তার মূল্য শোধ হয়। বন্ধুকে দেখি অসীমে, তাই আপনি জেগে ওঠে ভাষায় অলংকার, কণ্ঠের সুরে অলংকার, হাসিতে অলংকার, ব্যবহারে অলংকার। সাহিত্যে এই বন্ধুর কথা অলংকৃত বাণীতে। এই অলংকৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য।" [সাহিত্যের পথে]

কেবল রূপের দিক থেকে কাব্য-বিবেচন বিষয়ে সংস্কৃত আলংকারিকদের জুড়ি নেই। সৌন্দর্যমলংকারঃ। প্রাচীন লেখকদের এই সৌন্দর্যের দৃষ্টি দিকে দিকে প্রসারিত। তাই শাস্ত্রাদির কথা, ধর্মাচরণের বিষয়, তাঁদের দেবতার স্তব-স্তুতিও ছন্দে অনুপ্রাসে অর্থগৌরবে ঝলমল করছে। বিশুদ্ধ কাব্যের তো কথাই নাই। এই দিক থেকে তাঁদের গদ্যও কাব্য ; যাকে হৃদয়ভাবুকতার বিষয় বলি, পরে 'রস' শ্রেণীতে যাকে বিন্যস্ত করা হয়েছে তাও অপূর্ব সৌন্দর্যের বিষয় ব'লেই প্রাচীনদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে। প্রাচীনদের একটি কবি-প্রশস্তি দেখা যাক—উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্। নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ। মাঘের কোনও বন্ধু লিখলেও একে মহাকবিচতুষ্টয়ের এককথায় স্বরূপ-নির্দেশও বলা যেতে পারে। কীভাবে এঁদের স্বরূপ নির্দিষ্ট হ'ল ? রসের কথা দিয়ে ? শৃঙ্গারাদি রসের উপস্থাপনে কার নৈপুণ্য কতটুকু তা ভাষায় যদি বা জানানো যায়, তা দিয়ে কবিব্যক্তিদের পৃথক পরিচয় নির্ণয় কতদূর সম্ভব ? যে-সৌন্দর্য উপলব্ধির বস্তু, যার বিশেষ

বিশেষ রূপ ভাষায় এবং ভঙ্গিতে নিবদ্ধ, সৌন্দর্য এবং প্রকাশ যেখানে অভিন্ন, রূপ এবং অরূপ একাত্ম, সেখানে রূপের কথা দিয়েই তো সৌন্দর্যময় অরূপ বর্ণনীয়। রূপের উপাসক আলংকারিকদের কথা থাক। দেখা যাক কবির স্বগত ভাষণ। কালিদাসের পর ভারতের সর্বজনপ্রিয় কবি জয়দেব তাঁর অভিনব চাতুর্যময় গীতিকাব্যগুলি সম্পর্কে কী বলছেন? তিনি উচ্চগ্রামে বাঁধা শৃঙ্গাররসভাবুকতার বিষয় জানাচ্ছেন না, বলছেন—মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং। যে পদসমষ্টি শুধু মধুর নয় অর্থাৎ মাধুর্যগুণ-বিশিষ্ট নয়, কোমলতা এবং কান্ততার মিশ্রণে যা নিত্য নব নব রূপে উদ্ভাসিত এমন, যা মধুর থেকেও অনির্বচনীয় মধুর। বস্তুতঃ জয়দেব যা সৃষ্টি করলেন সে কি ভাষা? কেবল ভাষা কি এমন আশ্চর্য চমৎকাররূপে স্বাদিত হতে পারে? সেখানে রসের উপর রূপের আধিপত্য, বলা হচ্ছে, যদি রূপে নিমগ্ন হবার বাসনা একান্ত হয়, যদি শর্করা, মধু এবং প্রিয়ার অধর প্রভৃতির সঙ্গে তুলনীয় রসের প্রীতি ভুলতে চাও তো এস, এই বচনরচনা শ্রবণ কর।[১] কবি গোবিন্দদাসের রূপাভিলাষ স্মরণ করা যাক—

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়গণে ভুজযুগ মণ্ডিত
পহিরণ নীল নিচোল॥

এটি একটি সংস্কৃত কবিতার অনুবাদী, কিন্তু গঠনের দিক থেকে শতগুণ উন্নত। যাঁর শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্নায়ু দুর্বল নয় তিনিই বুঝবেন ম এবং ন এর অনুপ্রাসে কী রূপমোহের সঞ্চার ঘটেছে, আর প্রতি পাদে নীল শব্দের বিন্যাসে শ্রীমতীর সুগৌর দেহে যে-মায়াঞ্জন ছায়া বিস্তার করেছে তার স্বরূপ উপলব্ধি করবেন অর্থবোধের পূর্ব থেকেই। সহজ-সাধক চণ্ডীদাস লৌকিক ভাষাতেই প্রীতির গৌরব সঞ্চার করলেন—'পিরিতি মিরিতি পিরিতি কীরিতি'। কাব্যের এই রূপোল্লাসেই কাব্যের অনুরাগের সীমা। সৌন্দর্য ছাড়া অনুরাগ আশ্রয়হীন। ব্রহ্ম সবিশেষ ব'লেই জীবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, নতুবা নিখিল বিশ্ব মহাশূন্যতায় পর্যবসিত হয়। আমাদের ব্রহ্ম সৃষ্টির অধীন, রসও রূপের।

বিশেষভাবে রূপের দিক থেকে কাব্যস্বরূপ দর্শন করেছেন প্রাচীনের একজন রূপদর্শী। তাঁর নাম কুন্তক। তাঁর পূর্বতন আলংকারিকেরা রূপগত

---

১ 'সাধ্বী মাধ্বীক চিন্তা ন ভবতি ভবতঃ' ইত্যাদি

আতিশয্য অথবা রচনাবিন্যাসের বক্রতার দিক থেকে কাব্যকে যদিও পরীক্ষা করেছিলেন, তাঁদের দর্শনের মধ্যে এমন কোনও অপূর্ণতা ছিল যার জন্য তাঁরা শুধু অলংকার-রীতিকেই ভালোবাসেন, কাব্যকে নয়, এমন ধারণার প্রশ্রয় ঘটেছিল। কুন্তক তাঁর পূর্বতন সৌন্দর্যদর্শীদের অসম্পূর্ণতার বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম ক'রে এমন একটি সৌন্দর্যদর্শন-পদ্ধতি গড়ে তোলার প্রয়াস করেছিলেন যাকে অবলম্বন ক'রে কাব্যচমৎকৃতির স্বরূপ এবং কারণ অনেকটা প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ করা যায়, কাব্য এবং অকাব্যকে যা দিয়ে ভালো ক'রে চিনে নেওয়া যায়। এর নাম তিনি পূর্বসূরী ভামহের অনুসরণে যদিচ 'বক্রোক্তি'ই বিহিত করেছেন, কাব্যস্বরূপ আলোচনে তিনি একে খুব ব্যাপকভাবেই গ্রহণ করেছেন। ভামহের বিশ্লেষণে যেটুকু অপূর্ণতা ছিল তাকে তিনি সম্পূর্ণ করেছেন। ভামহ শুধু অলংকারসারস্বরূপ ব'লে এর বর্ণনা করেছেন। কুন্তকের বিবেচনে পদবিন্যাস, বিশিষ্ট পদের প্রয়োগ, উপসর্গ এবং প্রত্যয়াদির প্রয়োগও গৃহীত হয়েছে। বিশেষ ছন্দকেও তিনি প্রকাশের সমগ্রতার অঙ্গ ব'লে গ্রহণ করেছেন এবং 'শব্দার্থের সাহিত্য' নামক ব্যাপারটিকে নানা দিক দিয়ে এমনভাবে দেখেছেন যাতে ক'রে আধুনিক সমালোচন-পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর পদ্ধতির নানান্ সাদৃশ্য পরিস্ফুট হয়েছে। এছাড়া তিনি কাব্যবস্তুর প্রত্যক্ষ ভাষা এবং অপ্রত্যক্ষ সংকেতময়তার মূলে বিশিষ্ট কবি-কল্পনার ক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। কারণ তিনি দেখেছেন যে, বিষয় এক হলেও কবিকল্পনার পার্থক্যে, কবি-ব্যক্তির ভিন্নতার জন্য কাব্যসৌন্দর্য পৃথক হয়ে পড়ে, এর অস্তিত্ব অনস্তিত্ব নিয়ে কবি এবং অকবির পার্থক্যও সূচিত হয়। ফলতঃ অন্তঃসারশূন্য কবিদের বহিরঙ্গ বচন-চাতুর্য এবং চমৎকৃতিহীন অলংকার প্রয়োগের অতিরেকও তাঁর 'শব্দার্থের বিশিষ্ট সাহিত্য' অনুধাবনের মধ্যে ধরা পড়ে যায়।

এই মূল্যবান আলংকারিক অভিমতটিকে রবীন্দ্র-কথিত চিত্র ও সংগীতের সম্মেলন বিষয়ক অভিপ্রায়ের সঙ্গে একাত্ম ক'রে বেশ ভালোভাবেই দেখা যায়। কুন্তক বলছেন—শব্দার্থের বিশিষ্ট সাহিত্য। শব্দ-বিন্যাস এমন হবে যে কবির অভিপ্রেত অর্থটিকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলবে, আর অর্থ এমন হবে না যে চমৎকারাতিশয়কে ত্যাগ ক'রে শুষ্ক তথ্য বা তত্ত্বের প্রকাশ বা ব্যঞ্জনা ঘটাবে। শব্দের বিচিত্র বিন্যাসই তত্ত্ব থেকে সৌন্দর্যকে রক্ষা করবে। আবার শব্দের সঙ্গে শব্দের, এক অর্থের সঙ্গে আর এক অর্থের সুন্দর সম্পর্কও

স্থাপিত হতে বিলম্ব হবে না। এতেই সাহিত্যিক সৌন্দর্য উচ্ছলিত হবে, সাহিত্য এবং সাহিত্যকল্প বচনসংগ্রহের পার্থক্য পরিস্ফুট হবে। কুন্তক এমনও বলছেন যে অর্থ অনুধাবনের পূর্বেই মিলিত সাহিত্য চিত্তে অনির্বচনীয় আহ্লাদের সঞ্চার করে, যেমন করে স্বরসংবলিত গান। 'বহুদিন হ'ল কোন্ ফাল্গুনে ছিনু যবে তব ভরসায়' ইত্যাদিতে কোন্ ব্যাপারটি কবি বোঝাতে চাইছেন তা না জানলেও আনন্দ কিছুমাত্র বাধিত হয় না। অস্পষ্ট অর্থেই বরং চিত্ত অধিকতর আকৃষ্ট হয়। যে ক্ষণিকা কবিকে ছলনা করেছে নববসন্তে, তার প্রেমপূর্ণ শ্যামগম্ভীর রূপের স্পর্শে কবি অভিভূত হয়েছেন এই চিত্তা-কর্ষক অস্পষ্ট বার্তা পাঠকের হৃদয়ে গৌড়-সারঙ্ রাগের সুধাবিন্দু বিকীর্ণ করে। ব্যক্ত, অব্যক্ত, ভাষার যাবতীয় বৈচিত্র্য শব্দার্থ-সাহিত্য বা এককথায় বক্রোক্তির মধ্যে এইভাবে গৃহীত হতে পারে। স্ফুটভাবে যে সব অলংকার আলোচিত হয়েছে তার সংখ্যা সামান্য—কম-বেশি একশ। আর বক্রোক্তির বিচারে অলংকার অনন্ত, তার বিভাগও বহুতর। দেশে কালে এবং কবি হিসেবেও এর অনন্ত ভঙ্গি। অতএব বক্রোক্তিই ভাষার দৃষ্ট অদৃষ্ট যাবতীয় অলংকরণের সারস্বরূপ, কাব্যবৈচিত্রীর আধার, রসাত্মক আনন্দ বিশেষের সঙ্গে অদ্বৈত সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই অপরূপ কাব্যবাণী কোনও তথ্য বহন করে না, শাস্ত্রাদিতে ব্যবহার করলে লক্ষ্য চ্যুতি ঘটায় আর পুনশ্চ এর উপর অলংকরণ করলে অকাব্যের স্থূলতাই প্রকট হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন উঠতে পারে ভাষার এই চমৎকারাতিশয় সিদ্ধ হয় কিভাবে? তার উত্তরে এই বলা যায় যে কবি কল্পনাশক্তি দিয়েই শব্দ বাক্য প্রবন্ধের যাবতীয় বক্রতার সমাধান করেন। ঠিক ঠিক শব্দের চয়ন, প্রত্যয়াদি দিয়ে পদ গঠন, বাক্যে বিভিন্ন পদের রমণীয় বিন্যাস, আদ্যন্ত পরিণামে বৃত্তের গ্রন্থন, ঘটনা ও চরিত্রের ঔচিত্যময় উপস্থাপন এ সবের কারক হলেন সেই কবিপুরুষ যাঁর প্রচ্ছন্ন সঞ্চরণ সাহিত্যের সর্বত্র অনুভববেদ্য হয়ে ওঠে। এই শক্তির তারতম্য অনুসারেই উত্তম এবং অনুত্তম কবিখ্যাতি। কবি-প্রতিভা অনন্যপরতন্ত্র, প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের অতিরিক্ত, নৈসর্গিক। আর এই প্রতিভারই বিশেষ প্রকৃতি অনুযায়ী, কবিস্বভাবের ভিন্নতার জন্য কাব্যের প্রকাশরূপ হয় অনন্ত। ফলতঃ এই দাঁড়ায় যে সাহিত্য-পরীক্ষণের কয়েকটি অতি স্থূল নীতি ছাড়া কোনও স্থির নিয়মের নিরিখে সুকবি-সম্প্রদায়ের নির্মাণ বিচারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। দেশের ঐতিহ্য, কালের ধারা যদিচ আলোচনার সূত্রে চিহ্নিত করা

যায়ও, অনির্ণেয় কবি-প্রকৃতিকে ধরবে কোন্ শাস্ত্র? রবীন্দ্র কবি-প্রতিভা শতাংশের কত অংশে পরিবেশ-নির্ভর? একটি আশ্চর্য কবিবাণীর পরিশীলনে প্রত্যক্ষের যাবতীর রমণীয়তার সঙ্গে অপ্রত্যক্ষের চকিত স্পর্শ একত্র তাঁর কাব্যে যেভাবে লাভ করা যায় তার কী পরিমাণ ঠাকুরবাড়ীর সংসার এবং তৎকালীন বাঙ্‌লা দেশের রচনা? আজকালকার কোন কোন অভিমতের অনুসরণে সমাজ ও পরিবেশের অতিব্যাপ্ত ক্রিয়া সন্দর্শন কি কাকতালীয় ন্যায়ে অথবা কার্যদৃষ্টে তৎসদৃশ কারণ অনুসন্ধানে পর্যবসিত হচ্ছে না। অতএব প্রত্যক্ষ কবিবচনকেই কাব্য-কীর্তির মৌল সম্পদ রূপে দেখা উচিত। কিন্তু তথাপি রবীন্দ্র কবি-প্রতিভা কী পরিমাণে ঐতিহ্য-আশ্রিত এবং তৎকাল-সম্বন্ধী তাব বিশ্লেষণ ও স্বরূপ-নির্ণয় প্রয়োজনীয়, যেহেতু কবি-প্রতিভার বিশিষ্ট প্রকৃতি গঠনে জাতির সংস্কার এবং অভিলাষের অগণনীয় প্রভাব থাকে। আমাদের অধ্যয়নে প্রত্যক্ষ পরিবেশের চেয়ে অতীতের ভাবসংস্কৃতিই বরং কবিচিত্তে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকে।

[২]

বাঙ্‌লার কাব্য-সংস্কার ও রবীন্দ্রনাথ

জাতি হিসাবে বাঙালি বিমিশ্র। তার গঠনে অস্ট্রিক গোষ্ঠী ও দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের নানান দল ও উপদলের বিচিত্র সংযোগ। আর্যরক্ত-সম্পর্ক বাঙ্‌লায় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, তাও পরোক্ষ, অর্থাৎ পশ্চিম-ভারতীয় বহু মিশ্রণ থেকে মিশ্রিত। মৌর্য যুগের স্বল্প পূর্ব থেকে আর্যভাষা এবং পশ্চিম ভারতের ও নিকটবর্তী পশ্চিম দেশের আর্য-অনার্য মিশ্র সংস্কৃতি বাঙ্‌লায় প্রবেশ করতে থাকে। তাব পূর্বেকাব বাঙ্‌লার ইতিহাস কিছু অনুমান এবং অনেকটা কল্পনাব বিষয়। তবু বলা যায় মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, জপ-ধ্যান, বৃক্ষ-প্রস্তর-সর্পপূজা, মৃতের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন, জন্মান্তরে বিশ্বাস, পুরুষকার অপেক্ষা দৈবের উপর আস্থা—এই সব নিয়ে এবং বাস্তব জীবন এবং সেই জীবনের অতীত বস্তু দুয়েরই প্রতি সমান আগ্রহ পোষণ ক'রে অতীতের আমাদের জীবন কেটেছে। ভাষার দ্বারা বিজয়ই আর্যদের প্রধান ভারত-বিজয়। তারপর তাদের সমাজ সংগঠনের প্রভাব, তার পর ধর্মীয়তার। বস্তুতঃ ধর্ম এবং বিশ্বাস এবং হৃদয়ভাবুকতাময় সংস্কৃতিতে আর্যেরাই

ব্যঞ্জনার চেয়ে বাচকতাকেই প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে, কারণ, ঘটনা ও চরিত্রের সম্পর্ক ও অগ্রগতিকে সুপরিস্ফুট করাই এর ভাষার লক্ষ্য। মঙ্গল-কাব্যে জীবনকে চাওয়া হয়েছে ব'লে সংসার ও সমাজের বর্ণনার পুনঃপুনঃ উদ্দীপন এর প্রাবন্ধিক বৈচিত্র্যের বিরোধী তো হয়ই নাই, বরংচ উজ্জ্বলতার কারণ হয়েছে। অন্যপক্ষে, একই সময়ে উদ্ভূত পাশাপাশি অবস্থিত পদাবলী দেখা যাক।

পদাবলী একান্তভাবে অন্তর্মুখ। এবং সেই সঙ্গে রোম্যান্টিক এই কারণে যে, যে-প্রণয়ভাবুকতা এর অবলম্বন তাতে অপ্রাপণীয় সুদূরের সঙ্গে বিচ্ছেদ ও মিলন ব্যাকুলতা যাবতীয় সূক্ষ্ম বিলাসবৈচিত্র্য সহ বর্ণিত হয়েছে। 'মনের ভুবনে নিভৃত গোপনে' যে সব আকাঙ্ক্ষার যাওয়া-আসা, বৈষ্ণব কবিরা তার কিছুই অস্পৃষ্ট রাখেন নি। পদাবলীর এই মনোবিলাস মঙ্গলকাব্যিক ঘাত-প্রতিঘাত থেকে স্বতন্ত্র বস্তু। এর ভাষাভঙ্গির মার্জন-ঘর্ষণ, সংকেত-প্রাধান্য, ধ্বনিবক্রতা, শব্দচিত্রযোজনা প্রভৃতি গুণ আখ্যানকাব্যের প্রসারিত বাক্রীতি এবং ব্যাপক হৃদয়সংঘাতের সংকেত থেকে ভিন্নজাতীয়। পদাবলীর লীলা-বর্ণনে ক্ষীণ কাহিনীর সূত্র থাকলেও গীতিমুখ্যতাকে অতিক্রম ক'রে বর্ণন-বৈচিত্র্যে তার পর্যবসান নয়। তা ছাড়া, বিচ্ছিন্ন পদরচনা এবং ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ নিবেদনের এবং বিচ্ছেদভাবুকতার পদও এই শাখায় কম নয়। নির্মাণভঙ্গি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় প্রতিটি পদ বিশেষ রূপানুসরণে গঠিত। এগুলির অবয়ব খুব দীর্ঘ নয়, আবার অতি সংক্ষিপ্তও নয়। অধিকাংশ রচনাই বারো থেকে ষোল পঙ্ক্তির। এরই মধ্যে কবিহৃদয় তার আনন্দ-বেদনাকে নিঃশেষিত করেছে। কি ব্রজবুলি কি বাঙ্লা উভয় পদ্ধতির রচনা সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। আর গীতের সুরে এদের প্রয়োগের ঔচিত্য আছে ব'লই নয়, এগুলির, বিশেষতঃ ব্রজবুলিতে নির্মিত পদের মসৃণতা ও লাবণ্যের জন্য, পাঠেও গীতসদৃশ এক রমণীয়তা চিত্তে পরিব্যাপ্ত হয়।

লক্ষ্য করতে হবে যে একই সঙ্গে এ দুই কাব্যধারা একই জাতির দুই বিরুদ্ধ প্রবৃত্তিকে তুষ্ট ও পুষ্ট করেছে। বাঙ্লা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস এ দুই প্রবণতার মর্মে রচিত হওয়া উচিত। এ দুটির একতরের উন্নতি-অবনতি এবং পারস্পরিক সংযোগ-সম্পর্কের ভিত্তিতে বাঙ্লা সাহিত্যের যুগবিভাগ চিহ্নিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লৌকিক কামনাময় মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে কামনাহীন অরূপাভিলাষের বাহ্য যোগ না থাকা সত্ত্বেও একই জাতীয় মানসের প্রকাশ

ব'লে এ দুয়ের পারস্পরিক মিলন-মিশ্রণও অসম্ভব হয়নি। কাব্য এবং অধ্যাত্মের মিলনের প্রাচীন দৃষ্টান্ত হ'ল রামায়ণ। রাধাকৃষ্ণপ্রীতিরস অনেক ক্ষেত্রেই মুখ্যতঃ কাব্যের আকৃতি থেকে উদ্ভূত হওয়া সম্ভবপর ও স্বাভাবিক। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর অভয়ামঙ্গল ও অন্নদামঙ্গলে কাব্যপ্রবৃত্তি এবং ভক্তি-ভাবুকতা একত্র স্থান পেয়েছে। ভারতচন্দ্রের রোম্যান্টিক কাব্যবুদ্ধি বিদ্যাসুন্দর আখ্যায়িকার যোজনায় পরিতৃপ্তি লাভ করেছে। কবিওয়ালাদের গানেও যথাসম্ভব কাব্য এবং ভক্তি মিশ্রিত। ক্রমে ভক্তির প্রভাবে মঙ্গলকাব্যের দেববৈশিষ্ট্য এবং মানুষের লৌকিক বাসনাময়তা বিলীন হয়েছে, কিন্তু জীবন-ভাবুকতা মৌলিক প্রবৃত্তি ব'লেই থেকে গেছে।

আধুনিক যুগ এই জীবনভাবুকতা ও অরূপভাবুকতার মিশ্রণের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করছে। সে পরিচয় রবীন্দ্রনাথে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানা কারণে যে-সব চারিত্রিক দোষ বাঙালির জীবনে ব্যাপ্ত হয়েছিল তাকে এক কথায় বলা যেতে পারে জড়তা। য়ুরোপীয় জীবনের স্পর্শে আমাদের চৈতন্যের যে জড়তামুক্তি ঘটল এইটিই আধুনিক কালের সর্বপ্রধান ঘটনা। ইংরেজি সাহিত্যও আমাদের সাহিত্য-বুদ্ধির জড়তা-মোচনে সহায়তা করেছে। এককালে যেমন করেছিল সুফিধর্ম আমাদের অবরুদ্ধ ঈশ্বরভক্তির দ্বার উন্মুক্ত করতে। নতুবা ইংরেজি সাহিত্য আত্যন্ত আমাদের সাহিত্যকে প্রভাবিত ক'রে রূপান্তরিত করে দিয়েছে এমন ধারণা অসম্যক্-দৃষ্টির পরিচায়ক। যেমন জাতির জীবনে, তেমনি সাহিত্যে, আত্মশক্তি-স্ফুরণের বা অভিব্যক্তির তত্ত্বকে স্বীকার করাই স্বচ্ছ অনাবিল বোধের নিদর্শন। ইংরেজদের জীবন এবং চিন্তা যেমন আমাদের বিলুপ্ত বিচার-বিবেক ফিরিয়ে দিয়েছিল তেমনি তাদের সাহিত্য সহায়ক শক্তিরূপে আমাদের বিস্মৃত জীবনভাবুকতা এবং অরূপ-চেতনা দুয়েরই উদ্বোধন ঘটিয়েছে। আমরা শেকস্‌পীয়রের কোন্ কোন্ গ্রন্থের অনুবাদ করেছি, কোন্ গ্রন্থে কোন্ চরিত্রের অনুসরণ করেছি অথবা কোন্ কবিতায় শেলির মত পাখা বিস্তার করেছি, স্কটের মত রোমান্সের জগৎ তুলে ধরেছি এই সব বিচার আমাদের প্রধান প্রধান সাহিত্যকর্মের পক্ষে নিষ্ঠুর বহিরঙ্গ বিচার। খুচরো ভাবে দেখতে গেলে এসব কথা আসতে পারে ঠিকই, কিন্তু সামগ্রিক বিচারে, জাতির ঐতিহ্যের সঙ্গে মৌলিক সৃষ্টির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য—এই বোধেরই প্রাথমিক প্রয়োজন। দুশ' বছর ধ'রে আমাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে ইংরেজেরা আমাদের প্রাচীন, সাম্প্রতিক অনেক

কিছু দেখিয়েছে, তা-ই আমরা দেখছি এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন আমাদের অশেষ উপকারে লেগেছে, একথা মাননীয় এবং স্মরণীয়, কিন্তু একথা ঠিক নয় যে আমাদের আমুল পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং ইংরেজেরা না এলে বিলম্বেও আমাদের জড়ত্বমুক্তি ঘটত না।

বস্তুতঃ জীবন এবং অরূপের সমন্বয়-সাধনই বাঙালির সমাজজীবনের আগ্রহ এবং বিচিত্র অবস্থা-পরম্পরার মধ্য দিয়ে সাহিত্যে সেই পথেই আমাদের যাত্রা। এই কারণেই জীবনসংঘাতময় শেকস্‌পীয়রের ধরনের নাটকের চেয়ে পৌরাণিক নাটক আমাদের প্রিয় হয়েছে, আর মধুসূদনের সুউচ্চ জীবন-ভাবুকতার কেন্দ্রে অবস্থিত যে গ্রীক ট্র্যাজেডির আদর্শ, তার সঙ্গে আমাদের ভাবময়তাই একত্র ধ্বনিত হয়েছে। তবু একথা জোরের সঙ্গেই উচ্চারণ করা যায় যে মধুসূদন জীবনেরই কবি, অরূপাভিলাষের নন। পাশ্চাত্ত্য স্পর্শের প্রথম উদ্দীপনায় এই জীবননিষ্ঠা উগ্রভাবে প্রদর্শিত হওয়াই স্বাভাবিক। এই ধরনের জীবনভাবুকতা আমাদের সাহিত্যেও নূতন, পূর্বতন মঙ্গলকাব্যিকতা থেকে স্বতন্ত্র, কিন্তু তা বাঙালির স্থায়ী জীবনপ্রীতির ঐতিহ্যের থেকে ভিন্নও নয়। নূতন রামায়ণকার কৃত্তিবাসেই কি জীবননিষ্ঠা কম ছিল? রক্ষোবংশের গৌরব বর্ণন এবং রাবণের কাছে রামের রাজনীতি শিক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে তার প্রকাশ। মধুসূদনের জীবনভাবুকতাকে আমরা অভিনন্দিত করেছি ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে জীবনাতীতের রহস্য দর্শনে উন্মুখ হয়ে গীতিকাব্যের মধ্যে আমরা একাধারে জীবন ও অরূপকে পেতে চেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের প্রত্যাশা আশাতীতভাবে পূর্ণ করেছেন এ বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই। এ সকল কথা সবিস্তারে আমাদের পূর্বেকার গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে।

প্রশ্ন আসে, যে-বাঙালিত্ব বা বাঙালিয়ানার বিষয় উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হ'ল তা কি ভারতীয়তা থেকে বিভিন্ন? রবীন্দ্রনাথ কি ভারতীয় রহস্যময় ভাব-সংস্কার ও কাব্য-সংস্কারের পরিচয় বহন করেন না? এর উত্তর এই যে, আমরা যে-পরিমাণে বাঙালি সেই পরিমাণে ভারতীয়ও। ভারতীয় রহস্যময় অরূপ-ভাবুকতার সঙ্গে বাঙলার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আর্যভাব বলতে যদি কিছু বোঝায় তা একান্ত প্রাচীন ভারতে সম্প্রদায়-বিশেষে আবদ্ধ ছিল। কালক্রমে অনার্য মননশীলতার মধ্যে তা বিলীন হয়ে পড়ে। আমরা যাকে ভারতীয়তা বলছি তা এই অনার্য-প্রধান মিলিত আর্য-অনার্য ভাব-সংস্কার। বাঙ্‌লার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতের যদি কিছু পার্থক্য খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে ছিল, নবম-দশক

শতাব্দীতে যে নূতন অধ্যাত্ম ভাবুকতা প্রারব্ধ হ'ল তাতে কাশ্মীর থেকে বাঙ্‌লা এবং দ্রাবিড় সমস্ত দেশই নিমজ্জিত হ'ল এবং ভারতীয়তা বলতে বঙ্গালত্ব থেকে খুব অসামান্য কিছু রইল না। মৌর্যযুগে এবং মোগলযুগে বাঙ্‌লার সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত এবং দৃঢ়ভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সারা ভারতের সামাজিক আকাঙ্ক্ষা অনেকটা একরূপতা লাভ করেছিল। তবু একীকরণ ঘটলেও বাঙালির স্বভাব-বৈশিষ্ট্য কিছু বজায় থেকেই গেছে। কোন্ জাতির না থাকে? বাঙ্‌লার ভূপ্রকৃতি এবং জীবনধারণ, এর নূতনের প্রতি আগ্রহ এবং সুদূরের প্রতি অজ্ঞাত আকর্ষণের প্রবলতা ভারতীয়তার মধ্যে বাঙ্‌লার অসামান্যতা নির্দেশ করে। জীবনকেও রাখতে চাই, আবার জীবনাতীতের বা আদর্শের জন্য জীবনকে তুচ্ছ করতেও দ্বিধা করি না—এরকম একটি অতিপ্রবল সংস্কার পুরাতন আমাদের তথা আধুনিক রবীন্দ্রনাথের। আমরা যেমন ভারতীয় হয়েও বাঙালি, রবীন্দ্রনাথও তাই। বস্তুতঃ বাঙ্‌লার 'আকাশ জল বাতাস আলো' ছাড়া রবীন্দ্রনাথকে ভাবাই যায় না, আর মধ্যবিত্ত বাঙালি-জীবনের আশা-ভরসা থেকেও কবিকে পৃথক্ ভাবে অনুভব করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয়তার বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু কবিতা লিখলেও এতে তাঁর বাঙালিত্বের অন্যথা ঘটে না। মনে রাখতে হবে, একালে প্রবল স্বাদেশিকতার উদ্বোধন এসকলের জন্য দায়ী। উপনিষৎ-প্রীতির কথা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়তার প্রতি বিশেষ আগ্রহের কথা কেউ যদি বোঝাতে চান তাঁকে এই বলে নিরস্ত কর: যেতে পারে যে উপনিষদের কোনও কোনও স্থান বাঙ্‌লার ভাবরসিকতা এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবুকতা থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয় ব'লে, সেগুলির উপর কবির আসক্তি স্বাভাবিক হয়েছে। মহর্ষির উপনিষৎ-চর্চা এ বিষয়ে নিমিত্তের কাজ করেছে। এ ছাড়া মনে রাখতে হবে উপনিষৎ-চর্চা কেবল একালেরই এবং রবীন্দ্রনাথেরই বিষয় নয়। বাঙ্‌লার বৈষ্ণব দার্শনিকেরা স্বমত স্থাপনের জন্য উপনিষদের বহু বাক্যের গ্রহণ ও নিজমতে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাছাড়া উপনিষদের প্রিয় কতকগুলি মাত্র মন্ত্রকে রবীন্দ্রনাথ নিজ কাব্যকল্পনার অনুকূলে গ্রহণ করেছিলেন। আর যদি প্রভাবের কথা ধরা যায় তাহ'লে বাউলদের ভাবুকতাকেই অগ্রবর্তী দেখতে হয়। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়তা তাঁর বাঙালিয়ানার মূল সংস্কারের বিরোধী কোনোকালেই হয়নি। এ-দুই সংগতভাবেই তাঁর মধ্যে মিশে গেছে।

পুনশ্চ বলতে হয়, কোনো জাতির বিশিষ্ট ভাব-সংস্কারই তার স্বকীয়তার নির্দেশক, আর বাঙালির ভাব-সংস্কারে ভারতীয়তার মিশ্রণ আজকের ঘটনা নয়। এজন্য ভারতীয়তা ও বঙ্গালত্ব এখন কতকটা একার্থক হয়ে পড়েছে। যেমন বলা যেতে পারে যে, ইংরেজ এবং অন্যান্য য়ুরোপীয়, জীবনাদর্শ এবং সাহিত্যের কতকগুলি প্রধান ব্যাপারে অপৃথক, যদিও ইংরেজের সঙ্গে ইতালীয়ের, এমনকি ইংরেজের সঙ্গে ফরাসির রুচি ও দৃষ্টিকোণের ভিন্নতা কম নয়। আবার ভারতীয়ের সঙ্গে ইংরেজের যে যে দিক থেকে ভিন্নতা, ঠিক সেই সেই দিক থেকে বাঙালির সঙ্গেও। আমাদের দৃষ্টিতে ইংরেজ এবং অন্যান্য য়ুরোপীয় যেমন এক শ্রেণীর মানুষ, ইংরেজের বা যে-কোনও য়ুরোপীয়ের দৃষ্টিতে ভারতীয় ও বাঙালি তেমনি সমার্থদ্যোতক। এই কারণেই য়ুরোপীয় ভাবসংস্কারের বাঙলা-হিন্দি-মারাঠি ভাষায় স্বাঙ্গীকরণ চলে না। অনুকরণ এবং অনুসরণ একটা সীমায় আবদ্ধ থাকে, সেই পর্যন্ত তার গতি।

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা তোলা যাক্। আমরা বাঙালি গতিশীলতার গর্ব করতে পারি। দূর অতীতে আর্যীকরণ সময় থেকে ভারতীয়তার যা ভালো আমরা আত্মস্থ করেছি, ইসলাম এবং বিশেষভাবে স্থফি-মতবাদ যখন এল জড়বৎ থাকিনি, আবার য়ুরোপীয় ভাবধারায় অভিস্নাত হয়ে আত্মবিকাশের পথ খুঁজে নিতে বিলম্ব করিনি। কিন্তু ইংরেজ? যারা দুশ' বৎসর আমাদের সঙ্গে কাটাতে বাধ্য' হয়েছে তাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে ভারতীয়তার প্রকাশ কই? তাদের সাহিত্যে ভাববিপ্লব আনতে পারে এমন নূতন এবং গ্রহণীয় কিছু কি আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে নেই? ভারতীয় ভাবরসিকতা ও স্বপ্নদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু মৌখিক ভাষণ এবং কোনও কোনও মনীষীর লিখিত গ্রন্থও যে নেই এমন নয়। কিন্তু য়ুরোপীয়, বিশেষভাবে ইংরেজদের কাব্যসংস্কারে তা আঘাত দিয়ে নূতন পথ উন্মুক্ত করেছে এমন প্রমাণ নেই কেন? কোনও কোনও ঔপন্যাসিকের লেখায় ভারতীয় বাবুর্চি অথবা বাবু বাঙালি অথবা শিখাধারী হিন্দুস্থানীর চিত্রই কি তাদের ভারতীয় সম্পর্কের নিদর্শন? আসলে ইংরেজেরা স্বকীয় ভাব-সংস্কারকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন ক'রে রয়েছে, তারা রক্ষণশীল। প্রাচ্য দর্শন ও সাহিত্য অষ্টাদশ শতাব্দে জার্মানীতে যে দার্শনিক নব ভাবুকতার প্রসার ঘটিয়েছিল তা থেকেই পশ্চিমের রোম্যান্টিক নবজাগরণের উদ্ভব, এমন কথা মাননীয় হ'লেও, এর চেয়ে প্রত্যক্ষতর সম্পর্কে সে-ভাব স্থায়ী এবং বিচিত্র হ'ল না কেন তা-ই বিবেচ্য। রবীন্দ্রনাথ আমাদের

মহৎ আশার কথা শুনিয়েছেন—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে' এবং শুধু কাব্যেই শোনান নি কার্যকরী শক্তি দিয়ে প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের ভাবগত মিলনের যে-সব প্রয়াস করেছেন তা কারো অবিদিত নয়। আবার নিজ কবিতার ইংরেজি অনুবাদ এবং মৌলিক ইংরেজি রচনা দিয়ে তিনি পরোক্ষভাবে ভারতীয়তার প্রসারে য়ুরোপীয় ভাব-পরিবর্তন বাস্তব ক'রে তুলতে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন, অথচ সাম্প্রতিক ইংরেজি সাহিত্য এ বিষয়ে বিস্ময়করভাবে মৌন। আমরা বলছিলাম, প্রত্যেক জাতিরই মৌলিক কতকগুলি সংস্কার অর্থাৎ স্থির বাসনা থাকে, সাহিত্যে নানাভাবে, কাল ও ঘটনার বৈচিত্র্য অনুসারে স্বল্প রূপান্তরিত আকৃতি নিয়ে সেই সংস্কারেরই আস্বাদন চলতে থাকে। ইংরেজি সাহিত্য একেবারে আমাদের সাহিত্য হয়ে ওঠেনি, লাট কর্জনের স্বপ্নও সার্থক হয় নি। আমরা এখন যে-কথা বলছি, কালক্রমে আমাদের উত্তরসূরীরা যখন জাতিতত্ত্ব, জাতীয় মানস এবং সেইসঙ্গে সাহিত্য-বাসনা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করবেন তখন আমাদের এই বৈশিষ্ট্যের বিষয় বহু প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে উপস্থাপিত করবেন এই বিশ্বাস রাখতে পারি।

প্রায় প্রসঙ্গান্তরে এসে পড়েছিলাম, এখন পূর্বকথায় ফিরে আসা যাক। রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবসংস্কারে প্রাচীন বাঙালির উত্তরসূরী সে-ভাব রূপহীন নয়। আমাদের অধ্যয়নে রূপ এবং ভাববিলাস যেহেতু একাত্ম সেইহেতু রূপেও রবীন্দ্রের ঐতিহ্যানুবর্তন লক্ষণীয়। দেখা যায়, প্রাচীন বাংলায় দুই ভিন্ন প্রকৃতির ছন্দোভঙ্গিকে আশ্রয় ক'রে দুই বিভিন্ন স্টাইল বর্তমান। একটি হ'ল অক্ষরমাত্রিক রীতির বাহকতায় লৌকিক সহজ এবং গদ্যানুগ রীতি, অন্যটি হল মাত্রাবৃত্তের আশ্রয়ে ধ্বনিবিলাসে পূর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতিমাত্রায় মোহকর কাব্যিক রীতি, যাকে নামে চিহ্নিত করা হয়েছে 'ব্রজবুলি' ব'লে। একটি অর্থচিত্র-প্রধান, একটি শব্দচিত্র-প্রধান। একটি আপামর জনসাধারণের কাহিনীমূলক অর্থদীপ্ত আনন্দবোধের তৃপ্তি সাধন করত, অন্যটি মুখ্যভাবে সুর এবং ধ্বনিঝংকারে স্বল্প সময়ের মধ্যেই রসিকচিত্তকে প্রত্যক্ষ এবং অর্থের অতীত রহস্যলোকে সঞ্চরণ করতে সাহায্য করত। ক্রমে পারস্পরিক প্রভাবের ফলে এই দুই রীতির মধ্যে অল্পস্বল্প পরিবর্তন আসে এবং বাঙালির হাতে ব্রজবুলি যেমন মূলকবি বিদ্যাপতির রচনা থেকে অধিকতর রমণীয় হয়, তেমনি ব্রজবুলির সংস্পর্শে বাঙ্‌লা রীতি লাবণ্য দীপ্তি ও কান্তি লাভ ক'রে গীতিকাব্যের উত্তম

বাহন হয়ে ওঠে। ব্রজবুলির কবিরা প্রয়োজন অনুসারে তৎসম এবং সমাসবদ্ধ শব্দের প্রয়োগেও দ্বিধা করেন নি। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর আখ্যান-কাব্যের ভাষারূপে পরিবর্তন এই ব্রজবুলিরই প্রত্যক্ষ প্রভাব বহন করছে। নূতন যুগে মধুসূদন পয়ার-ত্রিপদীতে প্রযুক্ত গদ্যাত্মক রীতির উপর নূতন কাব্য-সৌধ গড়লেন নিম্নবর্ণিত উপায়ে: (১) জটিল ও দীর্ঘবাক্য ব্যবহার ক'রে (২) তৎসম শব্দ, সমাসবদ্ধ (কখনও দৃঢ় কখনও শিথিলবন্ধ) পদ গঠন ক'রে (৩) মধ্যযুগের কবিভাষায় প্রযুক্ত এবং পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষায় দৃষ্ট নামধাতুর ব্যবহারকে সম্প্রসারিত ক'রে (৪) কদাচিৎ গ্রীক পদবিন্যাস বা ইংরেজি বাক্যরীতি অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে (৫) প্রচুর অলংকরণের সমাবেশ ক'রে। মধুসূদনের এই প্রয়াস যে সাধারণ ভাষার মধ্যে বক্রতা সঞ্চার করবার জন্যে এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কিন্তু সে হ'ল মহাকাব্যিক ভাষা। সুবৃহৎ নিসর্গ-পরিবেশ, মহত্তম চরিত্রের একাংশ, অসামান্য কার্য ও ঘটনাকে দুটি-একটি বক্রোক্তির ব্যবহারে প্রত্যক্ষদৃষ্টবৎ ক'রে তোলাই এ ভাষাবিন্যাসের কাজ। যেমন বলা যেতে পারে, "ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে, সাগর—মকরালয়" এই বর্ণনে সমুদ্রের এই বিশেষণটি পরে স্থাপিত হওয়াতে সমুদ্রের মহত্ত্ব এবং ভীষণতা প্রভৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রমীলার আবির্ভাব যে আশ্চর্য রমণীয় এবং বিস্ময়জনক তা ব্যঞ্জিত হয়েছে একটি সংক্ষিপ্ত অতিশয়োক্তির প্রয়োগে—

"চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির-বাহিরে।
নিশীথে কি উষা আসি উতরিলা হেথা?"

যেমন, প্রমীলার চরিত্রের একটি পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে—"রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী" প্রভৃতির মধ্যে। মধুসূদনের ভাষায় এরকম মহাকাব্যিক বর্ণনা যত্রতত্র। কখনও প্রত্যক্ষের সাহায্যে কখনও অপ্রত্যক্ষ বা উপমান বা মিথ্যার সাহায্যে প্রত্যক্ষকে ফুটিয়ে তোলাই এ ভাষার লক্ষ্য।

অপর পক্ষে, উচ্চ গীতিকাব্যের আদর্শই হ'ল অপ্রত্যক্ষতা। মধুসূদনীয় ভাষাভঙ্গিতে কাহিনীর অথবা অন্যবিধ বর্ণনময় ব্যাপারের প্রয়োজন যদিচ সিদ্ধ হ'ল, সুদূর ও অপ্রত্যক্ষের সংকেত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে ভিন্নতর পন্থার অনুসন্ধান করতেই হ'ল। স্বাভাবিকভাবে পদাবলীর নানাগুণ-সমৃদ্ধ লৌকিকেতর ভাষাভঙ্গি তাঁর আশ্রয় হ'ল। এরই উপর দাঁড়িয়ে আধুনিক কালের উপযোগী রোম্যান্টিক ভাষা তাঁকে গড়ে নিতে হয়েছে। এছাড়া

তাঁর উপায়ও ছিল না। তিনি রচনা করবেন গীতিকাব্য, রোম্যান্টিক কাব্য, এবং বাঙ্‌লায়—যে-সব বিষয়ে পূর্বেই আশ্চর্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সিদ্ধি ঘ'টে গেছে। সুতরাং আমাদের ঐতিহ্যই রবীন্দ্রনাথে কালোচিত প্রকাশ লাভ করেছে। লৌকিক এবং লৌকিকেতর কাব্যবিষয়ের মত দুই রীতির স্টাইলের উপরও রবীন্দ্রবচনেব ভিত্তি। এব সঙ্গে সংস্কৃত থেকে কখনও ধ্বনিময় কখনও ওজস্বী বাক্‌রীতি তাঁকে গ্রহণ ক'বে সৌন্দর্য-নির্মাণ যথাসম্ভব নিষ্পন্ন কবতে হয়েছে। বাঙ্‌লা এবং ভারতের ঐতিহ্য পূর্বেকার মত তাঁর মধ্যেও সমন্বিত হয়েছে। রবীন্দ্রেব ভাষাব আদর্শ রবীন্দ্রনাথই, এমন কথা বহিরঙ্গ বিচারে অবশ্য বলা যেতে পারে, কিন্তু উচ্চতর সমালোচনায় তাঁকে সৌন্দর্যস্রষ্টারূপে জাতীয় ঐতিহ্যেব অনুবর্তী ব'লে গণ্য করতে হবে, আব যেহেতু তিনি মহাকবি সেজন্য নূতনতর ঐতিহ্যেব স্রষ্টা রূপেও তাঁকে দেখতে হবে।

রবীন্দ্রের ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনা আকস্মিক নয়। এই অনুকরণ ঐতিহ্য-স্মৃতিব অনুরাগবশে, আব এ অনুরাগ তাঁর স্থির বাসনা থেকে জন্মেছে। উচ্চ সাহিত্যের দিক দিয়ে পদাবলীর মূল্যায়ন এবং ব্রজবুলির শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনার প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথেরই। ভানুসিংহ রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার প্রকাশক নয়, স্বভাবের নির্দেশক মাত্র। জয়দেব, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, রায়শেখর থেকে তিনি শব্দের ধ্বনিগুণ শিখছেন, অথবা বাঙ্‌লার ঐতিহ্য এবং নিজ স্বভাব বশে তাঁদের কাব্য-নির্মাণের মধ্যে প্রবেশ ক'রে সাহিত্যহীন শব্দার্থ শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করছেন। মানসী-সোনার তরী পর্যায়ে নিজ প্রতিভার অভ্যুদয়ে অনুকরণ থেকে নিবৃত্ত হয়েছেন, তবু পদাবলীর শব্দ ও বাক্যগঠনের ভঙ্গিমা গীতিকাব্যিক আত্মপ্রকাশের জন্য স্বভাবতই অনুসরণ ক'রে চলছেন। এসব কথাও আমরা গ্রন্থান্তরে বিবৃত করেছি। দুটি প্রায়-পৃথক্ রীতি অধুনা-পূর্ব বাঙ্‌লাসাহিত্যের রীতিব মতই রবীন্দ্রনাথে পাশাপাশি থেকে নানাভাবে বিমিশ্রিত হয়েছে। শব্দের এবং অর্থের অলংকরণ তাঁর গদ্য রীতিকেও রঞ্জিত ক'রে কদাচিৎ কাব্যপদবীতে নিয়ে গেছে। গদ্যচ্ছন্দের কালে ধ্বনির্বিলাসী কবি চিত্র ও সংগীতের সঙ্গে এতকালের প্রণয়-সম্পর্ক ত্যাগ করতে চেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু যখনই উত্তম সৌন্দর্য-স্বপ্ন ব্যক্ত করতে চেয়েছেন তখনই শব্দার্থ-রমণীয়তা তাঁর বাহ্য অভিলাষকে অবহেলা ক'রে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছে। পাঠকবর্গ

লক্ষ্য করবেন, বলাকার এবং অন্যান্য সময়কার তথ্য ও তত্ত্বনির্ভর বা আইডিয়া-প্রধান কবিতাগুলি যেমন তাঁর হৃদয়ের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত তেমনি বক্রোক্তিহীনও। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ যে-বিপুল শব্দার্থসম্ভার সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে দুরূহতা নেই। তাঁর পদবিন্যাসরীতি কোথাও অনর্থক আড়ষ্ট নয়, কচিৎ অলংকরণ-সমৃদ্ধ এবং বিদগ্ধতাময় এই মাত্র। তাঁর রীতির এই প্রসাদগুণ চণ্ডীদাস মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্র প্রদর্শিত বাঙ্‌লা সরণি থেকে দূরবর্তী নয়। ইংরেজির বাক্যরীতি স্থানে স্থানে তাঁর গদ্যে অনুসৃত হয়েছে বটে, কিন্তু কবিতায় বাঙ্‌লার স্থির প্রচলিত ভাষাবিন্যাসই তাঁকে এত স্বচ্ছন্দ-তার অধিকার দিয়েছে। অবশ্য স্থানে স্থানে, গদ্যচ্ছন্দের ক্ষেত্র ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও কবিতা যে কারও কারও কাছে অস্পষ্ট এবং দুরূহ ব'লে মনে হয় তার কারণ কবির কল্পনার সঙ্গে নিজ সংস্কারকে মেলাবার অসামর্থ্য অথবা বদ্ধমূল তত্ত্ব-সংস্কার নিয়ে তাঁর কাব্যকে দেখা। সাম্প্রতিক কবি-সম্প্রদায়ের শব্দ ও বাক্যের দুরূহতা-দৃষ্টে রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্‌লার সংস্কার ও ঐতিহ্যের বাহক ব'লে অনুভব করতেই হয়।

আমাদের বর্তমান গ্রন্থে চিত্র-সংগীত বা শব্দার্থ-সাহিত্যের অর্থাৎ বক্রতার মানদণ্ডে রবীন্দ্রের কাব্য-সৌন্দর্য বিচারণীয় হয়েছে ব'লে আইডিয়া-প্রধান বা তত্ত্বকথার কবিতাগুলিকে আমরা সমাদৃত করতে পারিনি, এজন্য তত্ত্বপ্রিয় ব্যক্তির কাছে পরিহার চাইব; তাছাড়া যেখানে শব্দার্থ-সাহিত্য ঘটেনি বা অতিরেক ঘটেছে এমন স্থান প্রদর্শন ক'রে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের যা কালজয়ী সম্পদ্ সেদিকেও অঙ্গুলি-নির্দেশ করব। রবীন্দ্রনাথের কল্পনার বৈশিষ্ট্য বুঝতে সাধারণ তত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বমূলক কবিতাগুলি হয়ত কিছু সাহায্য করে, যেমন করে তাঁর গদ্য-প্রবন্ধ, ধর্ম বা সাহিত্য সমালোচনার প্রবন্ধগুলি, অথবা তাঁর জীবন-পরিচয়। কিন্তু কাব্যগত রমণীয়তা স্বয়ম্প্রকাশ, বাহ্য পরিচয় ছাড়াই সহৃদয় পাঠকের চিত্তে তার ইন্দ্রধনুর বর্ণবিস্তার।

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রের উল্লেখ্য কবিকৃতিসমূহ আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত করা হ'ল।

উজ্জ্বলতম অনুকৃতি

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

কৈশোরের এই আশ্চর্য রচনাটিকে দুটি পৃথক দিক থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি হ'ল এর ভাবের দিক। বৈষ্ণবীয়তা বলতে যা বোঝায় তা এর ত্রিসীমানায় নেই। এবিষয়ে কবির কোনও অভিলাষই নেই। কপট ভাবুকতায় সমাচ্ছন্ন হয়ে পাঠকদের কাছে সত্যের কোনও মায়ামূর্তি কবি স্থাপন করতে চান না, নিজেকেও ভোলাতে চান না 'ভাবের ঘরে চুরি' ক'রে। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' সম্পর্কে বরং এ অভিযোগ কতকটা যথাযথ হতে পারে। এর মধ্যে ভাবের স্পর্শ যদিবা কিছু থাকে তা হ'ল কবির স্বভাবের, যে-স্বভাব তাঁর একান্ত মৌলিক, অনতিস্ফুট অপরিণত রোম্যান্টিক বাসনালেশ। এরই পরিচয় কৃত্রিমতার মধ্যে স্থানে স্থানে ফুটে উঠেছে। ভানুসিংহের পদগুলিতে সুখ ও তৃপ্তির বর্ণনা নেই, আছে মিলনের আশ্বাস এবং অসীম ব্যাকুলতা। এর রাধা-নাম্নী নায়িকার মধ্যস্থতায় কবির অত্যন্ত অপরিণত চিত্তের শূন্যবিহারের ইচ্ছার ক্ষীণ পরিচয় কোথাও কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়েছে। কঠোর আত্মসমালোচক কবি ভাবগত দৈন্যের দিক থেকেই এই রচনার নিন্দা করেছেন, অথচ কোন্ গভীর প্রবর্তনার মূলে এর জন্ম তা ধরতে পারেন নি। সেই ভাবী রোম্যান্টিক কবির বংশীরব-বিমুগ্ধ চিত্তের কাতরতাময় প্রতীক্ষমাণ একটি অবস্থার অস্ফুট পরিচয় কবিতাগুলির স্থানে স্থানে ফুটে উঠেছে। এরই বিস্তাররূপে দেখা যায় একালে রচিত কবির প্রিয় সংগীত—'মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে' এবং পরবর্তীকালের 'তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি', এ ছাড়া "বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই থামিল বাঁশি" "আঁখিতে বাঁশিতে যে-কথা ভাষিতে" প্রভৃতি কবিতার বহু পঙ্‌ক্তি। এ বাঁশি ব্রজের বা নিত্যবৃন্দাবনের নয়, কবির নিজ স্বপ্নলোকের। সুতরাং কবির বর্ণনামতে, বাল্যে শ্লেটে-লেখা ভানুসিংহের প্রথম মুন্‌শীয়ানায় যে-বংশীধ্বনির অনুভব-পরিচয় ফুটেছিল, তার মধ্যে জ্ঞাতসারে অনুকরণ আর অজ্ঞাতসারে স্বভাবের উদ্বোধনই চিহ্নিত হয়েছে। মানসী-সোনারতরীর অনির্দেশ্য বিরহ-বিকারের সঙ্গে ছবি-ও-গান, প্রভাত-সংগীত, এমনকি কড়ি-ও-কোমলের তেমন মিল নেই যেমন রয়েছে এই

পদাবলীর নায়িকার মনোভাবের। "বাঁশরি ধ্বনি তুহ অমিয় গরল রে"—এই সুধাবিষমিশ্রিত বিকারময় উৎকণ্ঠার ছবি 'মানসী' কাব্যের প্রারম্ভিক কবিতাগুলি থেকে 'চিত্রা' পর্যন্ত একালে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত রয়েছে। কবির কল্পনালোকের নারী আবির্ভূত হয়েছে—'ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বামকরে।'

ভানুসিংহের নিসর্গচিত্র সর্বত্র অনুকরণাত্মক নয়। এর মধ্যে সৃজনশীল কল্পনার পরিচয় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। বিদ্যাপতি অথবা গোবিন্দদাসের নির্মাণের সঙ্গে এগুলির সমীকরণ করা চলে না, বরং রবীন্দ্রেব পরবর্তীকালের কল্পচিত্রের সঙ্গেই এগুলির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। যেমন, 'গহন তিমির নিশি, ঝিল্লিমুখর দিশি' 'পাদপ মরমর, নির্ঝব ঝরঝর' 'শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা' 'গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব'। এগুলি কৃত্রিম পবিচ্ছদ-বাহুল্যের মধ্যে দেহের স্বাভাবিক দ্যুতিবিকাশ।

ভানুসিংহের কবিতানিচয়ের বহিরঙ্গ পরিচয় হ'ল অনুকৃতি, কিন্তু অন্তরঙ্গ রহস্য হ'ল সেই বিশেষ প্রবৃত্তি, যার পরিচালনায় তিনি ব্রজবুলির অনুকরণে বাধ্য হচ্ছেন। এই প্রবৃত্তির অনুধাবনেই এই অনুকরণাত্মক ভাষাবিলাসের সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে। বুঝতে হবে এই কিশোর-কবি 'মেঘনাদবধ' কি 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের অনুসরণে ব্যস্ত হচ্ছেন না, চণ্ডীদাসাদির লৌকিক বাঙ্‌লায় লেখা তীব্র আর্তিব দ্বারাও তিনি আকৃষ্ট হতে চান না। এমন একটি প্রাচীন রীতির রচনায় তিনি প্রভাবিত হচ্ছেন যা তাঁর কবিধর্মের সঙ্গে অর্থাৎ শব্দার্থ-নির্মাণের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কে আবদ্ধ। এ যেন শুধু প্রভাবই নয়, এ একটা সম্মোহ, একটা আবিষ্টতা যা থেকে কবির ইচ্ছাকৃত মুক্তি সম্ভব ছিল না। সুতরাং ভানুসিংহের রচনার মূল্যায়নে জয়দেব এবং বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস-যদুনন্দনের অনুকৃতির ব্যর্থতা যদিও উল্লেখ্য বিষয়, তবু এহেন অনুকরণের মূলে যে-কবিধর্ম এবং কবি-সৌহার্দ্য বিদ্যমান রয়েছে তার পরিচয় জানাও অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ, যে-রবীন্দ্রনাথ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এবং ব্যঞ্জনধ্বনির চাতুর্যময় বক্রপ্রয়োগে আধুনিক বাঙ্‌লা কবিতার পথিকৃৎ এবং গুরু, নব্য ভারতীয় ভাষার যে-কোনও কবির চেয়ে 'বাক্‌পতি'* আখ্যালাভের সবচেয়ে যোগ্য অধিকারী যিনি, তাঁর এই উত্তম বচন-রচনার প্রতি বাল্য আকর্ষণ নিরর্থক নয়। [illegible] ব্রজবুলি পুরাতন, কিন্তু কবিভাষার

---

*সুধীপ্রবর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় [illegible] কবির যথাযথ অভি[illegible]

এক আশ্চর্য স্বাক্ষর। এই ধরনের ধ্বনিবক্রতাময় বাক্য নির্মাণের দৃষ্টান্ত সংস্কৃত ছাড়া আর কোথাও নেই। আর সংস্কৃতে থাকলেও নব্য ভারতীয় ভাষার ক্ষয়িত এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প শব্দাবলীর মধ্যে ব্যঞ্জনধ্বনির চারুতাময় অনুশীলন তেমন অনায়াস নয়। আমাদের মনে হয় ইংরেজির চ্যাটার্‌টনের ছদ্মবেশের দৃষ্টান্ত কৌতুকপ্রিয় কবি সহজেই গ্রহণ করেছিলেন একথা ঠিক, কিন্তু, অনুকরণ বা অনুসরণ করতে গিয়ে নিজের সঙ্গে কৌতুক ক'রে বসেন নি।

'ব্রজবুলি' শব্দের উৎপত্তি যে প্রকারেই ঘটুক এই নামের মধ্যে একটি অপ্রাকৃত ভাবের আভাস রয়েছে। এই অলৌকিকতা কেবল কৃষ্ণলীলা-সংস্পর্শের জন্যই নয়, ভাষার জন্যও। কারণ, কৃষ্ণলীলা তো লৌকিক বাঙ্‌লাতেও কম নিবদ্ধ হয় নি। বস্তুতঃ কোনও সংস্কার দ্বারা এ ভাষাকে চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না ব'লেই অপরিচয়ের রহস্যময়তা এর সঙ্গে বিজড়িত করা হয়েছে। এ যেন এক দৈবী ভাষা, যার মধ্যে কথা এবং সুরের 'পরস্পর-স্পর্ধী' রমণীয়তা উদ্ভাসিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে এই অমানুষী কবিভাষা ঠিক কেউ সৃষ্টি করেন নি। ন্যায়ের ছাত্রদের অন্যায় আচরণ থেকেও এর জন্ম নয়, বাঙালি কীর্তনিয়াদের স্খলিত এবং অর্ধস্ফুট মৈথিল থেকেও এই সৌন্দর্যের আবির্ভাব সম্ভব নয়। অবহট্ট-বিলাসী বিদ্যাপতি তাঁর শেষ বয়সে এরকম একটা ভাষার কাঠামো নির্মাণ ক'রে থাকতে পারেন, কিন্তু বাঙালি বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর, অনন্ত, যদুনন্দন, ঘনশ্যাম, জগদানন্দের হাতেই এই ভাষা যথার্থ দৈব সৌন্দর্য লাভ করেছে। মৈথিল বিদ্যাপতির রচনায় অর্থচাতুর্য যে-পরিমাণে আছে সে-পরিমাণে ধ্বনিসুষমা নেই। তাঁর পদ বহু স্থানেই রুক্ষ কর্কশ। উপমা দিলে বলা যায়, আধুনিক যান্ত্রিক যুগের নাগরিকা বিদুষী রমণীর মত, শুদ্ধান্ত-সঞ্চারিণী বিদ্যুল্লতার মত নয়। বিদ্যাপতির মৈথিল অবহট্টের সঙ্গে বাঙালি কবিদের লাবণ্য এবং কোমলতায় স্ফুরিত যথার্থ 'ব্রজবুলি'র পার্থক্য কম নয়। এ প্রসঙ্গ আমাদের পূর্বতন "রূপ ও রীতি" গ্রন্থে বিবেচিত হয়েছে। এখন ভানুসিংহের কবিতানিচয়ের শব্দার্থ-সৌন্দর্যের স্বরূপ দেখা যাক।

পদাবলীর রস ও রূপে আবিষ্ট বিদগ্ধ পাঠক ভানুসিংহ পড়তে গিয়ে বিরক্তি বোধ করবেন পদে পদে। প্রথমতঃ এর ছন্দের অসামঞ্জস্য। এর দুই, পাঁচ, এবং আট সংখ্যক পদ ষণ্মাত্রিক-যতির মাত্রাবৃত্তের, বাকি সব অষ্ট-

মাত্রিক যতির। এরই মধ্যে আমাদের অধুনা অপরিচিত একটি ন'মাত্রার তালের ছন্দ প্রয়োগ করেছেন কবি—'আজু সখি মুহুমুহু'। সন্দেহ নেই যে অনুকারী কবি পঙ্‌ক্তি-মধ্যে যতিসন্নিবেশের তেমন কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটান নি, এক একটি পদে আদ্যন্ত এক রীতির পর্বই অনুসরণ করেছেন, ছয় অথবা আট মাত্রার। কিন্তু বিভ্রাট বেধেছে দীর্ঘ মাত্রার ব্যবহার নিয়ে। অনেক সময় অ, ই, উ, এমন কি ঋ-কারেরও দীর্ঘীকরণ করতে হয়েছে। মাত্রাবৃত্তে ক্বচিৎ লঘু অক্ষরের দীর্ঘীকরণ অসংগত নয়, কিন্তু এখানে এরকম ব্যাপার মুহুর্মুহু ঘটেছে, পরপর দুটি অক্ষরেও ঘটেছে। আ-কার অথবা এ-কারকে মাত্রাবৃত্তে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘ করা চলে, কিন্তু তাই ব'লে পরপর এরকম দীর্ঘীকরণ ব্রজবুলিতেও অসহনীয়। গোবিন্দদাসাদির শ্রুতিসুখকর রচনায় এরকম উপর্যুপরি দীর্ঘীকরণ কদাচিৎ দেখা যায়। ছন্দেব এই অসমতা ভানুসিংহে প্রায় প্রতি চরণে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

(১) আকুল জীবন থেহ ন **মানে**
(২) কৈস মিটাওসি প্রেম পি **পাসা**
(৩) ঝটিতি আও তুহুঁ হমারি **সাথে**
(৪) নীল অ কাশে তারক **ভাসে**
(৫) জর জর ঝিঝসে দুখ **জ্বালা** সব
(৬) মালতি **মালা** রাখহ **বালা**

ষন্মাত্রিক পর্বে প্রায়শঃ শব্দ-মধ্যে পর্বশেষ ও যতিবিধান কর্ণপীড়াকারক হয়েছে। যেমন—

(১) সুন্দরি সিন্ দূর দেকে
(২) চঞ্চল মন্ জীর রাব
(৩) মল্লিকা চ মেলী বেলি

পুনর্লিখন ও মুদ্রণের মধ্যে ভানুসিংহ-পদাবলী কিছু কিছু সংস্কার লাভ করেছে এমন অনুমান করতে বাধা নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় যে, শ্রুতিতে মাত্রাবৃত্ত ছন্দোরীতির সৌন্দর্য, অন্ততঃ পর্বগত মোট মাত্রার সমতার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হ'লে পর কবি দেখেছিলেন যে এর যৌগিক অক্ষরগুলি সর্বত্র এবং 'আ' 'এ' প্রভৃতি প্রায়শই দীর্ঘায়িত হচ্ছে, কিন্তু হ্রস্ব স্বরযুক্ত অক্ষর দু'মাত্রার হচ্ছে অত্যন্ত কদাচিৎ। এই জন্যেই আ, এ, প্রভৃতিকে প্রায় নিয়মিত দীর্ঘ

ধরেছেন ভানুসিংহ এবং ছন্দ মেলাবার বশে (বাঙ্‌লার ব্রজবুলি শব্দে দৃষ্ট) স্বাভাবিক আকার-একারকেও বর্জন করেছেন অথবা তার জায়গায় হ্রস্ব স্বর বসিয়েছেন, যেমন, 'কৈসে' স্থানে 'কৈস' 'পথমে' স্থানে 'পথম' 'কাহে' স্থানে 'কাহ' 'গেল' স্থানে 'গল' ইত্যাদি। এইভাবে খুঁটিয়ে ছন্দ রক্ষার বশে পশ্চিমা উচ্চারণ সহ 'অকাশ' 'চমেলী' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। এর বিপরীত বিষয় অর্থাৎ হ্রস্ব স্বরের দীর্ঘীকরণও দুর্লভ নয়। ব্রজবুলির কবিরা সুরদক্ষ হওয়ার জন্য পর্ব-পর্বাঙ্গে দীর্ঘমাত্রার সংখ্যা এবং সমাবেশ স্থানের উপর সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। সে-সুষমাবোধ মাত্রাবৃত্ত-ছন্দে রবীন্দ্রনাথের এসেছে কিছু পরেই। এখানে তার পরিচয় অতি স্বল্প। নতুবা এমন সামঞ্জস্যহীন দীর্ঘতাবিধান পবে তিনি কখনোই করতে পারতেন না—"জানয়ি মুঝকো অবলা সরলা ছলনা না কর শ্যাম।" আবার এরই ফলে অ-পূর্বদৃষ্ট এবং কদাচিৎ অর্থহীন শব্দাবলীর গ্রন্থনও অনুকারী কবিকে করতে হয়েছে বিনা দ্বিধায়, যেমন, 'চিত্তমে' 'অলসিত' 'বোল ত সজনী' 'সহচরী সব নাচ নাচ'। ছন্দোরক্ষার্থেই 'শ্যামক' স্থানে 'শ্যামকো পদারবিন্দ,' হামার, হমার, হামকি লাগি স্থানে 'হমকো লাগয়' ইত্যাদিরূপ অপপ্রয়োগ ভানুসিংহ অনায়াসেই করেছেন।

দ্বিতীয় কথা, ভানুসিংহের ভাষা ও অর্থ। রবীন্দ্রনাথ যে-কবিভাষায় সিদ্ধ সে ভাষার প্রত্যয়ের স্বাক্ষর ভানুসিংহে স্বল্প হ'লেও যে আছে সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাণীর দৈন্য …পীড়াদায়ক। রবীন্দ্রনাথের যে-ভাষা অর্থনির্দেশ করতে গিয়েও ঠিক অর্থ বলে না, রহস্যের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, অর্থহীন রমণীয়তা-বিশেষের সঞ্চার করে, এ ভাষা সে শ্রেণীর নয়। এখানে বরংচ কোনও অর্থ ব্যক্ত করার আগ্রহই প্রবল। অথচ প্রণয় ও বিরহদ্যোতক অর্থবৈচিত্র্যে কবির অধিকার এখনও জন্মেনি. কৃষ্ণরাধার চিত্তবিকারের সূক্ষ্ম পর্যায়-বিশেষে তো নয়ই। ফলতঃ পূর্বনির্দিষ্ট অর্থ ই দুর্বলভাবে অনুকরণ করতে হয়েছে, নতুবা অতি সাধারণ একটা অবস্থার অসংগতিপূর্ণ পরিচয় দিতে হয়েছে, যেমন—

ছিদল তরী সম কপট প্রেম 'পর
ডারনু যব মন প্রাণ,
ডুবনু ডুবনু রে ঘোর সায়রে
অব কুত নাহিক ত্রাণ।

মাধব, কঠোর বাত হমারা
মনে লাগল কি তোর?
মাধব কাহ তু মলিন করলি মুখ,
ক্ষমহ গো কুবচন মোর।

এ হ'ল বিদ্যাপতি অথবা তদনুসারী কোনও কবির মান ও কলহান্তরিতা পর্যায়ের পদ পাঠের স্মৃতি থেকে অর্থ নির্মাণের প্রয়াস। নিচের পঙ্‌ক্তিগুলি কিন্তু নায়ক নায়িকার কবিকল্পিত একটা অবস্থারই অত্যন্ত দুর্বল পরিচয় দিচ্ছে—

চাহয়ি রহল সো চাহয়ি রহল,
দণ্ড দণ্ড সখি চাহয়ি রহল,
মন্দ মন্দ সখি নয়নে বহল
বিন্দু বিন্দু জলধার।

এরকম প্রায় সর্বত্র। ব্রজবুলিতে কবির অনুরাগ প্রতিষ্ঠিত হলেও ঐ ভাষাব পদ ও বাক্যনির্মাণে অধিকার সুদৃঢ় হয়নি এবং নিজ ভাষাতেও সিদ্ধি ঘটেনি ব'লে রমণীয় কোনও অর্থের প্রকাশ সম্ভব হয়নি। বস্তুতপক্ষে ভানুসিংহের ব্রজবুলিতে যেমন একদিকে কিছু বিরলপ্রযুক্ত অপরিচিত শব্দের প্রয়োগ রয়েছে, তেমনি বাংলা ক্রিয়াপদ, বাংলা ইডিয়ম, এবং কেবল বাংলায় সুলভ এমন সমাসবদ্ধ পদের দৃষ্টান্তও যথেষ্ট। নিম্নলিখিত অংশগুলি বিদগ্ধ পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন: 'কহিছে দুখিনী রাধা' 'কুঞ্জপানে হেরিয়া' 'সত্য কহি তোয়' 'বৃথা ভয় না কর বালা' 'কথি ছিল ও তব হাসি' 'দক্ষিণ পবনে কম্পিত তরুগণ' 'নীদ-মেঘপর স্বপন-বিজলীসম' 'ছিন্ন কুসুমসম ঝরব ধরাপর' 'নিভৃত বসন্ত- নিকুঞ্জ বিতানে আসবে নির্মল রজনী' 'খোল দুয়ার ত্বরা করি সখি রে "বসন্তভূষণভূষিত ত্রিভুবন' ইত্যাদি।

সুতরাং এই পদাবলী মহাজন-পদাবলীর অনুকরণও হয়নি। কিন্তু এরই মধ্যে অদ্ভুত চমকের সৃষ্টি করেছে ভানুসিংহের ভণিতা-যোজনা। এ একেবারে সার্থক অনুকরণ, মেকি বলার পথ নেই। পদাবলীর ভণিতাংশে কবির বক্র মন্তব্য অথবা সুসংগত আত্মভাষণ থাকে যা পদাবলীর বিশিষ্ট 'form' এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সন্নিবিষ্ট। এ বিষয়ে ভানুসিংহের দক্ষতা দেখে এই কথাই বলতে হয় যে আয়োজনের কোনও ত্রুটি ছিল না। "ভানু গায় শূন্যকুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহি রে" "ভানু কহে, ছি ছি কালা" "শ্যামকো পদারবিন্দ ভানুসিংহ বন্দিছে"

"ভানু কহে চুপি মান ভরে রহ" "ভানুসিংহ কহে ছিয়ে ছিয়ে রাধা, চঞ্চল হৃদয় তোহারি"—এ সবই খাঁটি তদ্রুচিত ভণিতা। পদের পুচ্ছে যোজিত সুকবির নীতিবাক্য নিম্ন দৃষ্টান্তে ভানুসিংহ কিরকম বেমালুম নিজের ক'রে নিয়েছেন! মাথুরের পদে সখীদের সমীপে শ্রীমতীর আক্ষেপ-প্রসঙ্গ—

"বরখি আঁখিজল ভানু কহে—অতি
দুখের জীবন ভাই।
হাসিবার তরে সঙ্গ মিলে বহু
কাঁদিবার কো নাই।"

ভানুসিংহের পদের বিষয় পূর্বরাগ, অভিসার, মান, মাথুর, মিলনোৎকণ্ঠা এবং কলহান্তরিতা আর বাসকসজ্জা নায়িকার বর্ণনা। নিসর্গ পটভূমিতে রয়েছে বসন্ত ও বর্ষা। এর মধ্যে নিঃসন্দেহে মাথুরের দু একটি পদের কিয়দংশে এবং তিমিরময় বর্ষার বর্ণনায় নিজ কবিত্ব কিছু ফুটেছে। নতুবা এই দুই ঋতুর ভূমিকা অঙ্কনে বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসাদির অনুবৃত্তিই করা হয়েছে মাত্র। এর ফুল্লবাসন্তীযামিনী মাদকতা-শূন্য এবং নিবিড় মেঘান্ধকারের মধ্যে শালতালতরুর স্তব্ধতা অভিসার যাত্রায় তেমন কোনও রোমাঞ্চের সঞ্চার করে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ভানুসিংহ সম্বন্ধে এমন কথাও নিরর্থক। এর দোষ গণনা করতে গেলে গুণের লেশও পাওয়া যাবে না। কাব্য বিচারে এ নিঃসন্দেহে চিত্রকাব্য। এই সব দোষ দর্শনের জন্য আমরা ভানুসিংহের অবতারণা করি নি। এর গুণবর্ণনার প্রয়াসেও আমাদের আগ্রহ নেই। আমরা শুধু দেখতে পাই যে কাব্যনির্মাণ বিষয়ে একটি প্রবল প্রবৃত্তি কবির অজ্ঞাতসারেই তাঁকে শব্দ এবং ধ্বনি নিয়ে খেলার মধ্যে পরিচালিত করেছে। নাই হোক শব্দার্থের সাহিত্য, না থাকুক বৈষ্ণবীয় অনুরাগের আন্তরিকতা, তবু ধ্বনি ও ধ্বনিমাত্রিক ছন্দের অনুশীলনে কবির আয়াস নিষ্ফল হয়নি। এ শ্রম উত্তম কবিমাত্রকেই করতে হয় আর প্রতিভার পরিচালনবশে আপনা থেকেই করতে হয়। এর ফলশ্রুতি তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিগোচর হয় না। এ যেন কবিশক্তির সদা-প্রবাহিত একটি ক্রিয়াস্রোত বিশেষ, বহিরঙ্গ বিষয়ের আঘাতে এর অবস্থা কখনও বা প্রকট, সম্বন্ধরহিত অবস্থায় কখনও অপ্রকট। ব্রজবুলির সঙ্গে কবির এই যে অনুকরণাত্মক প্রকাশময় পরিচিতি ঘটল, এরই সার্থক সাহিত্যিক অবস্থা দেখছি কয়েক বৎসরের ব্যবধানে 'মানসী' কাব্যে। মানসীর পর থেকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দোনির্মাণে কবির যে দক্ষতা স্ফুরিত হয়েছে

তার আশ্চর্য স্বাক্ষর এই শ্রেণীব গীতিকবিতায়, কথা ও স্থরের একাত্মতা বিধানেব নিগূঢ় প্রয়াসে, পর্যায় থেকে পর্যায়ান্তবে। 'অশ্রুসজল ভৈরবী আর গেয়োনা'—ইত্যাদির এক একটি যতিবিভাগে এক একটি নিরূপিত অথচ অনায়াস দীর্ঘমাত্রা স্থাপনেব যে সৌন্দয তা পূর্বেকাব অপেক্ষাকৃত অস্থন্দব "ভানু গায় শূন্যকুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহি বে" প্রভৃতিব দীর্ঘীকরণের অতিবেক থেকেই কালক্রমে এসেছে।

ভানুসিংহেব কাব্যার্থে বাধার মূর্তি ফোটেনি, বিবহাদি বিলাসেও আঙ্কবিকতাব অতিবিক্ত ব্যঞ্জনা নেই। কিন্তু এব মধ্যে কবিব নিজেব অঙ্কিত নলিনী-মুবলাব প্রণয়-গুঞ্জবণ কিছু কিছু শোনা যায়। আমবা নিঃসন্দেহ যে সেই সব জায়গায় ভানুসিংহ দু'চাব পঙ্ক্তি স্মবণেব যোগ্য কবিতাব সৃষ্টি কবেছে। এসব অংশে ছন্দও আ, ঈ এব অতিনিরূপিত গণনা থেকে মুক্ত। মান অথবা কলহান্তবিতা কোনো পযায়েব অনুসবণেব চিহ্নও এগুলিতে নেই। সাধাবণভাবে কখনও মিলনের আশায় উৎস্থক কখনও বা আসন্ন বিবহে ব্যাকুলা একটি কিশোবীব ছবিই এবকম বচনায় মাঝে মাঝে লক্ষিত হয়েছে। যেমন—

শুনহ শুনহ বালিকা,
বাখ কুস্থম মালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেবনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহি বে।

এব ছন্দ অনেকটা সাবলীল, এব শব্দাবলী ও অর্থাবলী পবস্পব সন্নদ্ধ, শব্দ অর্থকে আহত ক'বে নিবর্থক ধ্বনিতবঙ্গ বিস্তাব কবতে চায় না। ছন্দ আত্মবক্ষার জন্য শব্দকে অতিকৃত্রিম এবং অর্থকে অসংলগ্ন ক'বে তুলে না। এদিক থেকে বলা যায় ভানুসিংহেব পবিচিত "শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা নিশীথ যামিনী বে" গানটিকে কবিতাব ছন্দে আ কাব এ-কাবাদিব দীর্ঘতা বক্ষা ক'বে পাঠ কবলে এব কৃত্রিমতা উৎকট হয়ে ওঠে। অথচ শব্দবিন্যাসে এর দীর্ঘতা-বিধান এমন যে তাছাড়া পাঠেব কোনও উপায় নেই, যদিও প্রথম পঙ্ক্তিটি অর্থাৎ ঐ "শাঙন গগনে" ছ'মাত্রাব ঢঙে খুব সাবলীলভাবেই পড়া যায়। ফলে এই দাঁড়ায় যে শব্দগ্রন্থনেব দিক থেকে এই বর্ষাভিসারের পদটি মোটামুটি স্থন্দব বলা গেলেও শব্দার্থ-সাহিত্যে মনোহাবী হয়েছে এমন বলা যায় না। ঐ রকম ক্ষেত্রে সংগীতের স্থবিধা আছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

ভানুসিংহের আসল কাব্যকথা লুকানো আছে ঐ প্রণয় নিবেদনের সহজ

ব্যাকুলতাময় অংশগুলিতে। সেখানে কিশোরকবির সৌহার্দ্যে এসেছে একটি অনতিপরিস্ফুটযৌবনা কিশোরী, সে ব্যাকুলিত প্রত্যাশায় অধীর, বসন্তরজনীর সুখস্বপ্ন তার ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, প্রবঞ্চিত হয়েও তার বোধের উদয় ঘটছে না, মানাদির ব্যাপারে সে পদাবলীর নায়িকার মত চতুরা নয়, সে একান্ত সরলা ভীতিবিহ্বলা। আর এ নায়িকা কবিও বটে। 'ভগ্নহৃদয়' এবং 'কবি-কাহিনী'তে যে ভাবময়ী, উচ্ছ্বাসপ্রবণা, সতত পর্যাকুল নায়িকাদের দেখা যায় তারই ক্ষণিক প্রকাশ ভানুসিংহের বিভিন্ন পদগুলিতে। বাইরের দৃষ্টিতে এরই বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে পালাবিভাগ, আভ্যন্তরীণ সন্ধানে কবির অর্ধস্ফুটতা নিয়ে সেই একই নায়িকা প্রকাশ পাচ্ছে নানান্ আচরণে। সখীর দল এই অবোধ বালিকার চৈতন্য সম্পাদন করছেন এমন একটি ছবিই প্রধান হয়ে এই পদগুলির অভ্যন্তরে কারুণ্য ও বেদনার সঞ্চার করেছে। কবির স্বকীয়তা-বিজড়িত এই বঞ্চনা ও বেদনার সংবাদটি ভানুসিংহ পড়তে পড়তে সর্বত্র আমাদের চিত্তে ধুয়ার মতই আবর্তিত হয়েছে—

'শুনহ শুনহ বালিকা,
রাখ কুসুম মালিকা।'

কাব্যসৌন্দর্যের আবির্ভাব

শব্দার্থের সাহিত্যধর্মের রমণীয়তা "কড়ি ও কোমলে"ই প্রাথমিক স্ফূর্তি পেয়েছে। কড়ি ও কোমলে শব্দরাজি যেন নির্বাচিত, অর্থের সঙ্গে অর্থের সংগতি বাক্য থেকে বাক্যান্তরে স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত। শব্দ অর্থকে প্রতিহত করছে না, আবার অবাচক শব্দ ও বাক্যাংশের ব্যবহারও স্বল্প। কড়ি ও কোমলে কবির কল্পনা ও সৌহার্দ্যশক্তি এসেছে। এর ফলে রমণীয় অর্থ বহন করতে পারে এমন পদাবলী কবির কল্পলোক উদ্‌ভাসিত ক'রে প্রকাশ পাচ্ছে।

কবিশক্তি এবং প্রকাশধর্ম এ দুই সহগামী সখা, এদের দ্বন্দ্ব এবং সমন্বয়েই অনির্বচনীয় সেই বস্তুর উৎপত্তি, যাকে পাঠক বা শ্রোতা সৌন্দর্য ব'লে স্বীকার করে নেয়। কড়ি ও কোমলের পূর্বেকার রচনায় শক্তির স্ফুরণ হয়নি, যদিও কাব্য-কবিতায় ভাবুকতার অভাব নেই! সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাত-সংগীত এবং প্রকৃতির প্রতিশোধে ভাবোচ্ছ্বাস যে-পরিমাণে আছে তার কিয়দংশও কড়ি ও কোমলের উত্তম কবিতাগুলিতে নেই। অথচ কড়ি ও কোমলে ভাব-প্লাবনের অবকাশ ছিল প্রচুর। বধূঠাকুরানীর আকস্মিক মৃত্যু, যার প্রভাব তাঁর কাব্যজীবনে সুদূরপ্রসারী—তা একালের ঘটনা। কড়ি ও কোমলে মুদ্রিত এ বিষয়ের দু একটি কবিতা দেখা যাক।

একটি প্রত্যক্ষ মমতার কবিতা হ'ল 'কোথায়'। সদ্যোমৃত আত্মীয়কে ভিন্নদেশের একক যাত্রী ব'লে বেদনার্ত চিত্তে স্মরণ করার মনোভঙ্গি সাধারণ হ'লেও সেই শোক-সৌন্দর্যের উদ্বোধন অসামান্যের পরিচায়ক হয়েছে। প্রারম্ভের স্তবকে বিগত আত্মীয়ার উদ্দেশ্যে ঠিক সেই ক'টি কথাই বলা হয়েছে—যা এক্ষেত্রে একেবারে প্রথমেই মনে হয়—

অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি,
পথ কোথা পাবে!

এর বাক্য দীর্ঘায়িত নয়, ছন্দে যেখানে যতিপাত ঘটছে সেইখানেই বাক্য সমাপ্ত হচ্ছে এমন কথা বলা যেতে পারে। বাক্যগুলি স্বল্পে সমাপ্ত ব'লেই না-বলার অংশ ব্যঞ্জনায় উপলব্ধ হচ্ছে। তা ছাড়া মর্মের নিগূঢ় কথা অকপটে উচ্চারিত হওয়ার মধ্যে সহজ সিদ্ধির যে চমৎকারিতা আছে

তা এ কবিতাটির প্রাপ্য। কবিতাটি মননের স্পর্শ থেকে মুক্ত—'স্নেহের পুতলি তুমি সহসা অসীমে গিয়ে কার মুখ চাবে?' এই নিবিড় অনুরাগ-বিজড়িত চিরন্তন বিলাপের বাক্যই এতে নূতন ক'রে শোনা গেল। 'হায়, কোথা যাবে' মৃতপক্ষে অসহায়তা আরোপের এই প্রসঙ্গ ধ্রুবপদের ভঙ্গিতে গ্রথিত হয়ে আদ্যন্ত কারুণ্যের সঞ্চার করেছে। কবিতাটিতে ত্রুটি যে নেই এমন নয়। "পুরানো সুখের স্মৃতি, বাতাস আনিছে নিতি, কত স্নেহভাবে" এই বর্ণনায় "স্নেহভাবে" শব্দের বাঞ্ছিত অর্থ খুব সুপ্রযুক্ত হয়নি, কারণ, এক্ষেত্রে কাতরতার আধিক্যের কথাই স্বাভাবিক। 'খেলাধুলা পড়ে না কি মনে, কত কথা স্নেহের স্মরণে' এই উক্তির দ্বিতীয়াংশ অস্পষ্ট এবং 'স্মরণে' শব্দ পুনরুক্ত, ইত্যাদি; তবু এই কবিতাগুলিতে কবিভাষার যে জড়তামুক্তি ঘটেছে, এ বিষয়টি লক্ষ্য করতেই হয়।

অন্য আর একটি কবিতা ধরা যাক্, 'বসন্ত অবসান'। এটি একান্ত ভাবেই গীতিধর্মী। কবিতাটিতে আতিশয্য, পুনরুক্ত, নিরর্থকতা, কারুণ্যের অতিরিক্ত উদ্দীপন-প্রয়াস প্রভৃতি দোষ বিদ্যমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্ততঃ একটি স্থানে বাক্য এবং অর্থ জড়তা এবং অবাচকতা এবং উচ্ছ্বাস ত্যাগ ক'রে স্মরণীয় চিত্রময় গীতের চমৎকৃতি বিস্তার করেছে—

> বসন্তের শেষ রাতে এসেছি রে শূন্য হাতে
>   এবার গাঁথিনি মালা, কী তোমারে করি দান।
> কাঁদিছে নীরব বাঁশি, অধরে মিলায় হাসি,
>   তোমার নয়নে ভাসে ছল ছল অভিমান।

এই অংশের কেবল পূর্ণ যতির স্থানগুলিই নয়, তার মধ্যবর্তী বিরামের ক্ষেত্রগুলিও এত সামঞ্জস্যময় ও নিয়মিত, শব্দের আকৃতি, রং ও ধ্বনি আগেকার রচনা থেকে এমন পরিস্ফুট যে একে কবিভাষা ব'লে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। যতিবিভাগের মধ্যে বৈচিত্র্যের জন্য ৩+৩+২ অক্ষরের শব্দের গ্রন্থন এবং শব্দমধ্যে স্বরবৈচিত্র্য-রক্ষণ একে পূর্বাপেক্ষা অধিক সৌন্দর্যের বাহক করেছে।

এই শ্রেণীর অন্যান্য কবিতার মধ্যে ছ'মাত্রার তালের মাত্রাবৃত্ত ছন্দে গ্রথিত 'বিরহ' 'বিলাপ' এবং 'আকাঙ্ক্ষা' উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে যদ্যপি 'আকাঙ্ক্ষা' (আজি শরত তপনে) বিবিধ গুণ সন্নিবেশে মনোহারী এবং প্রথম দুই পর্বান্তিক অনুপ্রাস যদ্যপি এই কবিতাটিতেই সবচেয়ে সুচারু

হয়েছে, তবু অন্যগুলিও মাধুর্যের আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত নয়। বলা যেতে পারত যে তরলতা বা অতিকোমলতা এই কবিতানিচয়ের উন্নত ভাব-মহিমা খর্ব করেছে, কিন্তু সে কথা বলা যায় না এজন্য যে এগুলি নিতান্ত-করুণরসাশ্রিত এবং শুধু গীতিকাব্য নয়, সুরে প্রযুক্ত গীতও বটে। এই শ্রেণীর কবিতানিচয় সম্পর্কে আমরা গ্রন্থান্তরে যা বলেছি তার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন হচ্ছে। এই কবিতাগুলির উদ্ভবের বীজ হ'ল কবিচিত্তের একটি সবিশেষ সৌন্দয-বিরহ-চেতনা যা মায়াময় নারীরূপের আশ্রয়ে গঠিত। "কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে কোন্ ছায়াময়ী অমরায়"—এই কল্পলোকবাসিনী, বর্ণগন্ধরূপবিলাসে চিত্তের উদ্‌ভ্রান্তি ও আবেগের জনয়িত্রী অশরীরী নারীই কবিকে বিরহমূলক সৌন্দয-অনুসন্ধানের পথে চালিত করেছে। একে কবি অপবিচিতা বিদেশিনী ব'লে এখানে অভিহিত করেছেন। অন্যত্র অজানা, অচেনা, অপ্রাপ্য। এক দূবচারিণী রহস্যময়ী সত্তা রূপেও ইনি আভাসিত হয়েছেন। এই কল্পমূর্তির সঙ্গে মিলনের জন্য আর্তি একালে 'চিত্রা' কাব্য পযন্ত নানা কবিতায় প্রসারিত। এর পর স্বল্প পৃথক্ ভাবধর্ম নিয়ে পুববীর 'আহ্বান' 'ক্ষণিকা' 'লীলাসঙ্গিনী', সানাই কাব্যের 'বিপ্লব' কবিতা এমনকি রক্তকরবী নাট্যের 'নন্দিনী' চরিত্র পযন্ত এই কল্পনারীমূর্তি কখনও অধরা সত্তারূপে কখনও সৌন্দয ও আনন্দের দূতীরূপে কবিচিত্তের আকর্ষণের ও বন্ধনের বস্তু হয়েছে।

এছাড়া কবির কিছু ব্যক্তিগত অনুরাগ বা প্রণয়-সম্পর্কের কবিতা রয়েছে যার সংখ্যা প্রথম কাব্যজীবনে স্বল্প, কিন্তু শেষ পযায়ের গদ্যকাব্য অধ্যায়ে কিছু বেশি। বলা যায় এর অধিকাংশই প্রথম জীবনের স্মৃত-বিস্মৃত প্রণয় ঘটনার মানসিক ইতিবৃত্ত। কযেকটিতে পরবর্তী কালের, এমনকি শেষ জীবনের, ঠিক ভালোবাসা নয়, ভালো-লাগার কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। এগুলির মধ্যে আবার কিছু কাল্পনিক হওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক। রবীন্দ্র-কবিচিত্ত যে প্রৌঢ় ও যৌবনের অপ্রত্যক্ষ ভাবস্বপ্নের নভোবিহার থেকে একালে প্রায়শই মানবিক প্রত্যক্ষ স্নেহ-মোহের স্বাদ গ্রহণ করতে নেমে এসেছেন এর জন্য তাঁর কবিতার বহু পাঠক-পাঠিকার কাছে তিনি ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। সে যাই হোক, এই শ্রেণীসমূহের কবিতার বিষয়বস্তু এবং প্রকাশতত্ত্ব অবলম্বনে বর্গীকরণ প্রয়োজন। নতুবা উপরিউক্ত সৌন্দর্য-স্বপ্ন এবং সন্ধানতৎপরতা বিষয়ক কবিতাগুলি ঘটনাপ্রধান এবং স্বাদপরিণামে বিভিন্ন কবিতাগুলির

সগোত্র ব'লে বিবেচিত হতে পারে, ঐসব স্মৃতিচারণের কবিতাগুলির কোন্‌টি প্রত্যক্ষ কোন্‌টি অলীক এবং প্রত্যক্ষতার ক্ষেত্রে কার সীমা কতদূর এসব বিষয়েও ভুল ধারণা জন্মাতে পারে।

যদিও রবীন্দ্রকাব্য-নির্মাণের ঘটনাসূত্র-নির্ণয় এবং ব্যক্তিগত বাস্তব জীবনের আকর্ষণ বিকর্ষণের সঙ্গে তাঁর কবিতাবলীকে মেলাতে পারার পরিতুষ্টি আমাদের কাম্য নয়, তবু প্রয়োজনবশে এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থাপিত করতে হচ্ছে।

সম্প্রতি রবীন্দ্রকাব্যের কোনও কোনও রসনির্ণেতা রবীন্দ্রের বহু কবিতার রচনামূলে নারীপ্রেম লক্ষ্য করেছেন। কবির ব্যক্তিগত বাস্তব জীবনের রক্তিম বাসনা এবং আবেগময় উত্তাপ থেকেই তার বহু প্রণয়-স্মৃতি বিষয়ক, সৌন্দর্য ও সুদূরসঞ্চরণ-অভিলাষের প্রকাশক কবিতার জন্ম এবং আধ্যাত্মিক ব'লে সাধারণ্যে পরিচিত বহু কবিতার মধ্যেও মনস্তাত্ত্বিক বিচারে নারীপ্রেমই আভাসিত হচ্ছে এই হ'ল তাদের বক্তব্য। 'কবি-মানসী' গ্রন্থপ্রণেতা বন্ধুবর জগদীশ ভট্টাচার্যের ধারণায় রবীন্দ্রনাথ একজন প্রথম শ্রেণীর শৃঙ্গাররসিক ছিলেন। তার বাস্তব জীবনের বর্ণাঢ্য বাসনাময় প্রণয়ের ইতিবৃত্তসমূহ 'কড়ি ও কোমল' থেকে আরম্ভ ক'রে কখনও যথাভূত ভাবে, কখনও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে তাঁর কাব্যজীবনান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। শৃঙ্গারমূল থেকে উদ্দীপ্ত তার অগণিত কবিতা ও গানের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ক'রে তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন যে কবির কাছ থেকে প্রণয়ের উপচার লাভ করেছেন এমন অন্ততঃ তিন চারজন নায়িকা তার এইসব লৌকিক এবং মিস্টিক কবিতাসমূহের মূলে। প্রভাবের বিচারে প্রথমা হলেন কবির বধূঠাকুরানী কাদম্বরী দেবী, দ্বিতীয়া হলেন কবিজায়া মৃণালিনী দেবী, এবং তৃতীয়া হলেন মারাঠী আধুনিকা আনা তড়খড়, চতুর্থী হলেন আর্জেন্টাইনের প্রবাস-সঙ্গিনী 'বিজয়া' ইত্যাদি। কোন্ কবিতাটি ঠিক কার সংসর্গ থেকে উৎপন্ন তা নির্ণয় করার জন্য এবং প্রণয়-বিলাস যে অন্য পাঁচজনের মতই মানুষ রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল এসব বোঝাতে 'কবি-মানসী'র লেখক বহু আয়াস সহকারে তাঁর ব্যক্তিজীবনের ঘটনাপঞ্জী বিচার করেছেন।

কবির কাব্য সম্পর্কে ইতিহাসানুগ ব্যাখ্যায় আমাদের বিরাগের কোনো কারণ নেই। আমরা এমনও মনে করি না যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য বলতে আগাগোড়া অসীম এবং ভূমার তত্ত্বসমূহই বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর

আশ্চর্য বাণীবিন্যাসের মধ্যে প্রচুর কাব্যানন্দ বিতরণ করেছেন এবং উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন কবিরা যা ক'রে থাকেন তার সম্যক্ উৎকর্ষ যে রবীন্দ্রকাব্যে পাওয়া যায় এ সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা সুদৃঢ়। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমরা তাঁর কবিস্বভাবের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে পারি যা অন্যকবিদুর্লভ। বাস্তব প্রণয়ের আবেগ ও আবেশের কবিতা রবীন্দ্র রচনায় কিছু নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু তাই ব'লে ঐগুলি এবং সোনারতরী, মানসসুন্দরী, নিরুদ্দেশ-যাত্রা, লীলাসঙ্গিনী, আহ্বান প্রভৃতি কবিতা যে একই শ্রেণীর একথা কোনো মতেই গ্রহণ করা যায় না, কাব্যগত আবেদন অনুসারেই যায় না। এই অপ্রাপ্য সৌন্দর্যসত্তার জন্য ব্যাকুলতাময় আগ্রহের অনন্যসাধারণ কবিতাগুলি এবং এরই বিস্তাররূপে কবির সুদূরের প্রতি আগ্রহ, অরূপসত্তার চকিত স্পর্শ লাভ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানের নজিরে Erotic Mysticism ব'লে পরিচিত হলেও ঐভাবে আস্বাদিত হবার যোগ্য ব'লে আমরা বিবেচনা করিনা। এ তার চেয়ে বেশি অনেক কিছু, এর সঙ্গে ভারতের মধ্যযুগের স্বপ্ন সাধনার ঐতিহ্য এবং উনিশ শতকের যুগ-প্রয়োজন একত্র কাজ করেছে। কীভাবে তা আমরা গ্রন্থান্তরে* বিস্তৃতি সহকারে নির্দেশ করেছি। তা ছাড়া দেখতে হবে এই নারীরূপভিত্তিক সৌন্দর্যসত্তার অন্বেষণ এবং সেই সঙ্গে অনুরাগ-সম্পর্কের স্মৃতিচারণাই রবীন্দ্র-কল্পলোকের একমাত্র আশ্রয়বস্তু নয়। তাঁর নিসর্গ-সম্পর্ক, মানব ও পৃথিবীর রহস্যানুসন্ধান, অরূপসত্তার সঙ্গে নিকট সম্পর্ক স্থাপন, নিজের, মানুষের ও পৃথিবীর অজ্ঞাত পরিণামের পথে যাত্রার রহস্যানুভব প্রভৃতির কাছে তাঁর ব্যক্তিগত অনুরাগ-বিরাগ সম্পর্কের ইতিবৃত্ত কতটুকু স্থান অধিকার ক'রে আছে তা চিন্তনীয়। আমাদের পরবর্তী প্রস্তাব এই যে সৌন্দর্যসত্তার অনুসন্ধানমূলক কবিতাগুলি বৈজ্ঞানিক বিচারে যদি রূপান্তরিত প্রণয়-বিহ্বলতা হয়, তবু আস্বাদনে এতই বিভিন্ন যে প্রণয়-প্রসঙ্গের বিষয় মনে না রাখলেও ক্ষতি নেই। অর্থাৎ কবির অনুরাগ-সম্পর্কিত ঘটনা এক্ষেত্রে সংবাদের অতিরিক্ত অর্থ বহন করেনা। পুনঃ পুনঃ ঐ সংবাদের উত্থাপন কাব্যাস্বাদে কোনও সহায়তা করেনা। 'সুরদাসের প্রার্থনা' কি 'মানস-সুন্দরী'র মত কবিতাপাঠে রবীন্দ্রজীবনীবেত্তার চিত্তে কবির বাসনামোহময় কোনো সম্ভাব্য প্রণয়-ইতিবৃত্ত উদিত হতে পারে এই পর্যন্ত। সেখানেও কবির অভিলষিত পক্ষে সমপ্রণয়ের অস্তিত্ব কল্পনার বিষয় মাত্র। আমাদের

* 'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়' দ্রঃ

অন্য প্রস্তাব এই যে, কবির প্রণয়সংসক্ত অন্ততঃ তিন চারটি নায়িকার প্রসঙ্গ তুললে পূর্বপক্ষের বক্তব্য নিতান্ত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। কারণ, প্রণয় এক-পাত্রগত এবং সুগভীর আত্মিক সম্পর্কে আবদ্ধ না হ'লে রূপান্তরিত এবং সমুন্নীত রহস্যময়তার মধ্যে প্রকাশিত হতে পারে একথা শাস্ত্রে বা ইতিবৃত্তে বলে না। তা ছাড়া ঐ সংসক্তি থেকে সমুদ্ভূত কবিতানিচয়ের কোন্‌টি কার সম্পর্কে এ নির্ধারণে প্রবৃত্ত হ'লে অতি ব্যাপক সুতরাং মূল্যহীন অনুমানের উপর নির্ভর ক'রেই কথা বলতে হয়। ফলতঃ রবীন্দ্রনাথের মত সর্বগ্রাসী প্রতিভাসম্পন্ন গীতিকবির প্রকাশের মর্মমূলে ব্যক্তিজীবনের কোনও ঘটনা বা প্রত্যক্ষদৃষ্ট কোনও একটি প্রবৃত্তিকে কারণরূপে উপস্থাপিত করা চলে না। অবশ্য কবির লেখা স্বল্পমূল্যের কিছু কিছু কবিতা আছে যার কথা স্বতন্ত্র। কেবল সেগুলি নিয়ে রবীন্দ্রকবিপুরুষের বিচার করা সাহিত্যিক অপরাধ।

এই সব নিয়ে আলোচনার সময় প্রথম যে-বিষয়ে একটা পাকাপাকি সিদ্ধান্ত হওয়া প্রয়োজন তা এই যে, যে-কোনও উত্তম গীতিকবির এবং বিশেষভাবে রবীন্দ্রের কাব্যসিদ্ধির পরিচয়গ্রহণে কোন্ ভূমিতে কোন্ মানদণ্ডের আশ্রয়ে আমরা দাঁড়াব। একদিকে স্থূল বহির্ঘটনার ও 'পরিবেশে'র প্রতি আসক্তি, অন্যদিকে প্রমাতার লৌকিক পরিমিতি অনুযায়ী তত্ত্ব-আরোপ এবং বিবিধ জল্পনা-কল্পনার অবকাশে রবীন্দ্র-মানসের স্বরূপ অবধারণ এবং তাঁর সৃষ্টির অপূর্ব চমৎকারের আস্বাদ কোন্ পথে সম্ভবনীয় তা-ই প্রথম ভেবে নেওয়া দরকার। কবি যেখানে সাধারণ মানুষ সেখানে তিনি আর পাঁচজনের মতই শোক-ভয়-আক্ষেপাদির বশীভূত সন্দেহ নেই, কিন্তু যেখানে তিনি কল্পনাপ্রবণ এবং শব্দার্থ-চমৎকারের নির্মাণশীল সেখানে তিনি বাস্তব-সম্পৃক্ত ভাবের নিয়ম মানবেন এমন কোনও কথা নেই। আবার কল্পনা আশ্রয় ক'রে এবং নিজ চিত্তের মধ্যেই একপ্রকার সহানুভব সৃজন ক'রে তাঁরা যা প্রকাশ করেন তাতে তাঁদের প্রত্যক্ষকে উপেক্ষা করার বৃত্তিই প্রবল দেখা যায়। অথবা বলা যায়, কবিদের প্রজ্ঞানে সাক্ষাৎকার এবং চিত্র, প্রতীক, ধ্বনি, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি বক্র পথ অবলম্বন ক'রে সেই অনুভবের প্রকাশ লৌকিক বস্তু থেকে দূরবর্তী, কখনও কখনও এত দূরবর্তী যে সম্বন্ধ-নির্ণয় প্রবল হেত্বাভাসেরই পরিচায়ক হয়ে ওঠে। এসব বিষয়ও আমরা পূর্বেকার গ্রন্থে বলেছি।

বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা পূর্বের থেকে আর একটু ভিন্ন পথ অনুসরণ ক'রে কাব্যাস্বাদ বিষয়ে ঐসব সমস্যাকে যথাসম্ভব পরিহার ক'রেই চলতে চাই।

আমরা তাঁর নির্মাণকে সম্মুখে দেখছি এবং তারই উপর মুখ্যভাবে নির্ভর করছি। এবং যদিও একটি বিশিষ্ট কবিস্বভাব এবং কল্পনাকে বাণীগ্রন্থনের উৎসরূপে লক্ষ্য করছি, তার অতিরিক্ত কোনও তত্ত্বলোক দর্শন করছি না। তারও বাইরের জীবনী-পরিবেশ অথবা ঘটনার কোনও গুরুত্ব আরোপ করতে প্রস্তুত নই। আশা করি, মুখ্যতঃ প্রকাশের বা কবিভাষার উপর নির্ভর ক'রে কাব্য-চমৎকারের স্বরূপ নির্ণয়ের এই প্রয়াস রবীন্দ্র-রসিকদের অনভিপ্রেত হবে না।

'কড়ি ও কোমলে'র কেন্দ্রীয় কোনও মনোভাব থাক না-ই থাক, তার কাব্যিক আকর্ষণ সনেটগুলিতে: এই প্রথম সনেট লিখছেন তিনি, বিহারীলালের শিষ্যত্ব অতিক্রম করতে চাইছেন। সনেটগুলির পরিচ্ছন্নতা, সংযম এবং বাক্-সংক্ষেপ পূর্বেকার উচ্ছ্বসিত আবেগ থেকে কতই না ভিন্ন। প্রভাত-সংগীত এবং সন্ধ্যাসংগীত পড়ুন, তারকার আত্মহত্যা, নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ, কি প্রভাত-উৎসব, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় প্রভৃতি দেখুন, 'কড়ি ও কোমল'কে, বিশেষ এই সনেটগুলিকে পৃথক্ ব্যক্তির এবং বাক্শক্তিসম্পন্ন কবির সৃষ্টি ব'লেই মনে হবে। কয়েকটি সনেট স্পষ্টতই বিষয়কেন্দ্রিক, কয়েকটি নির্বিষয়, কিন্তু রচনার পর নামে গ্রথিত।

সনেটগুলির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলি বিশেষ কোনও রূপভঙ্গিমার প্রতি আনুগত্যহীন। অথচ প্রাথমিক উদ্‌যোগে কবি যে পেত্রার্কা অথবা শেক্‌স্‌পীয়র অথবা রসেটির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন এই-ই প্রত্যাশিত ছিল। মাত্র চোদ্দ পঙ্‌ক্তির রচনা এই অতিসাধারণ বৈশিষ্ট্যেই এগুলি সনেট। নতুবা অষ্টক এবং ষট্‌কের নিরূপিত ভাববিভাগও এতে দেখা যায় না, অষ্টকের মিলবিন্যাসেও যথেচ্ছতা প্রায় সর্বত্র। তবু এ 'রবির লেখা সুন্দরী সনেট।' পরবর্তী কালে বরঞ্চ শেক্‌স্‌পীয়রের ক্বচিৎ অনুসরণ দেখাও যায়, কিন্তু এ কবি যেন স্বকীয় রূপবন্ধনে সহজেই অধিকতর আস্থাশীল। এই সহজ স্বকীয়তার নিতান্ত পরিচয় চৈতালি ও নৈবেদ্যে। ফলতঃ এমন কথাও বলা যায় যে কড়ি ও কোমলের সনেটগুলি নূতনতর ছন্দঃশিল্পে দীক্ষার কোনও পরিচয় রক্ষা করে না, যদিও একথা মানতে বাধা নেই যে নবরূপকল্প নির্মাণের আগ্রহেই শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটেছে।

কড়ি ও কোমলের সনেটনিচয়ে ভাবের অখণ্ডতা নিঃসংশয়িত। কয়েকটি

তো একান্তভাবে বিষয়ের মধ্যেই সীমিত। যেমন, চুম্বন, বাহু, চরণ, তনু প্রভৃতি। এগুলির প্রকাশের সংযম ও অনতিবিস্তৃত অলংকারবৈচিত্র্য লক্ষ্য ক'রে বলা যায় যে এগুলির মধ্যে প্রাচীনধর্মী (ক্লাসিক্যাল) রূপনির্মাণের কিছু আদর্শ অনায়াসে কাজ করেছে। এরকম সংহতি, সংযম ও পরিচ্ছন্নতা অবশ্য আরও পরিস্ফুটভাবে নৈবেদ্যেই দ্রষ্টব্য। কিন্তু কাব্য-সৌন্দর্যে, চিত্র ও স্বপ্নের মিলিত কুহকে এই আদিরসাত্মক খণ্ডকাব্যনিচয় সর্বজনীন আবেদনের দিক থেকে অনতিক্রম্য। এই সনেটগুলির প্রত্যক্ষ আদিরসাত্মক চিত্রের ব্যাপারটি এককালে উচ্ছৃঙ্খলতার দৃষ্টান্তরূপে নিন্দিত হয়েছিল। এখনও এগুলির সৌন্দর্য্য-বিচারে একটা দ্বিধার ভাব যে লক্ষ্য না করা যায় এমন নয়। পদাবলী, কবিওয়ালা ও বিশেষ ভারতচন্দ্রের দেশে এই উন্নাসিক শুচিতা বিচিত্র বৈকি। কিন্তু নিঃসংশয়ে একটা নকল হিন্দুয়ানির নীতিবোধ এবং পশ্চিমাগত পিউ-রিটান মনোভাব তৎকালে বিশুদ্ধ কাব্যরসাস্বাদের আগ্রহে বাধা দিয়েছে। আবার রবীন্দ্রনাথ নিজে তখন আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। এইটুকু ভেবে দেখা উচিত ছিল যে কাব্যগত চমৎকার নীতিধর্মের প্রতি অপেক্ষাহীন। আর স্বপ্নচারী কবির বস্তু এবং ভাষা পূর্বদৃষ্ট অর্থময়তার ধারাকে অতিক্রম ক'রেই চলে। মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের রচনার প্রসঙ্গ বহুল পরিমাণে পরিচিত পুরাতন, এবং তার বিন্যাস শব্দে ও বাক্যে প্রায়শই অভিধেয় অর্থ অতিক্রম করে না। প্রত্যক্ষ থেকে মানস-সৌন্দর্যের চমৎকারও তাঁদের বর্ণনীয় নয়। রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন ও কল্পনা নিয়ে যখন লিখলেন তখন কবিতাগুলির বিষয় এবং বর্ণনের বহিরঙ্গতাই তৎকালীন পাঠক ও সমালোচকদের বিভ্রান্ত করলে। ঐ সব বিষয় অবলম্বন ক'রে যে সৌন্দর্য-স্বপ্ন লীলায়িত হচ্ছে তা ধরবার মত মানসিক প্রস্তুতি এঁদের ছিল না। ঠিক 'চিত্রাঙ্গদা'র আলোচনাতেও এই ভুল ঘটেছে। বসন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের একটি প্রাচীন-অনুসারী স্বপ্নরূপলোক যে সৃজিত হচ্ছে এ বিষয় অনুধাবন করার মত সহানুভবশীল পাঠকচিত্তের অভাব সেদিনও দেখা গেছে। কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলি বহিরঙ্গ বিচারে নগ্ন যৌন-আকাঙ্ক্ষা, হার্দিক বিচারে এর বিপরীত। এর মধ্যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের প্রকাশই লক্ষণীয়, বাসনার রক্তচ্ছটা বিস্তারের অবকাশ যেখানে প্রচুর ছিল সেখানে নিষ্ঠুর সংযম অসামান্যতার বাহক হয়েছে।

'চুম্বন' শীর্ষক কবিতাটি দেখা যাক। প্রাচীন প্রসিদ্ধির অনুসরণে কবি এর মধ্যে মদনের কোনও কার্যকারিতা বর্ণনা করেন নি, অধরের সঙ্গে বিম্বাদি

ফলের তুলনাও নেই, প্রসাধনবিশেষ অর্পণে উপভোগ্যতার সংবর্ধনের দিকেও কবির দৃষ্টি নেই। আর আধুনিক জীববিজ্ঞানতত্ত্বের প্রয়োজন-সাধনের অনুবর্তী যান্ত্রিকতাও কবির লক্ষ্যে পড়েনি। চুম্বনকে তিনি নিবিড় আত্মিক মিলন-ব্যাকুলতার দেহসীমায় প্রাপ্তি ব'লে অভিহিত করেছেন। প্রত্যক্ষ স্বরূপ নির্ণয় করতে না পারলে অলংকার দিয়ে তাকে ব্যক্ত করতে হয়। কবি এই আশ্চর্য অনির্ণেয়-স্বরূপকে ধরতে গিয়ে কয়েক স্থানেই 'যেন' 'বুঝি' প্রভৃতি দিয়ে কল্পনাসম্ভব ও সংশয়াত্মক বাক্য প্রয়োগ করেছেন। কোথাও অতিশয়ের দ্বারা প্রকাশ করতে হয়েছে। আবার রূপক বা Suppressed Metaphorও চুম্বনের সৌন্দর্যাতিশয়কে একটি আকৃতি বা পরিচিত আদর্শের মধ্যে ধরবার সাহায্য করেছে। বক্তব্যের মধ্যে প্রণয়কেই মুখ্যস্থান দেওয়া হয়েছে, দেহকে গৌণ। কয়েকটি উপমানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—নিরুদ্দেশ তীর্থযাত্রা, তরঙ্গলীলা, অক্ষরলিপি, কুসুমচয়ন। এর কোনটিই দেহাত্ম নয়, রূপাতীত অনির্বচনীয়। আর ইতস্ততঃ যে-Personification গড়ে উঠেছে তাতে স্থূলতা ধিকৃকৃত হয়েছে। চুম্বনের মধ্য দিয়ে বিদেহ বাসনালোকেরই ব্যাকুলতা পরিস্ফুট হয়েছে। এইভাবে চুম্বনকে নিয়ে অতিমর্ত্য সৌন্দর্যের একটি জগৎ গ'ড়ে তোলা হয়েছে। কোনও স্থূল উপমা, কোনও রৈখিক বর্ণনাই এ সৌন্দর্যের কাছে যেতে পারে না।

এইভাবে স্থূল রূপের মধ্যে অপরূপের প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ নিহিত হয়েছে 'চরণ' কবিতায়। তরুণীর চরণের সৌন্দর্য নিঃসন্দেহে নারীরূপের অন্যতম বর্ণনীয় বিষয়। সহজিয়া চণ্ডীদাস যে নায়িকার চরণে শরণ নিতে চেয়েছিলেন সে কি শুধু ভাবের আতিশয্যে? সে যাই হোক, বৈষ্ণব কবিদের চরণ-সুষমার ভালো বর্ণনা হ'ল—

> "যাঁহা যাঁহা পদযুগ চলই।
> তাঁহা তাঁহা থলকমলদল খলই॥"
> "চলইতে চরণের সঙ্গে চলু মধুকর
> মকরন্দ পানকি লোভে।" ইত্যাদি।

চরণের সঙ্গে রক্তপদ্ম অথবা স্থলপদ্মের উপমান প্রসিদ্ধ। এদুটি ক্ষেত্রে তা-ই দেওয়া হয়েছে। প্রথমটিতে পরিস্ফুট ভাবে, দ্বিতীয়টিতে ব্যঞ্জনা সহকারে। এরকম প্রসিদ্ধ উপমার ব্যবহারে কিন্তু আধুনিক কবির তৃপ্তি নেই। এই অপার্থিব সৌন্দর্য যেন সাধারণ ভাবে উপমান-নির্দেশ দ্বারা বর্ণনীয়ই নয়।

তাই কবি অত্যন্ত অতিশয়িত উপমান আহরণ ক'রে ঐ অপ্রকৃতেরই সম্ভাব্যতাকে তুলে ধরলেন। ফলতঃ এখানেও সেই উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তির ব্যবহার ঘটলেও উপমানের বিন্যাসে যে মৌলিক পদ্ধতি কবি অবলম্বন করেছেন তাতেই কাব্য অভিনব এবং পুনঃ পুনঃ পাঠ্য হয়েছে। "শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক ঝরিয়া মিলিয়া গেছে" "প্রভাতের প্রদোষের দুটি সূর্যালোক অস্ত গেছে যেন দুটি চরণছায়ায়"—এ দুটি উৎপ্রেক্ষার প্রথমটির "ঝরিয়া মিলিয়া" যাওয়া এবং দ্বিতীয়টির সূর্যলোকের অস্তগমন কবির কল্পনার অভিনবত্বের প্রকাশক। এ দুটি স্পষ্ট কোনও অর্থ ই বলছে না। নিরর্থকতাই এর সৌন্দর্য। "নূপুর কাঁদিয়া মরে" এর personification-এর মধ্য দিয়ে চরণদ্বয়ের সৌন্দর্যাতিরেকের নিবিড় স্পর্শ লাভের অভিলাষ প্রকাশিত। এই বাসনারই একান্ত পরিচয় 'এস গো হৃদয়ে এস, ঝুরিছে হেথায়' ইত্যাদির মধ্যে।

চরণের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ ক'রে কবিতাটি আরম্ভ হয়েছে, তারপর বসন্ত এবং যৌবনের আবেশ, ব্যাকুলতা, বিহ্বলতা, কুসুম এবং সংগীতের প্রাচুর্য বিকীর্ণ ক'রে কবি নিজ সৌন্দয-বেদনার পরিচয় দিয়ে কবিতাটি শেষ করেছেন। কবিতাটির মধ্যে কোথাও শব্দের অপ্রযুক্ততা নেই, অর্থের মনোহারিতাও কুত্রাপি ক্ষুব্ধ হয়নি, আর প্রখ্যাত কোনও পর্যায়ের সনেটের সঙ্গে এর মিলবন্ধনের সাম্য লক্ষিত না হ'লেও রূপ এবং ভাবের অখণ্ডতায় কবিতাটি আমাদের শুদ্ধ সৌন্দর্যানুভবের পরিসর বাড়িয়ে তুলেছে।

'চুম্বন' এবং 'চরণে'র যে বাক্যগ্রন্থন-সৌন্দয প্রথম শ্রেণীর কাব্যমাধুর্য বিস্তার করেছে তার সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে স্থান পেতে পারে 'তনু' এবং 'স্মৃতি।' এই দুটি কবিতাকে ঘিরেও কবির রোম্যান্টিক সৌন্দর্য-পিপাসা চরিতার্থ হয়েছে। 'তনু' কবিতায় দেহের অন্তরালবর্তী বিজন হৃদয়ের প্রতি আকর্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। 'চারিদিকে গুঞ্জরিছে জগৎ আকুল' 'পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা' ইত্যাদি বর্ণনার অতিশয় বাস্তব-বাসনাকে নিঃসন্দেহে অতিক্রম করেছে। তেমনি 'স্মৃতি' কবিতার 'জন্মজন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি' এবং 'জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন' প্রভৃতির বর্ণনায় দেহকেন্দ্রিকতার স্পর্শমাত্র নেই। এই শ্রেণীর বিষয়াধীন সৌন্দযস্বপ্নচারণের কবিতানিচয়ের মধ্যে কবিভাষার বিভিন্ন গুণ যে স্ফূর্তিলাভ করেছে সেকথা পূর্বেই বলেছি। কবির নবগঠিত কল্পলোকই যে নূতনতর চিত্রধর্মী প্রকাশের কারণ তাতে সন্দেহ

নেই। কবির স্বপ্নভিত্তিক চিত্রসৃজনের অন্য দুএকটি দৃষ্টান্তও সমাহরণ করা যেতে পারে।—

(১) শিশু রবি হোথা হতে ওঠে সুপ্রভাতে,
শ্রান্তরবি সন্ধ্যাবেলা হোথা অস্ত যায়।

('স্তন' সম্বন্ধে দ্বিতীয় কবিতা)

'পবিত্র সুমেরু'র সঙ্গে অভেদ-কল্পনার বিস্তার হ'লেও রবির উদয়-অস্তের আশ্রয় রূপে বর্ণনায় এর সৌন্দর্য লোকোত্তর হয়ে উঠেছে। অবশ্য 'শিশু রবি' 'শ্রান্ত রবি' বর্ণনায় ব্যঞ্জনাক্রমে 'শিশু'কে বোঝালে ঐ সৌন্দর্য আর তেমন থাকছে না, শিশুসন্তানেব মাতৃস্তন্য-নির্ভরতার সাধারণ ও পরিচিত বিষয়টিই অলংকারে বিবৃত হয়েছে মাত্র, একথা বলা যেতে পারে।

(২) তোমার হৃদয়াকাশ অসীম বিজন—
বিমল নীলিমা তার শান্ত সুকুমার,
যদি নিয়ে যাই ওই শূন্য হয়ে পার
আমার দুখানি পাখা কনক-বরন।

('হৃদয়-আকাশ' কবিতা)

এই দেহোত্তর অপূর্ব প্রণয়-বর্ণনার অংশটিও 'আকাশের পাখি' এই রূপকের বিস্তার। সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে 'আকাশে'র বিশেষণগুলির প্রয়োগে এবং 'পাখা'র সঙ্গে কনক-বর্ণের যোগে। 'স্তন' আখ্যার প্রথম কবিতাটি সম্পর্কে আমাদের কিছু বিরূপ মন্তব্য আছে। স্পষ্টতই এর প্রাথমিক পরিচিতির মধ্যে যে আদিরসাশ্রিত সৌন্দর্য বিকাশ লাভ করেছে তা খণ্ডিত হয়েছে শেষ-পূর্ব পঙ্‌ক্তির 'কমলাসন জননী লক্ষ্মীর' এই বর্ণনায়। পঙ্‌ক্তিটি ভীরু কবির পুনর্লিখন ব'লেই মনে হয়।

কড়ি ও কোমলের সনেটগুলির দ্বিতীয় একটি শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে ভাবের দিক থেকে। আলোচিত কবিতাগুলিকে ভোগবাদের কবিতা মনে ক'রে অন্যগুলিকে বৈরাগ্যবাদের কবিতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং রবীন্দ্র-চিত্তে ভোগ ও বৈরাগ্যের অস্তিত্ব নিয়ে নানান তত্ত্বকথার অবতারণা করা হয়েছে। আমাদের আলোচনা-ধারায় ঐ সব তত্ত্ব কথার অবকাশ নেই। আমরা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সনেটগুলিকেও তাঁর কাব্যবিলাস ব'লেই মনে করি, তবে উৎকৃষ্ট কল্পনা-মুহূর্তের প্রকাশ ব'লে মনে করি না। এই কবিতা-গুলির মধ্যে আমাদের অভিলষিত শব্দার্থ-সৌন্দর্য অবিদ্যমান। 'একটি সনেটের

প্রকাশ দেখুন, যেন অর্থের সঙ্গে অর্থ মিলিয়ে কোনক্রমে খাড়া করা হয়েছে। অর্থে অতিপরিস্ফুটতাই এগুলির দোষ, এতে কল্পনাশক্তিবলে নিগূঢ় নির্মাণের চিহ্ন নেই।—

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে, দাঁড়াও সরিয়া।
ম্লান করিয়ো না আর মলিন পরশে।
ওই দেখো তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া,
বাসনা-নিশ্বাস তব গরল বরষে।
জান না কি সংসারের পাথার অকূল,
জান না কি জীবনের পথ অন্ধকার।
আপনি উঠেছে ওই তব ধ্রুবতারা,
আপনি ফুটেছে ফুল বিধির কৃপায়।......

(পবিত্র প্রেম)

বিষয়বস্তু হিসাবে কবিতাটি কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে লেখা (কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর) ব'লে মনে করা যেতে পারে। কবিতাটির মধ্যে কবির ব্যক্তিগত আবেগ কিছু প্রকাশিত হলেও স্বপ্নকল্পনা কিছু মাত্র নেই। এজন্য অত্যন্ত গতানুগতিক হয়েছে। তিলি তিলে মৃত্যু, বাসনা-নিশ্বাস, সংসার-পাথার প্রভৃতি কোনও নির্মিতির পরিচয় দেয় না। স্পষ্ট অর্থ বহন করে, এমন বাক্যের সমাবেশ করা হয়েছে, ব্যঞ্জনার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজনই বোধ করা হয় নি। অনুরূপ অর্থপ্রধান সংবাদবহ বা নীতিবাক্যকল্প অসুন্দর পদাবলী হ'ল—

"সুখশ্রমে আমি, সখী, শ্রান্ত অতিশয় ;
পড়েছে শিথিল হয়ে **শিরার** বন্ধন।
অসহ্য কোমল **ঠেকে** কুসুমশয়ন
... ...
রবির ছবির মতো **যেতেছি গড়ায়ে**"
"ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ"
"এ মোহ কদিন থাকে এ মায়া মিলায়,
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে।"
"মিছে হাসি, মিছে বাঁশি, মিছে এ যৌবন
মিছে এই দরশের পরশের খেলা।

চেয়ে দেখো, পবিত্র এ মানবজীবন
কে ইহারে অকাতরে করে অবহেলা।
ভেসে ভেসে এই মহা চরাচর-স্রোতে
কে জানে **গো** আসিয়াছে কোন্‌খান হতে…"

পুষ্টদেহ শব্দগুলির অসৌন্দয বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গদ্যাত্মক বাক্যে মধ্য-ভাগে অসমাপিকার স্থাপন প্রায়শই কৃত্রিম লাগে। আমরা বলি, এই শ্রেণীর কবিতায় কিছু অর্থ থাকলেও কবিচিত্তের নিয়ামক কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভাব নেই। একটা সাময়িক ভাব বা Emotion থাকলেও তার সঙ্গে কল্পলোকের কোনও যোগ স্থাপন সম্ভব হয় নি। কিন্তু আদিবসাত্মক কল্পলোক থেকে সৃষ্ট নয়, আবার অতিরিক্ত ভাবার্থের দুর্ঘটন থেকে মুক্ত কয়েকটি সনেটও রয়েছে যেগুলির কল্পচিত্র অভিনব এবং তুলনায় দ্বিতীয়রহিত। শ্রেণীবিন্যাসতৎপর রসিকেরা এদের কোন্ কোটিতে ফেলবেন?

বৈতরণী

অশ্রুস্রোতে স্ফীত হয়ে বহে বৈতরণী
… … … …
পূর্ব তীর হতে হুহু আসিছে নিশ্বাস,
যাত্রী লয়ে পশ্চিমেতে চলিছে তরণী।
… … … …
ওই বুঝি দেখা যায় ছায়া পরপার,
অন্ধকারে মিটি মিটি তারাদীপ জ্বলে।
হোথায় কি বিস্মরণ নিঃস্বপ্ন নিদ্রার
শয়ন রচিয়া দিবে ঝরা ফুলদলে।
অথবা অকূলে শুধু অনন্ত রজনী
ভেসে চলে কর্ণধার-বিহীন তরণী॥

বৈতরণীতে তরণী-যাত্রার চিত্রকল্পগুলির অনির্দিষ্টতা এবং অপ্রত্যক্ষতার জন্যই কবিতাটি এমন আশ্চর্য সুন্দর হতে পেরেছে। "হোথায় কি বিস্মরণ" ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের কী অর্থ? অথচ মৃত্যু-পরপারের এর চেয়ে সুন্দর কল্পনা রোম্যান্টিক কবিদের এমনকি রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেই কি খুব বেশি ফুটেছে? কড়ি ও কোমলে এরকম শুদ্ধ স্বপ্নচ্ছবির পরিচয় বেশ কিছু পাওয়া যায়। সুতরাং

রাবীন্দ্রিকতা নেই ব'লে কড়ি ও কোমল সম্বন্ধে আমাদের যে অপকৃষ্টতার ধারণা তার পরিবর্তন করতে হবে। এইরকম আর একটি সনেট হ'ল 'অক্ষমতা'। 'এ যেন রে অভিশপ্ত প্রেতের পিপাসা'। এটিকে ঐ নীতি ও অর্থসম্বল কবিতাগুলির মধ্যে ফেলা যায় অর্থের দিক থেকে। কিন্তু কাব্যসৌন্দর্যের দিক দিয়ে ভিন্নতা উপলব্ধ হবে যে-কোনও কাব্যরসিকেরই। এটি পুরোপুরি 'ইংরেজি সনেট'। কল্পচিত্রাঙ্কন নেই, কিন্তু ব্যঞ্জনা আছে, সাধারণ উক্তি থেকে এর উক্তি ভিন্ন—

'দুটি চরণেতে বেঁধে ফুলের শৃঙ্খল
কেবল পথের পানে চেয়ে বসে থাকা'

কড়ি ও কোমলে রবীন্দ্রনাথ সংহত স্বপ্নের এবং অনির্দিষ্ট কল্পচিত্র নির্মাণের কবি। প্রকাশে স্থানে স্থানে দৈন্য থাকলেও এর শুদ্ধ কাব্যসুষমা বিতর্কের অতীত। পরের কাব্যগুলিতে কল্পনা ভিন্ন স্বভাব পরিগ্রহ করেছে, সুদূরচারী হয়ে তত্ত্বলোক স্পর্শ করেছে। কিন্তু একথা বলার উপায় নেই যে কোনও তত্ত্বের প্রভাবে প'ড়ে কবি কাব্যরচনা করেছেন। তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের যে উদ্ভব-সম্পর্ক নেই এবং আমরা অতিশয় তত্ত্বজ্ঞ ব'লেই যে স্থানে-অস্থানে তত্ত্ব দেখে থাকি এরই প্রমাণরূপে কড়ি ও কোমলের একটি কবিতার শেষাংশ উদ্ধৃত করে এই আলোচনার উপসংহার করছি—

কুসুমদলের বেড়া, তারি মাঝে ছায়া,
সেথা বসে করি আমি কল্পমধু পান ;
বিজনে সৌরভময়ী মধুময়ী মায়া
তাহারি কুহকে আমি করি আত্মদান ;
রেণুমাখা পাখা লয়ে ঘরে ফিরে আসি
আপন সৌরভে থাকি আপনি উদাসী ॥

রবীন্দ্রনাথের কবি-গৌরব যেমন তাঁর বাহ্য চারিত্র ও কর্মের মাহাত্ম্যের উপর স্থাপিত নয়, তেমনি তাঁর তত্ত্বগ্রহণের মধ্যেও নয়।

কড়ি ও কোমলের সনেটগুলির সংহত ও সীমিত বাণীবৈচিত্র্য শীঘ্রই স্বপ্নোচ্ছ্বাসের মধ্যে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু আমাদের কবি অত্যন্ত সুকবি ব'লেই ভাষা ও ছন্দের ললিত-তরল বিলাসকে আশ্রয় ক'রে থাকতে পারেন নি। মাত্রাবৃত্ত বা যৌগিক-দ্বিমাত্রিক ছন্দের মধ্যস্থতায় প্রকাশিত

আবেগ-উচ্ছ্বাসময় কবিতাগুলিতেই লঘুতা, তরলতা ও আবেগ-উচ্ছ্বাসের ব্যাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু মেঘদূত এবং অহল্যার প্রতি, যেতে নাহি দিব, স্বর্গ হইতে বিদায়, এবার ফিরাও মোরে, উর্বশী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিতে লঘুতা এবং তরলতাকে কবি অতিক্রম করেছেন। বলা বাহুল্য, এগুলি অক্ষরমাত্রিক ছন্দঃপদ্ধতিতে লেখা এবং এগুলির রচনাবিষয়ে মধুসূদন-নবীনচন্দ্র-বাহিত পূর্বসংস্কার কবিচিত্তে নিঃসন্দেহে কাজ করেছে। তবু উচ্ছ্বাসের বশবর্তিতা এই সব কবিতার স্থানে স্থানে উন্নত কবিকৃতির যে হানি ঘটিয়েছে, সেবিষয় পরে দেখানো হচ্ছে।

আমরা এক্ষেত্রে সন-তারিখ পর্যায়ক্রমে বা কবিমানসের আবর্তন-বিবর্তন অনুসারে কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত নই, তবু যেহেতু রচনার বিকাশের একটা ধারা মানতেই হয় এবং সাধারণভাবে একটা নিয়ম রক্ষা করাও ভালো, সেই হেতু কবির রচনার একটা ক্রম অনুসারে চলতে গিয়ে মানসী সোনারতরী চিত্রা পর্বও এই অধ্যায়ে আলোচনা করছি।

খাঁটি বাঙ্‌লায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অনায়াস স্ফুরণের যে প্রাথমিক চপলতা তা মানসীর কতকগুলি কবিতায় প্রাপ্তব্য। অতিরিক্ত স্বপ্নালুতা এবং উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যও এই নবাগত ছন্দঃপদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত। ভানুসিংহের পদাবলীতে অনুকরণের মধ্যবর্তিতায় অজ্ঞাতে যে-ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা, এখানে তারই স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ বলা যায়। কিন্তু মানসীতে বা কাছাকাছি সময়ে আট মাত্রার পর্বনির্মাণ নেই। মাত্রাবৃত্তে এই দীর্ঘপর্বনির্মাণের দীক্ষা তাঁর ঘটেছে সংস্কৃতে অনুরাগ সঞ্চারের ফলে, যখন তৎসমশব্দের অনুপ্রাস-মাধুর্য তাঁর করায়ত্ত হয়েছে। মানসী কাব্যে ছয়, সাত ও পাঁচমাত্রার পর্ব নিয়ে পরীক্ষা ও তারপরে ছ'মাত্রার পর্বের দিকে কবির প্রবণতা ও সেবিষয়ে প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শুধু মাত্রাবৃত্ত ছন্দ নিয়েই নয়, অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতিতে লেখা কবিতাগুলির মধ্যেও চরণবিন্যাস, স্তবকনির্মাণ ও মিল-যোজনার বৈচিত্র্য একটি আত্মপ্রকাশশীল উন্নত কবির প্রাথমিক পরিচয় বহন করে।

আমাদের গভীর সন্দেহ, ব্রজবুলি অথবা প্রাকৃত অথবা সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দঃ নির্মাণের মূলে আমাদের সংগীতপদ্ধতি অর্থাৎ সুর ও তাল দুইই কাজ করেছে। পরবর্তী কালের অক্ষরমাত্রিক ছন্দে, অন্ততঃ তালপাত ও যতি পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কবিতার

যেখানে যেখানে যতিপাত ঘটছে, সেখানে সংগীতের স্বরতালের একটি এককও সম্পূর্ণ হচ্ছে। কবিতাকে সংগীতে রূপান্তরিত করতে গেলে তার যতির ঐ বৈশিষ্ট্যটুকু মানতেই হয়। অর্থাৎ সেখানে গীতের তালশেষ ও তালারম্ভ ধরতেই হয়। রবীন্দ্রসংগীতে দীক্ষিত এবং বাঙ্‌লা কাব্যাঙ্গ গীতের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তি নিশ্চয়ই এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন। আমাদের গীতিবিশারদ কবি তাঁর প্রাথমিক গীতিকাব্যে সংগীতের সুরতাল থেকেই মাত্রাবৃত্ত-কবিতার পাচ ছয় সাত মাত্রার ছন্দঃপদ্ধতি অনায়াসেই পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই গীততালাত্মক মনোভঙ্গি কবিতায় যে সর্বত্র সমঞ্জস রূপ গ্রহণ করেছে এমন বলা যায় না। যেমন বলা যায় "ছিলাম নিশিদিন—আশাহীন—প্রবাসী" এবং "একদা এলোচুলে—কোন্ ভুলে—ভুলিয়া" প্রভৃতি পঙ্‌ক্তির কবিতা দুটি। এগুলিতে কবি যতি দিয়েছেন ৭+৪+৩ এ। কিন্তু এ পাঠে চারমাত্রার পূর্ণ যতিতে ঠোক্কর খেতে হয়। ৭+৭এ বেশ পড়া চলে। অবশ্য চারমাত্রার পর যে অর্ধযতি স্থাপন করা না যায় এমন নয়। সেক্ষেত্রে (৩+৪) + (৪+৩) এই পাঠ হবে এবং শ্রুতিযন্ত্রেও প্রত্যাশা-বিরোধী হবে না। এখানে ঐ নির্দেশিত চারমাত্রার পরে হয়ত গানের প্রথম তালশেষ এবং সেই হিসেবেই কবি বিভাগ ধরেছেন, কিন্তু সুরতালের এককের শেষ সেখানে নয়। দেখা যায়, কবি পরে আর এরকম চোদ্দমাত্রার চরণের ঐ তালবিন্যাস রাখেন নি। "এমন দিনে তারে—বলা যায়" প্রভৃতিতে ৭ মাত্রাতেই সংগীতের তাল। বস্তুতঃ এটিরও ৭+৪ এর ছন্দে কবিতায় পাঠ একটু শ্রুতিকটু সন্দেহ নেই। কি অক্ষরমাত্রিক, কি মাত্রাবৃত্ত, চরণান্ত মিল এবং চরণের মধ্যবর্তী মিলের সংযোগে বিচিত্র স্তবক গঠনের প্রয়াস 'মানসী'র বৈশিষ্ট্য। এর পরিচয় বহু কবিতাতেই পাওয়া যাবে।

এই শ্রেণীর নবগীতি-উৎসারের প্রাথমিক কবিতানিচয়কে* প্রণয়ের কবিতা বললে ক্ষতি নেই। কিন্তু এগুলির অর্থসংগতি এতই ক্ষীণ এবং শব্দগ্রন্থনের সূত্র ও শব্দশক্তি এতই দুর্বল যে এগুলিকে কাব্য-প্রলাপ বলা যেতে পারে। এগুলিতে হয় ছন্দের মিলের জন্য শব্দার্থের সৌন্দর্যকে অবহেলা করা হয়েছে, নয়, ব্যঞ্জনাহীন মিশ্রগদ্যের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। "হৃদয় যেন পাষাণহেন বিরাগ-ভরা বিবেকে" প্রভৃতি তার উদাহরণ। ছন্দের

* 'কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া' 'বুঝেছি আমার নিশার স্বপন' 'ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী' 'আবার মোরে পাগল ক'রে দিবে কে' 'আমি এ কেবল মিছে বলি'—ইত্যাদি

মধ্যে অতিতরলতার দৃষ্টান্ত—'ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে······দূর থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে'। এখানে এবই মধ্যে বক্র সৌন্দযের প্রকাশ ঘটত যদি প্রথম কলিটি বদলে' লেখা হত 'ব্যথা দিয়ে কবে কয়েছিলে কথা পড়ে না মনে।'

আসল কথা, একান্ত ব্যবহারিক বাঙ্লা ধ্বনিসৌন্দর্যহীন ব'লে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পক্ষে তেমন উপযোগী নয়। উপযুক্ত তৎসম বা শোধিত তৎসম (ও তদ্ভব, যেমন ব্রজবুলি) হ'লে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সীমিত দীর্ঘীকরণ ও অনুপ্রাসের চারুতা ফুটে ওঠে। তবু লৌকিক বাঙলাবই পদসংস্থাপন নির্বাচিত এবং বক্রতাযুক্ত হ'লে এবং পর্বান্ত মিল যুক্ত হ'লে সৌন্দয ফুটে উঠতে পাবে। 'মানসীর' এই শ্রেণীর কবিতাগুলির ভাষায় নিপুণ হস্তের স্পর্শ নেই, এর মূলে নেই কবির চৈতন্যলোকের দীপ্তি।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ এবং লৌকিক গদ্যরীতির ভাষা বরং 'সুরদাসের প্রার্থনা'য় স্থানে স্থানে কিছুটা বক্র বৈচিত্র্য লাভ করেছে। এর বলিষ্ঠতাময় অর্থসংগতি ও মানসীর এই শ্রেণীর অন্য কবিতায় নেই। যদিও একথা ঠিক যে উচ্ছ্বাসের আধিক্যের জন্য অতিকথন এবং একই বিষয়েব পুনঃপুনঃ উদ্দীপন দোষ এতে ঘটেছে। এর প্রারম্ভে 'অতি অসহন বহ্নিদহন' ছন্দ ও উক্তির চাতুযেব নিদর্শন। 'পবিত্র তুমি, নির্মল তুমি' প্রভৃতি দুই বা চার পঙ্ক্তিব মধ্যে প্রকর্ষ এবং বিষমের চমৎকারিতা ফুটেছে। এর পরবর্তী "তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই শক্তি" প্রভৃতি কয়েক পঙ্ক্তি যেন সহসা অভ্যুদিত হয়ে বিষয়ের ক্রম ভঙ্গ করেছে। এই স্তবকটি কোনও কোনও সংকলনে ন্যায্যভাবেই পরিত্যক্ত হয়েছে। মূল বিষয়টি বিবৃত হওয়ার পর এবকম স্তব গ্রথিত হ'লে বরং শোভিত হ'ত। ফলতঃ প্রথম স্তবকের ভূমিকার পরেই "তোমারে কহিব লজ্জাকাহিনী" ইত্যাদি বাক্য সংগত। "নিরখি তোমারে ভীষণ মধুর" এই বিবৃতির উপমায় "উদ্যত যেন বাজ" প্রভৃতি শুধু ভীষণেত্বরই দ্যোতক হয়েছে। মোহচঞ্চল লালসাকে কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমরের সঙ্গে সার্থকভাবে উপমিত করলেও ধৃষ্ট ভ্রমরের বাসনা-প্রকাশকে বিরক্ত নারীর কাছে গুন্ গুন্ ধ্বনি এবং ক্রন্দনরূপে অভিহিত করলে ঠিক বর্ণনা কবা হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু কবির উপমান প্রয়োগের এবং অন্যবিধ বৈচিত্র্য সম্পাদনের দ্বারা বক্তব্যেব উৎকর্ষ বর্ধনের শক্তিও এ কবিতায় দেখা যায়। 'ছুরি'র প্রভাতরশ্মি উপমান এখানে খুবই সার্থক, কারণ এর বিপরীত কোটির 'বাসনা সঘন' নয়ন কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষু যদিও

দেহেরই অংশ, তবু দেহবাসনার মালিন্য উৎপাদন করার দিক থেকে এর গভীর কার্যকারিতা ব্যঞ্জনা করার জন্য একে অতিশয়িতভাবে দেখা হয়েছে এবং এই দেখা যে খুব চমৎকারজনক হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই—

এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই,
ফুটেছে মর্মতলে—

এর পর চলেছে কবি সুরদাস বা আমাদের কবির বাসনা-বিক্ষোভের কারণ-পরম্পরার বিস্তৃত বিবরণ। যদিও সাধারণভাবে বলা যেত যে যৌবনের অন্যতমঃ এই বিকৃতির কারণ ('যৌবনমত্রাপবাদ্ধং ন চাবিত্র্যং'—মৃচ্ছকটিক), তবু আমাদের কবি একে কবিসুলভ নিসর্গতন্ময়তা, কল্পনায় মূর্তি সৃজন এবং শ্রান্তহৃদয়ে মানবীর বাস্তবরূপের কাছে আত্মসমর্পণের স্পৃহা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপারের ফল রূপে দেখতে আগ্রহশীল। এরকম কারণ-বিন্যাস সন্তোষজনক এবং সুবোধ্য হয় নি :—

অপার ভুবন, উদারগগন, শ্যামল কাননতল,
……ইহারা আমারে ভুলায় সতত, কোথা লয়ে যায় টেনে!
……আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে, ফুল মোরে ঘিরে বসে,
……বাড়ে তৃষা, কোথা পিপাসার জল অকূল লবণ-নীরে।
গিয়েছিল দেবী সেই ঘোর তৃষা তোমার রূপের ধারে—

এইভাবে নিসর্গভাবুকতা থেকে আসঙ্গ-লিপ্সায় রূপান্তরের একটা পরিচয় দেওয়া হয়েছে। হয়ত এই অংশে শেলির স্বপ্নচারণের কিছু প্রভাব রয়েছে, হয়ত বা কবিতাটির নির্মাণের মূলে কবির নিজ জীবনের কোনও অনুভব কাজ করেছে। সেক্ষেত্রে কবিতাটি একটি ইতিবৃত্ত মাত্রে পযবসিত হয়েছে বলা যায়। বাসনার যে রক্তরাগ পরনারীলুব্ধতার কারণ, তার বিকাশের এবং স্মৃতিকালের বিস্ময়জনক মানসিক চিত্রও এর মধ্যে নেই, আর এই আবেশ যখন কাটল তখনকার অনুভবের সূক্ষ্ম পরিচয়ও এ কবিতায় পাওয়া যায় না। উপসংহারে "থামো একটুকু……ভালো করে ভেবে দেখি" ব'লে যে পুনশ্চ যোজনা করা হয়েছে তাতে পাঠকের কোনও প্রত্যাশার পরিতৃপ্তি ঘটছে না। নিজ চক্ষু উৎপাটিত করার মধ্যে যে করুণ দুর্দৈব বর্তমান সুরদাসের রূপকে তার পরিস্ফুটনের আবশ্যকতা ছিল। অপিচ, "বাসনামলিন আঁখিকলঙ্ক" প্রভৃতি বর্ণনায় যে ঋজুতা বর্তমান তাতে নৈতিক ব্যাপারের দিক প্রবল হয়ে উঠেছে।

এই ধরণের নীতিপ্রচার আরও প্রকট হয়ে উঠেছে **"নিষ্ফল কামনা"** কবিতায়। কবিতাটির প্রারম্ভে অমিত্র ছন্দ এবং উক্তির বলিষ্ঠতার মধ্যে যে অসহায়তা, বিহ্বলতা এবং অপ্রাপ্তির বেদনা নিয়তির নির্মমতার করুণ সংগীত ধ্বনিত করেছে কবি স্বহস্তে তার কণ্ঠরোধ করেছেন এই কল্পনাকুল বিষাদের নৈতিক ব্যাখ্যা নিবদ্ধ করে।

দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি মাঝে।
খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি।

এই হ'ল বিশ্বজনীন ব্যাকুল অন্বেষণ। অমিত্রাক্ষরের ছয়, আটের পর্বকে চরণে নানাভাবে সাজিয়ে এবং এর সঙ্গে চারমাত্রার পর্বার্ধের যোগবিয়োগ সাধন ক'রে বক্তব্যকে দোলায়িত করতেই ঐ চমৎকার ফুটে উঠেছে। এরই বিপরীত কোটির, আইডিয়া এবং তত্ত্বের বিবৃতিরূপ সৌন্দর্যহীন বাক্য হ'ল—

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
······বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি ;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা ছুরি দিয়ে······
লও তার মধুর সৌরভ······
ভালোবাসা, প্রেমে হও বলী,
চেয়োনা তাহারে।

এই উপদেশ যদি না থাকত, যদি মানুষের অসহায় অবস্থার পরিচয়কেই কারণ-রূপে নির্দেশ করা হত তাহ'লেও এর কাব্যসৌন্দর্য এমন নির্মমভাবে খণ্ডিত হ'ত না। এই অংশ ছন্দোবদ্ধ গদ্যমাত্র, রূপক অলংকারে ঐ বস্তুকেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কোনও ব্যঞ্জনার চারুতা ফুটিয়ে তোলা হয় নি। নিম্নলিখিত স্থানে কবিতাটির সমাপ্তি ঘটলে কোনও আপত্তির কারণ থাকত ব'লে মনে হয় না—

যে জন আপনি ভীত কাতর, দুর্বল,
ম্লান, ক্ষুধাতৃষাতুর, অন্ধ, দিশাহারা,
······সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন-তরে ?

এই অংশে বক্র বিশেষণের প্রয়োগে মানুষের সঙ্গ-বাসনার ব্যর্থতা দেখানো হয়েছে।

এই পর্যায়ের মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সর্বোৎকৃষ্ট রচনা হ'ল **'বর্ষার দিনে'**—এমন দিনে তারে বলা যায়—প্রভৃতি। এর সবচেয়ে প্রকট কাব্যগুণের লক্ষণ হ'ল আবেগ-উচ্ছ্বাসের সংযম। প্রিয়তমার কাছে প্রণয়-নিবেদনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত চলে যাচ্ছে—এই নিয়ে অথবা সামাজিক বাধা নিয়ে বাগ্‌বিস্তার করা চলত বহুদূর পর্যন্ত। 'ভৈরবী গান' কবিতায় স্বপ্নবিলাসের আগ্রহ প্রকাশের ব্যপদেশে ললিত ভাষায় অতি কোমলতার ঐরকম বিস্তৃতিই ঘটানো হয়েছে। 'বর্ষার দিনে' কবিতাটি নিঃসন্দেহে একটি আবেগময় প্রণয়-কবিতা। সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে প্রণয়-কবিতার প্রাধান্য না থাকলেও খুব অপ্রাচুর্য নেই। আর এই সব কবিতায় তিনি যে সর্বত্র অসীমের তুরীয়তায় আমাদের নিয়ে গেছেন এমনও নয়। আমাদের একান্তভাবে ঘরের কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাস্তব প্রণয়-পিপাসাকে ছন্দে ও রমণীয় বাক্যে আনন্দময় চারুতায় সমুত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। এই কবিতাটি এই শ্রেণীর অন্যতম স্মরণীয় কবিতা। কবিতাটি তাললয়-সমন্বিত গীত রূপেই কবির চিত্তে অস্পষ্টভাবে বেজে উঠেছিল। এর প্রারম্ভে এক পঙ্‌ক্তির মধ্যে সুচারুভাবে মূল বক্তব্যটিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে—'এমন দিনে তারে বলা যায়'। 'এমন দিনে' কথাটিকে বিস্তৃতভাবে বোঝালে কবির উক্তি এরকম হয়ে পড়ে—"আজ বলা সহজ। আজ সমস্ত আকাশ যে মরিয়া হয়ে উঠল, হু হু করে কী-যে হেঁকে উঠছে তার ঠিক নেই, তারই ভাষায় আজ বন-বনান্তর ভাষা পেয়েছে, বৃষ্টিধারায় আবিষ্ট গিরিশৃঙ্গগুলো আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল······ ঠিক মনের কথাটি বলার লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল! এর পরে যখন কেউ আসবে তখন কথা জুটবে না, তখন সংশয় আসবে মনে, তখন তাণ্ডবনৃত্যোন্মত্ত দেবতার মাভৈঃ-রব আকাশে মিলিয়ে যাবে। বৎসরের পর বৎসর নীরবে চলে যায়, তার মধ্যে বাণী একদিন বিশেষ প্রহরে হঠাৎ মানুষের দ্বারে এসে আঘাত করে। সেই সময়ে দ্বার খোলবার চাবিটি যদি না পাওয়া গেল তবে কোনোদিনই ঠিক কথাটি অকুণ্ঠিত স্বরে বলবার দৈবশক্তি আর জোটে না। যে দিন সেই বাণী আসে সে দিন সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে খবর দিতে ইচ্ছে করে—শোনো তোমরা, আমি ভালোবাসি!" শেষের কবিতায় লাবণ্যের প্রেম-ব্যাকুলতার এই মুহূর্তটির চিত্র ঐ কবিতারই গদ্যভাষ্য বলা যেতে পারে, কিন্তু কবিতাটির সংহত ভাষণে কয়েকটিমাত্র বাক্যে ঐ কথাটিই চারুত্বময় ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। প্রথম পঙ্‌ক্তিটির কাব্যসিদ্ধি বিশেষভাবে নির্ভর

করছে 'তারে' এই সর্বনামের উপর। 'প্রিয়ারে' কি 'প্রিয়তমারে' প্রভৃতি নির্দিষ্ট শব্দের ব্যবহারে এ চারুতা ফুটত না। দ্বিতীয়-তৃতীয় পঙ্‌ক্তিগুলিতে বিশেষ দিনটিরই রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই প্রণয়-বিকারের মূলে বর্ষার পরিবেশই যেহেতু মুখ্যভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে সেইজন্য মূল বিষয়টি ব্যক্ত ক'রে সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবেশ-বর্ণনে মনোযোগ সমধিক চমৎকারজনক হয়েছে। মধ্যভাগে প্রসঙ্গক্রমে মানবহৃদয়ের চিরকালের সত্য কথাটি কত অনায়াসেই পরিব্যক্ত হয়েছে !—

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব,
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব।

পরিশেষে সংক্ষিপ্ত নিসর্গ-চিত্রের সঙ্গে প্রণয়ী-হৃদয়ের বেদনার শেষ ভাষণটুকু উপসংহারে কারুণ্যময় যে-সৌন্দর্যের সঞ্চার করেছে তার তুলনা বাঙ্‌লা গীতিসাহিত্যে বিরল বললেই চলে—

যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়।

লৌকিক সাধারণ ভাষায়, সংস্কৃত বাক্‌সৌন্দর্যের প্রত্যাশী না হয়ে, এ ধরণের কাব্যসৃষ্টির এটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত। সমগ্র কবিতাটির মাঝে যেন অতিকথনের বা অকথনের কোনও ফাঁক নেই, সব নিরেট ক'রে গাঁথা, একটি বাক্যও বাদ দেওয়ার কোনও উপায় নেই। এর মিলবন্ধন সুপরিমিত এবং ৩+৪-এর নিরূপিত অর্ধযতি-বন্ধনে কবিতাটি আদ্যন্ত সৌষম্যময়। এর করুণ-কোমল সৌন্দর্য পরুষাক্ষর স্পর্শে কুত্রাপি খণ্ডিত হয় নি। কবির পরবর্তী অন্য কয়েকটি উৎকৃষ্ট গানের মধ্যেই এ ধরনের সংযম ও ব্যঞ্জনাময় সৌন্দর্যের প্রকাশ দেখা যায়। নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রকবিতানিচয়ের মধ্যেও এটি একটি উৎকৃষ্ট কবিতা।

এই প্রাথমিক পর্যায়ের প্রবহমানসৌন্দযময় অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতিতে লেখা কবিতানিচয়ের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ হ'ল **"মেঘদূত"**। এর পঙ্‌ক্তি ও স্তবক নির্মাণে অন্য কোনও বৈচিত্র্য নেই, কেবল অমিত্রাক্ষরের মূল ছন্দোগুণ বজায় রেখে অন্ত্যানুপ্রাসের বিন্যাসের দ্বারা এক অতিরিক্ত চারুতা এতে অর্পিত হয়েছে। ঐ মিলবিন্যাস প্রণয় ও প্রকৃতির কবিতায় বিস্ময়-করুণ-

শান্তরসের উদ্দীপনে কবির অভিপ্রেত সিদ্ধ করেছে সন্দেহ নেই। কবিতাটিতে উচ্ছ্বাসময় ভাষণের নিদর্শন থাকলেও তাতে অখণ্ড অনুভবের প্রকাশ বিক্ষুব্ধ হয় নি। কবিতাটির দীর্ঘতার কারণ কবির প্রাচীন সৌন্দর্য-চিত্রের স্মৃতির মধ্যে পরিভ্রমণের আনন্দ। সাধারণতঃ উত্তম গীতিকাব্যের অবয়ব গীতের মতই স্থায়ী, অন্তরা, আভোগ, সঞ্চারী ক্রমে বিন্যস্ত এবং সংক্ষিপ্ত থেকে মধ্যমানের হলেও স্থানবিশেষে, যেমন কাহিনী-প্রসঙ্গে, বস্তুরূপ-সংস্পর্শে, স্মৃতিচারণায় এর দীর্ঘতা অবশ্যম্ভাবী। 'মেঘদূত' কবিতায় কবি স্মৃতি-চারণের এবং বর্ণনার লোভ সংবরণ করতে পারেন নি।

কবিতাটির প্রথমাংশে মেঘদূত কাব্যের স্বরূপ, প্রিয়াবিরহের সংগীত হিসাবে এর গুরুত্ব ও প্রভাব, বিরহোৎকণ্ঠার উদ্দীপনে বর্ষাঋতুর কার্যকারিতা প্রভৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে। এরপর পূর্বমেঘে বর্ণিত কয়েকটি নিসর্গবস্তু ও জনপদের অনুবর্ণনে কবিচিত্তের সৌন্দর্য-অনুরাগ ব্যঞ্জিত হয়েছে। পরিশেষে উত্তরমেঘের অলকাপুরীর নিত্যসৌন্দর্য ও তার মধ্যবর্তিনী বিরহিণীর অপার্থিব সত্তার ব্যঞ্জনা দিয়ে এবং কবির নিজ অন্তরের একটি স্থায়ী বিরহ-আকৃতির পরিচয় সন্নিবিষ্ট ক'রে কবিতাটি সমাপ্ত হয়েছে। 'মেঘদূত' কাব্যকে অবলম্বন ক'রে কবির এই বিরহ উদ্দীপিত হয়েছে ব'লে তিনি মেঘদূতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে কবির বিরহভাবুকতার মূলে কাল্পনিক নারীমূর্তির চিত্র রয়েছে। এই ধরণের বিরহ-চেতনা পরে কবির বহু উত্তম কবিতার আবির্ভাব ঘটিয়েছে। নিঃসন্দেহে কবির চিত্তে কাল্পনিক বিরহ গঠনে মেঘদূত প্রবলভাবে সাহায্য করেছিল। এই কবিতাটির শেষাংশে তাই কবিচিত্তের আর্তি তীব্রভাবেই প্রকাশ পেয়েছে—

কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ?
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ?

প্রশ্নবাক্যে পরপর একই চরণান্তর্গত হয়ে ত্রিধা বিভক্ত এই আর্তি কবিতাটির উপসংহারকে উত্তম গীতিকাব্যের মূল্য দিয়েছে। 'কে দিয়েছে হেন শাপ' এই উক্তিতে মানুষের প্রণয়-বাসনার অপূর্ণতার ট্র্যাজেডি ব্যঞ্জিত হয়েছে, যদিও পঙ্‌ক্তিগুলির গ্রন্থন কিছুটা গদ্যধর্মী হয়ে পড়েছে। কবিতাটির সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে আকর্ষণের অন্যতম কারণ হ'ল মূল কবির পূর্বমেঘ ও

উত্তরমেঘের সৌন্দর্যচিত্রগুলির পুনরুল্লেখ। মূল মেঘদূতে বর্ণনার ছত্রে ছত্রে যে ধ্বনিগুণসম্পন্ন প্রৌঢ় সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তার স্বাদ দেওয়া কবির লক্ষ্য নয়, কারণ তা দেওয়া যায় না, কিন্তু কবি নিজে যে আনন্দ অনুভব করেছেন তার একটা সংক্ষিপ্তসার তার গতিশীল ভাষার মধ্যে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন নিঃসন্দেহে। এই গতিসমন্বিত ব্যঞ্জনধ্বনি সংঘাতময় বাক্যের বহু নিদর্শন কবিতাটির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হ'ল এগুলির চরণে ছ' অক্ষরের পর ছেদ বা অর্ধচ্ছেদ বিন্যস্ত হয় নি। 'অমিত্র' বা তদনুরূপ ছন্দে আট ছয় যতিবিন্যাস যেখানে, সেখানে ছ' অক্ষরের পর ছেদ একটু শ্রুতিকটু লাগে, কারণ এর দু' অক্ষরের পরেই আবার যতির ফাঁক রয়েছে। চার অক্ষরে ছেদ বরং সৌষম্যের হানি ঘটায় না। নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে ঐ রকম ছেদ-যতি বিধানের জন্য এবং পরিমিত যুক্তব্যঞ্জন সংঘাত নির্মাণের জন্য একালে অপ্রত্যাশিত কাব্যসৌন্দর্যের সঞ্চার হয়েছে। যেমন—

তোমার কাব্যের পরে করি বরিষণ
নববৃষ্টিবারিধারা, করিয়া বিস্তার
নবঘনস্নিগ্ধচ্ছায়া, করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের

এবং

কোথা সেই জহ্নুকন্যা যৌবনচঞ্চল
গৌরীর ভ্রূকুটিভঙ্গি করি অবহেলা
ফেনপরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা
লয়ে ধূর্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল।

উত্তরমেঘে বর্ণিত অলকার বিস্তৃত এবং সুরম্য চিত্র কবি একটিমাত্র বাক্যে যে ভাবে সংক্ষেপ করেছেন তাতে শুধু বর্ণনকৌশলে, কয়েকটি নির্বাচিত চিত্রের যোজনায় তার আত্মপ্রকাশের শক্তির সম্যক স্ফুরণ ঘটেছে—

অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্যপুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীলশৈলমূলে
সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকূলে
মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা।

কবিতাটিতে একটিমাত্র দুর্বল স্থান রয়েছে, যেখানে কবি "তাদের সবার গান তোমার সংগীতে পাঠায়ে কি দিলে কবি" এই ভাব-প্রেরণের দুটি উপমা অন্বেষণ

করেছেন। এর মধ্যে প্রথম উপমাটি 'শ্রাবণে জাহ্নবী যথা' খুব যথাযথ না হ'লেও জটিল হয়ে পড়েনি। কিন্তু দ্বিতীয় উপমায় 'পাষাণ-শৃঙ্খলে যথা বন্দী হিমাচল' প্রভৃতি অনর্থক বাগ্‌বিস্তারের চিহ্ন বহন করেছে এবং উপমান-উপমেয় সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে কল্পনার বাষ্পলোকে উদ্দামভাবে উধাও হয়েছে। "কাতরে নিশ্বাসি সহস্র কন্দর হতে বাষ্প রাশি রাশি" মেঘদূতের একটি বর্ণনার অনুসরণ এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে তা স্বাভাবিক ভাবে এসেছে ব'লেই হয়ত কবি উপমান-স্থাপনে এই বর্ণনার মোহ ত্যাগ করতে পারেন নি।

এই শ্রেণীর **'অহল্যার প্রতি'** কবিতাটি মূল কাহিনীর আংশিক বক্র বিন্যাসেই প্রথমতঃ রমণীয়। অহল্যার জড়ত্ব এবং চেতনা-প্রাপ্তি একটি আশ্চর্য এবং অতিপ্রসিদ্ধ ঘটনা। আধুনিক কবি তাঁর বিশিষ্ট কল্পনাপ্রবণ মন নিয়ে এর উপর সম্পূর্ণ নূতন আলোকপাত করেছেন। বলা যেতে পারে মূল ঘটনাকে তিনি স্পর্শ করেন নি। ফলতঃ কবিতাটিতে আদ্যন্ত কবির নিজ কল্পলোকই প্রতিফলিত হয়েছে বলা যায়। এই কল্পনার বিষয়টিকে কবির আশ্চয পৃথিবী-প্রীতি বলা হয়। কিন্তু কবির এই পৃথিবী-সৌহৃদ্যের ব্যাপারটি কবিতার শুধু একটা অনুরঞ্জন বা অলংকরণও হতে পাবত। পৃথিবীকে শুধু personification-এর সাহায্যে সাধারণভাবে রমণীয় করা যেত। কিন্তু তা যে নয় তা ঐ কবিতাটির বহু প্রশ্নবাক্য এবং আবেগচঞ্চল উক্তি থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। বসুন্ধরাকে একটি স্নেহকাতর মহাজননীসত্তারূপে এবং তৃণতরুলতা ও জীবসমূহকে সন্তানরূপে দেখার অভিনব কল্পনা এই কবিতাটির বীজ স্বরূপ। কল্পনামূলক হ'লেও এটি একটি নিবিড় আন্তরিক উপলব্ধি ব'লেই পাঠক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে প্রথমেই অভিভূত হন। এই বিষয়টিই বিভিন্ন কল্পচিত্রের আরোপে সহসা আগত চমৎকারিতার রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেমন,—

> ধরণী লইত টানি শ্রান্ততনুগুলি
> আপনার বক্ষ পরে, দুঃখশ্রম ভুলি
> ঘুমাত অসংখ্য জীব—জাগিত আকাশ—

এ কেবল ধরণীর উপর জননীর ব্যবহার সমারোপে সমাসোক্তির লঘু চমৎকার নয়, তার উপরের কথা, আমাদের সঙ্গে পৃথিবীর অচ্ছেদ্য নাড়ীর সম্পর্কের ব্যঞ্জনা। এরই চরমতা অর্থাৎ শুধু নিসর্গবস্তুরই নয়, মানুষের জীবনের গভীর

বেদনাময় মুহূর্তগুলির সঙ্গে পৃথিবীর করুণা-সম্পর্কের এক অপূর্ব ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে—

চিররাত্রি সুশীতল বিস্মৃতি আলয়ে
যেথায় অনন্তকাল ঘুমায় নির্ভয়ে
লক্ষ জীবনের ক্লান্তি ধূলির শয্যায় ;
নিমেষে নিমেষে যেথা ঝরে পড়ে যায়
দিবসের তাপে শুষ্ক ফুল, দগ্ধ তারা,
জীর্ণ কীর্তি, শ্রান্ত সুখ, দুঃখ দাহহারা।

জন্মমৃত্যুর মধ্যবর্তী মানবজীবনের বেদনা ব্যর্থতা এবং বিস্মৃতিময় শান্তি-লাভেচ্ছার বিষয়টিও এখানে ব্যঞ্জিত হয়ে সকরুণ সৌন্দর্যে পাঠকের চিত্ত আবিষ্ট করছে।

এর পর কবিতাটির চমৎকারিতা বর্ধিত হয়েছে অহল্যার বিভিন্ন কল্পিত অবস্থার বর্ণনে। যেমন পাষাণী অবস্থার চিত্রে—'জাগাইয়া রাখিত কি তোরে নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় অর্ধ জাগরণে ?' অথবা, সদ্যচেতনপ্রাপ্ত নারীর অদ্ভুত দ্বৈতাবস্থার বর্ণনে—

অপূর্ব রহস্যময়ী মূর্তি বিবসন,
নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন
পূর্ণস্ফুট পুষ্প যথা শ্যামপত্রপুটে
শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিয়াছে ফুটে
একবৃন্তে।

এই উপমান স্থাপনই অহল্যার রূপকে ঠিক অপরিস্ফুট থাকতে দেয়নি অথচ রহস্যময়তাও ধ্বনিত করেছে। এরই সঙ্গে আর একটি চিত্র যোজনা ক'রে কবি নিজ অভিপ্রায়ও ধ্বনিত করেছেন—

তুমি বিশ্ব পানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমাপানে চেয়ে কথা নাহি কয় ;
দোঁহে মুখোমুখি।

জননী এবং সন্তান দুই এক হয়ে ছিল, এখন পৃথক হয়ে পড়ায় চেনা-অচেনার মধ্যবর্তী অপার বিস্ময়। পৃথিবী-সম্পর্কের এই বিষয়টি তত্ত্বকারে কবি বোঝান নি, বিস্ময়-সৌন্দর্যের মধ্যস্থতায় আমাদের হৃদ্‌গত ক'রে দিয়েছেন।

'মেঘদূত' এবং 'অহল্যার প্রতি' এ দুটি অক্ষরমাত্রিক ছন্দে গ্রথিত কবিতা

রবীন্দ্রের সুমহৎ সৃষ্টি। এরই পাশাপাশি চলেছে কবির খেয়ালী কল্পসুখবাসনা —কোমলাক্ষর-স্পর্শে অতিমধুর, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মিলবাহুল্যে তরলায়িত। নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রের মহত্তম সৃষ্টিগুলি অক্ষরমাত্রিক ছন্দে এবং যুক্তব্যঞ্জন সংঘাতের মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। আর মাত্রাবৃত্তের সুরধর্মী রীতিতে সংখ্যায় গরিষ্ঠ সৌন্দর্যময় উত্তম কবিতাগুলি জন্মেছে একথা বলা যায়। যেমন মনোভাবে তেমনি ভাষাতে লঘুকল্পনা ও স্বপ্নবিলাসময় কবিতা-ক্রীড়ার চরমতার দৃষ্টান্ত হ'ল একালের—

'ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান
তরুমর্মর পবনে,
সেই মুকুল-আকুল বকুলকুঞ্জ-ভবনে।'

'কমলফুল বিমল শেজখানি,
নিলীন তাহে কোমল তনুলতা'

'উড়ে কুন্তল, উড়ে অঞ্চল,
উড়ে বনমালা বায়ুচঞ্চল,
বাজে কঙ্কণ, বাজে কিঙ্কিনী
মত্তবোল।'

'দুলেছিল ফুল গন্ধব্যাকুল বাতাসে'

'নির্ঝর ঝরে উচ্ছ্বাসভরে
বন্ধুর শিলা-সরণে।'

'আমার নূপুর আমারি চরণে
বিমরি বিমরি বাজে।' প্রভৃতি।

এর পরের অধ্যায়ে সংস্কৃতের ধ্বনিময় বচনরচনের সঙ্গে যখন কবির অনুরাগ-সম্পর্ক গড়ে উঠল তখন পুনশ্চ কিছুকাল ধ্বনিবিলাসের আয়োজন চলেছিল এই রীতির ছন্দে যন্মাত্রিক পর্বে। এর পর অবশ্য অতিকোমলতার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়েছে এবং কবি মধ্যমমার্গ অবলম্বন ক'রে যথার্থ সৌন্দর্যসম্পাতের প্রয়াসী হয়েছেন।

'সোনার তরী'র প্রথম কবিতা, বহুনিন্দিত বহুধা ব্যাখ্যাত কবিতা **'সোনার তরী'** কবির এই ধরনের কতকটা কল্পক্রীড়ারই পরিচায়ক। কবি-চিত্তের কোনও গুরুতর বিক্ষোভ-বিকার, জীবনের কোনও বৃহত্তর অর্থ-অনুধাবন-প্রযত্ন থেকে এটি উচ্চারিত নয়। এর ভাষাভঙ্গিতে এবং অস্পষ্ট

উক্তিতে একটা সৌন্দর্যবিরহলোক আভাসিত হয়েছে। কবিতাটির সুর না-পাওয়ার বিলাপের, নিরাশ্রয় শূন্যের, কোনও স্থির নির্দেশের বলিষ্ঠতার নয়।

কবিতাটির প্রথম স্তবকের শব্দচিত্র এবং অর্থচিত্র দুইই সংগতিহীন একটি ক্রীড়াকল্পলোকের পরিচয় দিচ্ছে, শুধু জানাচ্ছে কবিব্যক্তির একাকিত্ব, অসহায়তা এবং শ্রান্তি। এ ধরণের কবিতা-রচনা এমন বস্তু যে বাক্যগুলিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে পারা যায় না, আবার সংকেতে বুঝতে গেলে কাব্যের একেবারে ভরাডুবি ঘটে। যেমন বলা যায় যে, ধান কাটা যদি সারা হয়ে থাকে তাহলে ভরসা না থাকার কারণ কী? নদীর কূলে একাই বা কেন? ধান কাটার কথা উচ্চারণ করতে না করতেই ক্ষুরধার নদীর বর্ণনার তাৎপর্য? এ ধান না হয় বর্ষায়-পাকা ধানই হ'ল, কিন্তু 'কাটিতে কাটিতে ধান' এই দীর্ঘসূত্রবর্ণনের কী উদ্দেশ্য? দ্বিতীয় স্তবকে পুনশ্চ 'একেলা'র কথা, কিন্তু এবার নদী নয়, একখানি ছোট খেতের কথা। একখানি ছোট খেত, চারদিকে বক্রগতি জলপ্রবাহ, এরই মধ্যে রাশি রাশি ধান,—এই সব বর্ণনার কোনও সংগতিই নেই। নৈরাশ্য এবং একাকিত্বের মধ্যে নিসর্গের যে বর্ণনা দেওয়া হল, তার সঙ্গে হঠাৎ বিরোধ দেখছি "পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়ামসীমাখা গ্রামখানি।" এ যেন কতকটা আশ্বাসের আভাস। একা, কূল, ধানকাটা, পরপার প্রভৃতিকে সাংকেতিক অর্থে গ্রহণ করলে আরও অকূলে পড়তে হয় এবং সাংকেতিক ও রূপকের জালে আবদ্ধ হয়ে যার-যেমন-খুসী একটা মনগড়া অর্থ করতে হয়। কার্যতঃ হয়েছেও তাই।

আমাদের মনে হয়, কবিতাটির ছন্দ ও শব্দের রমণীয়তা যথেষ্ট। চিত্র-সন্নিবেশ কৌশলেও কবিতাটি আকর্ষণীয়, যদিও চিত্রগুলি বিচ্ছিন্ন ও পৃথক্‌। অর্থচিত্রের সঙ্গে শব্দচিত্রের স্থানীয় বিরোধও নেই। ভরা নদী, খরজলস্রোত, মেঘমেদুর পরপার, শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, তরী এবং মাঝি এসবের সঙ্গে কবির ব্যাকুলতাময় বিলাপের সুর মিশ্রিত হয়ে একটা করুণ রাগিণীর বিস্তার করেছে। এর সঙ্গে যদি নির্মল কবিভাবনা-প্রেরিত অর্থসংগতি বর্তমান থাকত তাহ'লে এটি কবির শ্রেষ্ঠকীর্তি-সমূহের মধ্যে গণ্য হতে পারত। যে-স্বপ্ন কবি-কল্পনায় একটি স্পষ্ট মূর্তি পরিগ্রহ করতে পারেনি তারই পরিচয় দিতে গিয়ে আর্টিষ্ট এবং প্রকাশব্যাকুল কবি একটি মায়ালোকের সৃজন করেছেন মাত্র। শুধু উচ্চারণে, ধ্বনিতে এবং শ্রাবণের রঙে অপ্রাপ্তি-জনিত বেদনা এবং বিরহলোকের আভাস পাচ্ছি মাত্র, এর অতিরিক্ত

গভীরতর কোনও বিচ্ছেদ-ব্যঞ্জনা নেই, একটি পরিপূর্ণ বিরহলোক উদ্ভাসিত হচ্ছে না। অথচ এই একই বিষয় 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা' কবিতায় অসামান্য করুণ সৌন্দর্যের কারক হয়েছে।

'সোনার তরী' কবিতার এই অস্পষ্টতা বহু সৌন্দর্যরসিককেই ব্যাহত করেছে। এর মধ্যে কবির প্রতি যাঁরা প্রথম থেকে সহানুভূতিশীল তাঁরা ব্যর্থ হয়ে মনঃকল্পিত নিগূঢ় অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। আর অন্যে স্পষ্টভাবেই কবিতাটিকে অস্পষ্টতাদোষে দুষ্ট বলে অভিহিত করেছেন। আসলে কবিতাটি হ'ল খেয়ালী-কল্পনার কবির ধ্বনি ও চিত্রসৃজনের মধ্য দিয়ে একটি বিষাদময় পরিবেশ রচনা। কবিমনের এরকম প্রবণতা খুবই স্বাভাবিক এবং সেই মর্মেই এসব কবিতার সৌন্দর্য গ্রহণ করতে হবে। সোনার ধান এবং সোনার তরীর সুস্পষ্ট কোনও অর্থ ই থাকতে পারে না, নিগূঢ় কোন সংকেতও নেই, আছে শুধু আভাসিত অপ্রাপণীয় সৌন্দর্যের কথা।

এর সঙ্গে **'নিরুদ্দেশ যাত্রা'** কবিতার সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য দেখা যাক। দুটি কবিতাতেই চিত্র এবং সংগীত রয়েছে, একটিতে বর্ষার চিত্র, অপরটিতে সমুদ্র- যাত্রার। দুটিতেই অনুপ্রাসের রমণীয়তা আদ্যন্ত সংগীতের মাধুর্য সঞ্চারিত করেছে। কিন্তু প্রথমটিতে চিত্রগুলি বিক্ষিপ্ত, কোনও ভাবুকতার মর্মে আদ্যন্ত সন্নিবদ্ধ নয়, ধ্বনিও অনেকক্ষেত্রেই নিরুপায় ভাবে কোনক্রমে দাঁড়িয়ে আছে। 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা' কবিতায় এই ভাবগত সূত্রহীনতার শৈথিল্য নেই, মনোভঙ্গির অস্পষ্টতাও নেই। এক রহস্যময়ী সুন্দরী দুর্নিবার আকর্ষণে কবিকে দূরান্তরে নিয়ে চলেছেন, নিজ পরিচয় দিচ্ছেন না, তার স্পর্শ, তার কেশগন্ধ কবিকে তার সঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল করলেও তিনি ধরা দিচ্ছেন না, এই নীরব নারীমূর্তির ওষ্ঠে শুধু দুর্জ্ঞেয় স্মিতহাস্য ফুটে উঠছে—এই আদ্যন্ত সংগতিপূর্ণ অর্থনির্মাণ কবিতাটির অর্থগত সৌন্দর্য বিঘ্নিত হতে দেয়নি। এরই সঙ্গে নিসর্গচিত্র এবং কল্পচিত্র সংগতি রক্ষা ক'রে চলেছে সর্বত্র। 'সোনার-তরী' কবিতার "কে গো তুমি কোথা যাও…আমার সোনার ধান কূলেতে এসে" প্রভৃতির মত অস্পষ্টতা কবিতাটির কুত্রাপি নেই। 'সোনার তরীর'—বিদেশযাত্রী মাঝি যাকে কবি ব্যাকুলিত আহ্বান জানাচ্ছেন, তিনি পুরুষ কি নারী, কি কোনও দৈবী সত্তা বোঝবার উপায় নেই। এখানে যাত্রার সঙ্গিনীর নারীমূর্তি পরিস্ফুট হয়েছে এবং কবির মিলন-ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে আদিরসাত্মক সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। এ কবিতাটির মূল রস করুণ। হতাশা,

বিষাদ প্রভৃতি সঞ্চারী ঐ মূল রসকে পরিপুষ্ট করেছে। অথচ 'সোনার তরী'র মূল ভাব হল ঐ বিষাদের সঞ্চারী, পরিস্ফুট করুণ নয়।

'নিরুদ্দেশ-যাত্রা' কবিতাটির নির্মাণ লক্ষ্য করা যাক। এর প্রথম স্তবকের প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই হতাশা ও ক্লান্তি ব্যক্ত হয়েছে। তরণীতে দিক্‌চিহ্নহীন অকূল সমুদ্রে যাত্রার যে বাস্তব পরিস্থিতি, যার সমাপ্তি অবশ্যই থাকে, তা-ই অতিশয়িত হয়ে স্থায়ী নিরুদ্দেশ-যাত্রার বাণীতে রূপান্তর লাভ করেছে। এক অপরিচিত রহস্যময়ী সুন্দরী কবিকে চালিত করছেন এই কল্পনাটি কবির নিরুদ্দেশযাত্রাবোধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এক আদিরসাত্মক চমৎকারের জন্ম দিয়েছে। প্রথম স্তবকে এই সুন্দরীকে 'বিদেশিনী' ব'লে অভিহিত করায় এবং তার অনির্ণেয় স্মিতহাস্যের বর্ণনা দেওয়ায় কবির সঙ্গে এর সম্বন্ধ যে পূর্বরাগের তা স্পষ্ট হয়েছে। 'কী আছে হোথায়—চলেছি কিসের অন্বেষণে' এই উক্তিতে যে শ্রান্তি এবং ক্লান্তি এবং নৈরাশ্যের ব্যঞ্জনা ঘটেছে, তার সঙ্গে নারীরূপমোহ অথচ মিলনের অভাবজনিত বিষাদ-ব্যাকুলতা একত্র মিশ্রিত হয়েছে। এই অর্ধ-মানবী অর্ধ-কল্পনার নায়িকার অজ্ঞাতপরিচয় স্মিতের বর্ণনা প্রায় প্রতিটি স্তবকের শেষে ধ্রুবপদের মত সংযোজিত হয়ে দুর্জ্ঞেয় দৈবের মায়া-কুহেলিকাকে ঘনীভূত করতে সাহায্য করেছে। প্রথম স্তবকের নৈরাশ্য ও নিষ্ফলতাবোধের বিষণ্ণতা দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকের নিসর্গবর্ণনার মধ্যে পরিপুষ্ট হয়েছে। এ নিসর্গ দিক্‌চিহ্নহীন সমুদ্রের। সমুদ্রে সন্ধ্যার বর্ণনা প্রতিটি স্তবকে পরিমিতভাবে বিন্যস্ত হয়েছে-এবং কবিতাটিতে এই নিসর্গ-বর্ণনার গুরুত্ব এমন মুখ্য স্থান গ্রহণ করেছে যে সমুদ্রযাত্রাই কবির মিলন-ব্যাকুলতা ও ব্যর্থতার বিষাদের জন্ম দিয়েছে,—ঐ মনোভাব কবির পূর্বনিবদ্ধ কোনও স্থায়ী বিরহ-মনোভাব নয়—এমন বিতর্ক করলে অন্ততঃ এই কবিতা অবলম্বনে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। 'ঝলিতেছে জল তরল অনল গলিয়া পড়িছে অম্বরতল' এবং 'হু হু ক'রে বায়ু ফেলিছে সতত দীর্ঘশ্বাস'··· 'সংশয়ময় ঘননীলনীর' 'চঞ্চল আলো আশার মতন কাঁপিছে জলে' 'কখনো ক্ষুব্ধ সাগর কখনো শান্ত ছবি' 'আঁধার রজনী আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা'—ইত্যাদি দৃশ্য প্রত্যক্ষ সমুদ্রের, বিশেষ দিবাশেষের। পৃথক দৃশ্যসমূহের আলংকারিক বর্ণনা নয়, প্রতি তরঙ্গভঙ্গের এবং দিক্‌চক্রলগ্ন মেঘমালার রেখাবৈচিত্র্য এবং নভ-চর পক্ষীদের সঞ্চরণ-সৌন্দর্য প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ বর্ণনা নয়, কয়েকটি স্থূল রেখায় আঁকা বিস্তৃত পট মাত্র। এর থেকে কিছুটা অনুমান করা যেতে

পারে যে কবির বিরহ-ব্যাকুলতা ও বিষাদবোধ নিসর্গের দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছে, নিসর্গ থেকে ঠিক জন্মলাভ করেনি।

দ্বিতীয় স্তবকে দিনের চিতা, দিগ্‌বধূর অশ্রুময় আঁখি, অস্তগিরি প্রভৃতির কল্পনা, তৃতীয় স্তবকের বাতাসের দীর্ঘশ্বাস, অসীম রোদনের প্লাবন প্রভৃতি ঐ বিষাদময়তার সঙ্গে একাত্ম হয়েছে এবং কবিতাটির আদ্যন্ত পরিব্যাপ্ত বিষাদের রমণীয়তাকে কুত্রাপি বিক্ষুব্ধ হতে দেয় নি। এছাড়া পুনরাবৃত্তির ভঙ্গির মধ্যে এবং ছন্দের স্থানোপযোগী দীর্ঘ উচ্চাবণলীলায় মিলবিন্যাসের মধ্যেও হতাশা, ব্যর্থতা ও বিষণ্ণতা অনায়াসে উপচিত হয়েছে, যেমন—

'তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি 'পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ,
তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি'

এবং

'শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ
শুধু কানে আসে জলকলরব'

এবং

'বেলা বহে যায়, পালে লাগে বায়,
সোনার তরণী কোথা চ'লে যায়'

এবং

'আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি' ইত্যাদি

কোমল ব্যঞ্জনের সমধিক বিন্যাসেও বিরহ ও অপ্রাপ্তির বেদনা বিচ্ছুরিত হতে পেরেছে। শব্দার্থের চিত্রগত চমৎকারিতার মধ্যে দিগ্‌বধূর ছলছল নেত্রপাত (উৎপ্রেক্ষা), বাতাসের দীর্ঘশ্বাস মোচন (সমাসোক্তি) দিবসের চিতামধ্যে দাহ (অতিশয়োক্তি) চঞ্চল আলোর আশার সঙ্গে তুলনা (উপমা) এবং অন্ধকার রজনীর উপর বিস্তারিতপক্ষ মহাপক্ষীর ব্যবহার-সমারোপ প্রভৃতি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত বিচিত্র অবয়বের সংগতিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্যই কবিতাটিতে আদ্যন্ত প্রবাহিত করুণ বা বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার রস নির্বাধে রমণীয়তার সঞ্চার করতে পেরেছে। বৈচিত্র্যশেষে শেষস্তবকে এই করুণের ঘনীভূত অবস্থা পাঠকের চিত্তকে কবির সমভাবে পর্যাকুল করেছে এবং দূরবর্তী মায়ারাজ্যে নিয়ে মায়াবিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পরেই যবনিকা অপসৃত করেছে। শব্দার্থের

সুসমঞ্জস এবং পরস্পর প্রতিস্পর্ধাশীল বিন্যাসই কবিতাটির রমণীয়তার কারণ হয়েছে। পরিণামের 'বিকলহৃদয় বিবশ-শরীর ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর, কোথা আছ ওগো করহ পরশ' প্রভৃতিতে যে তীব্র আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে তা করুণরসবিহ্বলতার মধ্যে কবিতাটির সমাপ্তি নির্দেশ করছে, একটি নির্বিশেষ ও স্থায়ী বিরহকাতরতার মধ্যে পাঠককে নিমজ্জিত করেছে। যাত্রার শ্রান্তি, যাত্রাসমাপ্তির উদ্বেগ, রহস্যময়ী অপরিচিতার সঙ্গ এবং ছলনা, সমুদ্র এবং সন্ধ্যা কবিতাটিতে একাত্ম হয়ে উপযুক্ত ভঙ্গিতে ও ইঙ্গিতে যে আহ্লাদজনক কাব্যলোকে নিয়ে যাচ্ছে তার তুলনা রবীন্দ্ররচনাতেই মুষ্টিমেয় কিছু মাত্র রয়েছে। মাত্রাবৃত্তে রচিত হ'লেও রবীন্দ্রের স্থায়ী কীর্তিগুলির মধ্যে এটি অন্যতম।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' ও 'সোনার তরী'র' সুরধর্মিতা প্রবল। এই সুরধর্ম আশ্রয় ক'রে রয়েছে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, অনুপ্রাসবাহুল্য ও কোমল ধ্বনির বিন্যাসকে। অথচ রূপ ও রীতির বৈচিত্র্যে সুরধর্ম বহুল পরিমাণে খর্ব হয়ে অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতির ছন্দে ভিন্নশ্রেণীর গীতকবিতার জন্ম সম্ভব করেছে—যার মধ্যে কল্পনার অতলস্পর্শ গভীরতা ও এক আশ্চর্য সহানুভব শক্তি অনায়াসে প্রকাশিত হতে পেরেছে। মনে হয় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কোমল কলাবিলাসে বিচিত্রসূক্ষ্ম ভাবসৌন্দর্যগুলি অপরূপ স্ফূর্তি পেতে পারে ঠিকই, কিন্তু সুর ও গদ্যের, কোমলতা ও কাঠিন্যের, শব্দবিলাস ও অর্থবৈচিত্র্যের সমন্বয়েই গভীর ভাবুকতা ও শ্রেষ্ঠ কল্পনার উৎসার ঘটে। 'অহল্যার প্রতি' 'বসুন্ধরা' 'সমুদ্রের প্রতি' এই তিনটি অক্ষরমাত্রিক রীতির কবিতায় পৃথিবীর সঙ্গে কবির জন্মান্তর-সৌহৃদ্য-কল্পনা বাণীমূর্তি গ্রহণ করেছে।

এর মধ্যে **'অহল্যার প্রতি'** কবিতার আবেগ-উচ্ছ্বাসের সংযম এবং 'বসুন্ধরা'র উচ্ছ্বাস-বাহুল্য কতকটা বিপরীতভাবে তুলনার বিষয়। **'বসুন্ধরা'**র স্থানবিশেষ বক্রোক্তি-মণ্ডিত সুন্দর হলেও উচ্ছ্বাসময় অতিকথনের জন্য বিচারে কাব্যহিসাবে শ্রেষ্ঠ ব'লে পরিগণিত হতে পারে না। কেবল কল্পনা-ভঙ্গির অভিনবতার জন্য অবশ্য কবিতাটি পুনঃপুনঃ পঠিত হয়ে থাকে। কল্পনায় কবির পৃথিবী-ভ্রমণ এবং নিসর্গ ও জীবনধারার সঙ্গে একাত্মতার বিবরণ বৈচিত্র্যবহ হ'লেও অতিরেকদোষযুক্ত হয়েছে এবং অনুরাগের আধিক্য যে-আবেগের প্রবলতা নিয়ে এসেছে তার সংহতিই কবিতাটিকে সৌন্দর্য-সমুন্নত করতে পারত রসিক পাঠকের একথা নিশ্চয়ই মনে হবে। অথচ

স্থানবিশেষে কবিতাটি যে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এ সম্বন্ধেও সন্দেহ নেই, যেমন,—

(১) ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
... ... হিল্লোলিয়া মর্মরিয়া
কম্পিয়া স্খলিয়া বিকিরিয়া বিচ্ছুরিয়া
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে...

(২) আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের। তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল...আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, ব'ণ করেছে তরুরাজি
পত্র ফুল ফল গন্ধরেণু।

(৩) ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার ক'রে
সমস্ত ভুবন। সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হতে মিশ্রিত মর্মরবৎ
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দখেলার
পরিচিত রব।......

(৪) যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক-সহস্ররূপে, গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষস্বরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু,
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু...

মনে হয়, তাঁর আশ্চর্য কল্পনার শক্তিতে উপলব্ধ পৃথিবীর এযাবৎ অকথিত স্বরূপের যেখানে বর্ণনা দিচ্ছেন সেই স্থানগুলিই কাব্যাংশে উত্তম হয়েছে, আর যেখানে নিজের বাসনার কথা প্রবল হয়েছে, পৃথিবীর সম্পর্কে অভিনব কল্পনার অবসর যেখানে কম, সেখানে কবির আত্মবিহ্বলতা তেমন আকর্ষণীয় হয় নি। সুতরাং কবির নিজ-বাসনায় পরিভ্রমণের অংশগুলি সংক্ষিপ্ত হ'লে কবিতাটির মহৎ সৃষ্টি ব'লে পরিগণিত হবার বাধা হত না। তবু কবিতাটি কবির এক আশ্চর্য মহা-অনুভবের পরিচায়ক সন্দেহ নেই। উপরের দৃষ্টান্তগুলি এবং অনুরূপ আরও কয়েকটি স্থান যার শব্দার্থ-সৌন্দর্য অভিনব ব'লে প্রতীত হয় তা কিভাবে ঘটেছে একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। প্রথমাংশে 'মা মৃন্ময়ী' ব'লে পৃথিবীকে আহ্বান এবং বহু নামধাতুর একত্র অসমাপিকায় প্রয়োগ কবিহৃদয়ের রমণীয় প্রীতিভাবনাকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলেছে। দ্বিতীয় অংশে পৃথিবীর কবিসহ সূর্য-প্রদক্ষিণের চিত্র এবং 'আমার মাঝারে উঠিয়াছে তৃণ তব' প্রভৃতির মধ্যে এক অদৃষ্টপূর্ব এবং অশ্রুতপূর্ব কাহিনীর বিন্যাস কাব্যসৌন্দর্যের কারণ হয়েছে। এরকম সকলস্থানেই পৃথিবীকে প্রাণময়ী, মাতৃসত্তারূপে দেখায় ব্যাপক চমৎকারিতার উদ্ভব হয়েছে। তৃতীয় অংশে পৃথিবীকে চিরন্তন ক্রীড়াগৃহরূপে দর্শন, কবির অপ্রত্যক্ষ আহ্বান শ্রবণ, চতুর্থ অংশে প্রাণের রঙ্গভূমি রূপে অনুভব প্রভৃতি ক্বচিৎ উৎপ্রেক্ষাদি অলংকারে ক্বচিৎ ক্রিয়া ও বিশেষণের বক্রতায় চমৎকারজনক কবিকৃতির স্বাক্ষর রেখেছে। এই ধরণের কল্পলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অত্যন্ত অভিনব হ'লেও কবির বর্ণনার মধ্যে এমন প্রতক্ষতাগুণ যুক্ত হয়েছে যে পাঠক-সাধারণের চিত্তে সন্দিগ্ধতার প্রশ্নই ওঠে না।

'বসুন্ধরা' কবিতায় আবেগ-উচ্ছ্বাসের ফলে যে প্রগল্‌ভতার প্রসার ঘটেছে **'সমুদ্রের প্রতি'** কবিতায় তা নেই। আবার পৃথিবী-প্রীতিসম্পর্কের অনুভবের বিচিত্র বর্ণনাগুলি 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় প্রায় অবিদ্যমান। 'বসুন্ধরা' কবিতার সমাপ্তির দিকে কবি যে-বিরহবোধের পরিচয় দিয়েছেন এ কবিতায় তার স্পর্শ নেই, তার পরিবর্তে কবির মানসলোকের সূক্ষ্ম ও কোমল ও অভিনব ভাবসমূহের একটা বর্ণনা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উচ্ছ্বাসের বিস্তারে নেই ব'লে কবিতাটি রীতির দিক থেকে, সমগ্রভাবে, 'বসুন্ধরা' থেকে উত্তম হয়েছে। এর দীর্ঘ পর্ব ও চরণের অক্ষরমাত্রিকতা, ভাষার ঋজুতা, অর্থের স্পষ্টতা এবং বর্ণনার গাম্ভীর্য ও ভাবসংযমন কবিতা হিসেবে একে উচ্চ ক্লাসি-

ক্যাল ধর্মাক্রান্ত করেছে। এর কল্পনার সুদূরবিস্তারও সংহত বন্ধনে সীমিত হয়ে রূপ ও অরূপের পারস্পরিক আত্মত্যাগের বিজয়বার্তা ঘোষণা করছে। 'বসুন্ধরা' বিচিত্র ও করুণ, 'সমুদ্রের প্রতি' কেন্দ্রানুগ ও গম্ভীর।

কবিতাটির প্রারম্ভে সমুদ্রের এক অদ্ভুত সোহাগিনী-রূপ দেখানো হয়েছে। সমুদ্র ও পৃথিবীর নৈসর্গিক পটপরিবর্তনের চিত্রগুলি ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হওয়াতে বক্র সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয়েছে। সিন্ধুর উপর জননীর চারিত্র্য-সমারোপ কবিতাটির শেষ পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছে। উপসংহারে কবি নিজ অনুভবকে বসুন্ধরার উপর প্রক্ষিপ্ত ক'রে ('জান কি তোমার ধরাভূমি পীড়ায় পীড়িত আজি—' ইত্যাদি) রুগ্ন কন্যার ব্যবহার সমারোপে যে অভিনব চারুতা এনেছেন তাও অপূর্ব হয়েছে এবং এর সঙ্গে সিন্ধুজননীর উদ্বেগ ও স্নেহশুশ্রূষার যে কল্পচিত্র নির্মাণ করেছেন তাও বিন্দুমাত্র অসংগতিপূর্ণ হয়নি। পাঠককে ব'লে দিতে হবে না যে ভূকম্পন, প্লাবন, গ্রীষ্মদাহ, প্রভৃতিই পৃথিবীর পীড়ার প্রকাররূপে লক্ষিত হয়েছে এবং 'বিকারের মরীচিকা' দ্বারা ব্যঞ্জিত হয়েছে আমাদের মানবসমাজের যুদ্ধবিগ্রহ ও শক্তির দ্বন্দ্ব, মতবাদের কোলাহল প্রভৃতি। কবিতাটির মধ্যবর্তী অংশে কবির আত্মভাষণে—নিগূঢ় ও সুদূরপ্রসারী কল্পনার পরিচয় ও মানসিকতার বর্ণনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'যখন বিলীনভাবে ছিনু ঐ বিরাট জঠরে—' ইত্যাদিতে বর্ণিত আশ্চর্য অনুভব এক চমৎকারজনক চমকের সৃষ্টি করেছে এবং কাব্যটিকে অর্থের অসামান্যতায় উজ্জ্বল করে তুলেছে। এই অভিনব অর্থ যে একটি সত্যোপলব্ধি তা জানতে গিয়ে কবি তাঁর মনের প্রবল রোম্যান্টিক বাসনাগুলির পরিচয় দিচ্ছেন—'আকার প্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা—' ইত্যাদি বর্ণনায়। গীতি-কবিতায় কবির এহেন আত্মবিশ্লেষণ বিন্দুমাত্র অপ্রত্যাশিত নয়, কবির আত্মলীন কল্পনাপ্রবণতার সঙ্গে পাঠকের পরিচয়ের পথও এহেন বিবৃতি প্রস্তুত করে। এখানে কিন্তু যে-সূত্রে এই মানস-বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেই সূত্রটি একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে। গর্ভিণী সিন্ধুর সহসা আবির্ভূত স্নেহ-স্পর্শ, অজ্ঞাতমূল ব্যাকুলতা এবং বিচিত্র বাসনার কথা ব্যক্ত করেই এর সদৃশ নিজ অনুভব স্পষ্ট করতে চাইছেন—'আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত-ব্যথাভরে, তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়—' ইত্যাদি রূপে। কিন্তু এ দুটি বস্তু এক কিনা সে প্রশ্ন পাঠকের চিত্তে জাগবেই। এই ক্ষুদ্র অসংলগ্নতাটুকু, সহানুভূতির চোখে দেখলে কবিতাটির প্রবল আন্তরিকতা

এবং অভিনব অর্থনির্মাণ চাতুর্য বিদগ্ধ পাঠককে আদ্যন্ত বিমুগ্ধ ক'রে রাখবেই।

এই শ্রেণীর এর চেয়ে সহজ কাব্যরসপূর্ণ একটি অনবদ্য কবিতা হল **'যেতে নাহি দিব'**। 'সমুদ্রের প্রতি' এবং 'যেতে নাহি দিব' কবিতা দুটির আকর্ষণীয়তা নিয়ে সাধারণে ভোট নেওয়ার ব্যবস্থা হ'লে দ্বিতীয়টিই জয়ী হবে এ সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয়। এই কবিতাটিতে কবিকল্পনার অতলস্পর্শ নিগূঢ়তা নেই, আছে একটি সুমধুর বিরহকরুণ প্রীতিব্যাকুলতা। যাত্রার রমণীয় চিত্র এবং কন্যার উক্তি পৃথিবীব্যাপী প্রেম-বিষাদের ভূমিকারূপে কাজ করেছে। মৃত্যু নিতান্ত সত্য এবং অমোঘ, অথচ মানুষের প্রেম মৃত্যুকে অস্বীকার ক'রে বিজয়ী হতে চায়—এই বিষয়বস্তুটি আমাদের চিন্তায় অজানা না হলেও গ্রন্থনের চমৎকারিত্বে, অসাধারণ বিন্যাসকৌশলে রমণীয় হয়ে উঠেছে। কাব্যশেষে কবি বসুন্ধরার জননীরূপ অঙ্কন করে ঐ রমণীয় অনুভবকে বাড়িয়ে তুলেছেন। 'বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে—' প্রভৃতির মধ্যে বসুন্ধরায় উদ্বিগ্না বিষাদিনী জননীর চিত্রের আরোপ এবং অন্য দুএকটি নিসর্গ বর্ণন কবিতাটির আকর্ষণ বর্ধিত করেছে।

আমরা নানা স্থানে রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ কবিস্বভাবকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। তিনি কেবল ভগবৎতত্ত্বপ্রেমিক নন আবার কেবল অবাস্তব কল্পনাসৌধে বিচরণের প্রয়াসীও নন। তিনি মানবিক সুখদুঃখের অন্তরঙ্গ কবি, এবং বাস্তব দৈন্য, দুঃখ, জড়ত্ব এবং গ্লানিরও কবি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি ভাষায় প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন প্রায়শঃ। কবিরা কখনও অপ্রতীকী শব্দার্থেই চারুতা এনে থাকেন, কখনও বাক্যগুলিকে ইঙ্গিতবহ করেন, কখনও শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগে বিষয় ব্যঞ্জিত করেন। রবীন্দ্রনাথ বাস্তবের ও জীবনের কথাই বলছেন অথচ ইঙ্গিতময় ভাষায় তা বলছেন—এমন ক্ষেত্রে কাব্যবোধের দৈন্যবশতঃ যদি মনে করা যায় রবীন্দ্রনাথ তুরীয় ভাববিশেষের কবি তাহ'লে কবির উপর অবিচার করা হয়। যেমন আলোচ্য কবিতাটিতে সাধারণ মানবজীবনপ্রীতি এবং পৃথিবীপ্রীতির চমৎকার স্ফুরিত হয়েছে তেমনি বহু উত্তম কবিতাতেও হয়েছে। আবার কল্পনায় তিনি যেখানে নভোবিহার বা সুদূরে সঞ্চরণ করতে চাইছেন সেখানেও আমাদের মানবসাধারণের কামনা-বাসনার সীমা লঙ্ঘিত হয়নি। তাঁর বিশিষ্ট অরূপ যে নিসর্গ ও মানব-সম্পর্কের অতিরিক্ত নয় একথা গ্রন্থান্তরে বিস্তৃতভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

যাই হোক, রবীন্দ্রের রচনায় যেখানে কাব্যিক চমৎকার অনায়াসে দীপ্তিলাভ করেছে সেখানে তত্ত্ব বা তুরীয় থেকেও নেই একথাই বুঝতে হবে।

এই অক্ষরমাত্রিক শ্রেণীর ত্রিপদী বা চৌপদীতে বিন্যস্ত এবং মিল-সংযোগে ও স্তবকে আবদ্ধ 'পরশপাথর' এবং 'হৃদয়-যমুনা' কবিতার কাব্যগত চমৎকারিতা সম্পর্কে কেউ কেউ নিঃসংশয়। **'পরশ পাথর'** কবির গভীরভাবে নৈষ্ঠিক রচনা, খেলাচ্ছলে সৃষ্টি নয়। আবার এর মধ্যে কবির দৃঢ়প্রত্যয়ের একটি আইডিয়া রূপ পেতে চেয়েছে, ঐন্দ্রিয়ক অনুভবের চমৎকার নয়। ঐ আইডিয়াকে (ধরা যাক, মানবীয় স্নেহপ্রেম-সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে, জ্ঞানমার্গ ও সন্ন্যাস আশ্রয় ক'রে সত্যের অনুসন্ধান করতে গেলে ব্যর্থ হতে হয়, কারণ, প্রার্থিত সত্য বস্তু সংসারের মধ্যেই রয়েছে, বাইরে নয়—এরকম একটা উপলব্ধি) ভাষায় কবিত্বময় রূপ দিতে গিয়েই কবিকে খ্যাপা বা সন্ন্যাসীর চরিত্র আঁকতে হয়েছে। নতুবা সন্ন্যাসীবিশেষের চরিত্র ও ঘটনার অভিঘাত দেখিয়ে তার জীবনের বিষাদান্ত পরিণাম দেখানোর কোনও প্রয়াস কবির নেই। এরকম হ'লে কবিতাটি ঠিক আখ্যানকাব্য হ'ত এবং ট্র্যাজেডির করুণরস ঘনীভূত হতে পারত। এখানে ট্র্যাজেডির মায়া মাত্র আছে, আসল ট্র্যাজেডি নেই, বরং বিদ্রূপের স্পর্শ (ভাষায় ও ভঙ্গিতে প্রায় সর্বত্র তা প্রকাশিত) করুণ থেকে ভিন্নস্তরেই কবিতাটিকে স্থাপন করেছে। করুণরসের আহ্লাদাবশেষ সেক্ষেত্রেই উচ্ছলিত হবে যেখানে চরিত্রের সঙ্গে কবিহৃদয়ের অকৃত্রিম সহানুভূতি থাকবে। এখানে 'দুটো নেত্র সদা যেন নিশার খদ্যোত হেন' প্রভৃতি বর্ণনারম্ভে পাগলের (সন্ন্যাসীর) প্রতি করুণার চেয়ে ব্যঙ্গের ভাবই প্রবল। সেইজন্য বলা হয়েছে—'দশা দেখে হাসি পায়' এবং সিন্ধুও 'তরঙ্গে তরঙ্গে উঠি হেসে হ'ল কুটিকুটি'। কবিতাটির শেষের দিকে সন্ন্যাসীর বিড়ম্বনা ও ব্যর্থতার কিছু চিত্রে কারুণ্যের আভাস থাকলেও যেহেতু সন্ন্যাসীর কার্যাবলী নিঃশেষে ভ্রান্ত বা পাগলের চারিত্র্য বলে পূর্ব থেকেই প্রতীয়মান, সেইহেতু তার সঙ্গে সহানুভূতির কোনও ভাব আমরা তেমন অনুভব করি না। কবির অভিপ্রায়ও তা নয়, ভুল পথে চলার বিড়ম্বনা দেখানোতেই তাঁর কার্যসিদ্ধি। অবশ্য কবির "তখন যেতেছে অস্তে মলিন তপন" প্রভৃতির নিসর্গের ভূমিকায় ব্যর্থকাম বৃদ্ধের চিত্র প্রতিপাদ্য বস্তুর সঙ্গে কাব্যের মিশ্রণে একপ্রকার মিশ্ররসের উদ্ভব ঘটিয়েছে। লক্ষণীয় এই যে এই ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ ঘটনাময় কোনও জীবনচিত্র

আমরা পাচ্ছি না। কোনও ব্যক্তিরচরিত্র মাত্র অঙ্কন ক'রে তার ট্র্যাজেডি প্রদর্শন কবির লক্ষ্য নয়।

কবিতাটির বর্ণনধারায় ভাষার বক্রসৌন্দর্যের নিতান্ত অভাব। নিসর্গ-পরিবেশ বিরচনে কবির কল্পনাশক্তির নিতান্ত অভাব নাই, অথচ ভাষায় তা সঞ্চারিত হচ্ছে না। 'সূর্য ওঠে প্রাতঃকালে পূর্ব-গগনের ভালে', 'জলরাশি অবিরল করিতেছে কলকল' 'মিলি যত সুরাসুর কৌতূহলে ভরপুর এসেছিল পা টিপিয়া এই সিন্ধুতীরে।' 'তবু ডাকে সারাদিন······একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা' ইত্যাদি বর্ণনায় লঘুতা, অতিসাধারণত্ব, অনর্থক বাগ্-বিস্তার প্রভৃতি দোষ লক্ষিত হচ্ছে। তৃতীয় স্তবকে সৃষ্টি, সমুদ্র এবং সমুদ্র-মন্থনের বর্ণনা পাঠকের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করেছে। কবির এই বর্ণনার অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে, যেখান থেকে পৃথিবীর আদি সৌন্দর্যের উদ্ভব সেখানে বৈরাগ্যবাদী এই সৌন্দর্যের বস্তু অবহেলা ক'রে অপার্থিব শূন্য বস্তুর সাধনা করছে, কী ভুল! কিন্তু এই পৌরাণিক বর্ণনায় কবির অভিপ্রেত সিদ্ধ হচ্ছে কিনা গুণীরা তার বিচার করবেন। চতুর্থ স্তবকে পাগল কিভাবে মিথ্যার সন্ধানে ব্যস্ত তা বোঝাবার জন্যে কবি বিহঙ্গ, সমুদ্র, আকাশের ব্যাকুলতা ও অহর্নিশ অনুসন্ধান-প্রবৃত্তির কথা বলেছেন। এগুলিও সার্থক উপমা হয়েছে এমন বলা যায় না। মোটের উপর কবিতাটিকে রূপক ব'লেই গ্রহণ করা যায়, বিশুদ্ধ ঐন্দ্রিয়ক অনুভবের গীতিকাব্য ব'লে নয়।

বর্ষায় কানায় কানায় পূর্ণ নদী অথবা সরসীর চিত্র হিসাবে **'হৃদয় যমুনা'** কবিতাটি মন্দ নয়, কিন্তু একে যদি প্রেমিকার সঙ্গে মিলনের রূপক হিসেবে গ্রহণ করা যায় তাহলে কবিতাটির ঐ আবেদন থাকে কিনা সন্দেহ। অথচ এর আখ্যায় এবং প্রথম স্তবকের বর্ণনায় অতল হৃদয়ে অবগাহনের অর্থাৎ মিলনের নিমিত্ত ব্যাকুলতাময় আহ্বানের ভাবই প্রবল। শেষ স্তবকের মধ্যেও নিবিড়মিলনের কথাই রূপকচ্ছলে বলা হচ্ছে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। ফলতঃ কবিতাটি রচনা হিসাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। বৈষ্ণব কাব্য-পরিবেশে অনুপ্রাণিত কবি হয়ত প্রথমে অনুরূপ নিবিড় মিলনের বিষয়ই বর্ণনা করতে বসেছিলেন, কিন্তু পরে নিসর্গ এবং অবগাহনের চিত্র তাঁকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এই কবিতাটিকে আমরা অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতির লঘু-কল্পনাভঙ্গির ব'লে মনে করতে পারি। এর দ্বিতীয় তৃতীয় স্তবকে গ্রথিত

নিসর্গচিত্র ('যদি কলস ভাসায়ে জলে' ইত্যাদি) পরবর্তী কালে মাত্রাবৃত্ত-ছন্দে অধিকতর রমণীয় হয়ে উঠেছে, যেমন—

ওগো নদীকূলে তীরতৃণতলে
কে বসে অমল বসনে শ্যামল বসনে
সুদূর গগনে কাহারে সে চায়
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়— ইত্যাদি

এবং 'যমুনাকূলে মনের ভুলে ভাসায়ে দিয়ে গাগরি' ইত্যাদিতে। আসলে কবির খেয়ালী এবং কোমলকলাবিলাসী চিত্ত মাত্রাবৃত্তেই একালে (এবং মুখ্যতঃ সর্বত্র) প্রকাশিত হতে চেয়েছে। অক্ষরমাত্রিক ছন্দে এরকম কলা-কুশলতার গ্রন্থন-প্রয়াসে নৈষ্ঠিক গভীরতা এবং ভাষা চতুরতার কোনোটিই সংগতিলাভ করতে পারে না।

অথচ এই ছন্দোরীতিতে লেখা বহিরঙ্গ ভাব-উদ্দীপনের স্পর্শমুক্ত, কল্পনার কৃত্রিম আতিশয্যহীন এবং দৃঢ়নিবদ্ধ কোনও আইডিয়ার প্রভাব থেকেও মুক্ত একটি অনবদ্য গীতিকবিতা কবি আমাদের উপহার দিয়েছেন **"ভরা ভাদরে"** আখ্যার কয়েকটি পঙ্‌ক্তিবিন্যাসে। গীতিকবির নিগূঢ় আত্মলীনতার জন্য অনেক সময় উত্তম কবিতাও পাঠকের কাছে যেভাবে অস্পষ্ট হয়ে পড়ে, এখানে সেরকম কিছু বিন্দুমাত্র হয় নি।

নদী ভরা কূলে কূলে খেতে ভরা ধান।
আমি ভাবিতেছি বসে কী গাহিব গান।
কেতকী জলের ধারে
ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে
নিরাকুল ফুলভারে বকুল বাগান।
কানায় কানায় পূর্ণ আমার পরান।
ঝিলিমিলি করে পাতা ঝিকিমিকি আলো।
আমি ভাবিতেছি কার আঁখি দুটি কালো।—ইত্যাদি।

এ সবের মধ্যে কৃত্রিম গ্রন্থনের আড়ষ্টতা কুত্রাপি নেই। এর পাঠমাত্রেই বাঙ্‌লা ভাষায় কথাবার্তা বলেন এমন যে-কোন ব্যক্তি কবির সদৃশ কাব্যিকতার জগতে স্বচ্ছন্দে উন্নীত হতে পারেন। প্রসাদগুণ সাহিত্যের মৌলিক গুণ। ভাষার মাধুর্য, অর্থের সংকেত প্রভৃতি কবির বরণীয় রীতি হলেও, প্রসাদগুণের প্রাথমিক প্রয়োজন রক্ষা ক'রেই এগুলির সৌন্দর্য কার্যকর হয়। এই কবিতাটির

মিলবিন্যাস এবং শব্দ ও বাক্যগত চারুতাও কম নয়, অথচ তা এতই অনায়াস যে নিসর্গ-সৃষ্টি ব'লেই ভাবতে ইচ্ছা হয়। পরবর্তী কালে খেয়ায়, গীতাঞ্জলির কয়েকটি গানে এবং বিশেষভাবে ক্ষণিকায় এই ধরনের কবিস্বভাব এবং ভঙ্গির পরিচয় আমরা পেয়েছি। এটিও একদিক থেকে লঘুকল্পনারই কবিতা। অপার্থিব পৃথিবী-ব্যাকুলতা, নটরাজের আবর্তনচক্র, দুঃখবরণ ও সংস্কারমুক্তি প্রভৃতির উদাত্ত গাম্ভীর্য, সমুচ্চ ভাবনৈষ্ঠিকতা ও সুদূরবিস্তারী কল্পনার স্পর্শ এর মধ্যে নেই অথচ কবিতা হিসেবে এটি নির্দোষভাবেই সুচারু। কবিতাটি নিসর্গের, কিন্তু কেবল নিসর্গের নয়, এর মধ্যে কবির বাসনা-কামনাময় চিত্তলোকও প্রদীপ্ত হয়েছে। সে-চিত্তের রমণীয় ভাবস্পর্শ হ'ল প্রেমের, বিরহের। ব্যাকুলতা, স্মরণ, বিষাদ, বিতর্ক প্রভৃতি সঞ্চারিভাব ঐ প্রণয়-বিরহের ব্যঞ্জনা দিয়ে সৌন্দর্যের উদ্ভব ঘটাচ্ছে। নিসর্গবর্ণনে সহজ চারুতার অথবা ধরা যাক স্বভাবোক্তির পরিচয় কবিতাটির সর্বাঙ্গে। এই স্বভাব-বর্ণন আবার স্থানে স্থানে অনায়াস ধ্বনিময় শব্দ সহযোগে যে-কমনীয়তার বিস্তার করছে তার দৃষ্টান্ত নিম্নলিখিতরূপ অংশে পাওয়া যাবে— 'ঝিলিমিলি—ঝিকিমিকি' 'নিরাকুল ফুলভরে' 'গন্ধে ভরা অন্ধকার' 'তরুশাখে হেলাফেলা কামিনীফুলের মেলা' প্রভৃতি। প্রণয়িনীর কথা স্পষ্ট উচ্চারণ না ক'রে 'কার' 'কারে' 'কেহ' প্রভৃতি সর্বনামে ধ্বনিত করাতে চমৎকার সমধিক হয়েছে। কবিতাটি গীতিকবির ক্ষণভাবুকতার একটি স্বচ্ছন্দ মুহূর্তের পরিচ্ছন্ন প্রকাশ।

একমাত্র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' ছাড়া একালের মাত্রাবৃত্ত ছন্দের শ্রবণরমণীয় কবিতাগুলি লঘু কল্পনার ও নিরর্থক উচ্ছ্বাসময়তার নিদর্শন। এরকম একটি কবিতা হ'ল 'ব্যর্থযৌবন' আর একটি '**ঝুলন**'। অনুপ্রাস-বিন্যাসে রবীন্দ্রের ঐশ্বর্য যে সীমাহীন তার পরিচয় এগুলিতে মিলবে। ফলতঃ কবিতাগুলি আবৃত্তিতে মধুর হয়েছে। এই ধরনের রমণীয়তার নিঃশেষ চাতুর্য ফুটেছে অবশ্য কল্পনা, কথাত্রিও ক্ষণিকা কাব্য থেকে। এখানে বিশেষ এই যে, বাঙ্‌লার তদ্ভব শব্দই অনুপ্রাসের মহিমা যথাসম্ভব রক্ষা করছে দেখতে পাই। 'ঝুলন' কবিতার বাচ্যার্থ কতকটা অস্পষ্ট। সুতরাং অর্থগত ব্যঞ্জনার পরিস্ফুটতাও এতে নেই। কবি নিজে একটি প্রবন্ধে এর অর্থ নির্দেশ করছেন—বিমূঢ়তা থেকে আত্মার জাগরণ—এইরকম। অর্থ যাই হোক, প্রাণকে বধূর সঙ্গে অভেদে তুলনা ক'রে প্রবল অনুরাগের দুটি বিভিন্ন পর্যায় সন্নিবেশ করার জন্য

এর মাধুর্য ফুটেছে। প্রথম পর্যায়ে 'বাসর-শয়ন করেছি রচন' এবং 'সোহাগ করেছি চুম্বন করি' প্রভৃতির মধ্যে প্রণয়ের সাধারণ বিলাসচিত্র। দ্বিতীয় পর্যায়ে মৃত্যুর বা দুঃখবন্ধুরতার মধ্য দিয়ে বধূর স্বরূপ-রহস্যের আবিষ্কার ও রূঢ় জীবন উপভোগ। এ যেন কতকটা মহুয়ার বাস্তবতা-উদ্দীপ্ত প্রণয়, স্বপ্নমোহ থেকে জীবনের রুক্ষতার মধ্যে পরিত্রাণের উৎসাহ। কিন্তু ছন্দের দোলা এবং অনুপ্রাসের চমকে ঐ অনুভবের প্রকাশ বাধিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে যেখানে বিলাস-স্বপ্ন থেকে মুক্তি চাওয়া হয়েছে সেখানেও কবি এক বিপরীত রীতির বিলাসচিত্রেরই অবতারণা করেছেন, যার ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে রঙের ঝংকার, বিলাস থেকে প্রত্যাবর্তনের উৎসাহ নয়। 'মরণদোলায় ধরি রশিগাছি বসিব দুজনে অতি কাছাকাছি' প্রভৃতিতে প্রত্যাশিত ওজোগুণ অপেক্ষা অতিরিক্ত মাধুর্যের কোমলতা। আর এই দোলায় আরোহণের চিত্রে যে ধ্বনিমাধুর্য বিস্তৃত হচ্ছে তা পূর্বেকার অলসাবেশ থেকে অধিকতর রমণীয় কিনা তা রসিকেরা চিন্তা করবেন—

> উড়ে কুন্তল, উড়ে অঞ্চল,
> উড়ে বনমালা বায়ুচঞ্চল,
> বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিনী মত্তবোল্।

অথচ সমার্থদীপ্ত 'মহুয়া'র কবিতাটিতে এই উচ্ছল মাধুর্য না থাকায় তা শব্দার্থ-সংগতি রক্ষা ক'রে একটি উত্তম গীতিকবিতার জন্ম সম্ভব করেছে—

> পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়ে
> বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে,......
> পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি ছিন্ন পালের কাছি,
> মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ, আমি আছি।

এখানে অনুপ্রাস ও ছন্দের বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও তা অতিপ্রগল্‌ভ হয়ে শুধু শ্রুতিযন্ত্রে নিঃশেষ হয়ে পড়ছে না।

'ব্যর্থযৌবন'ও এই রকম শ্রবণরোচন কবিতা, এর মধ্যে বিপ্রলব্ধা বা খণ্ডিতা নায়িকার অবস্থানুকৃতি আছে, কিন্তু তা যে-পরিমাণে পদাবলীর অনুরূপ চিত্রের সারসংকলন এবং তার উপর আর্টিস্টের আলিম্পন রচনা, সে-পরিমাণে কবির স্বকীয় কল্পলোকের বাসনা-বিক্ষুব্ধ প্রকাশ নয়। আমরা প্রাচীনের উপর রবীন্দ্র কবিচিত্তের নবালোকসম্পাতের অপূর্ব রহস্য অন্যত্র অনুভব করি।

'এ বেশভূষণ লহ সখী, লহ
এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ
এমন যামিনী কাটিল বিরহ শয়নে।'

—এখানে পুরাতন অর্থের বা ভাবনার অনুকৃতি মাত্র রয়েছে, কবি এখানে আন্তরিকতাহীন নিঃশেষ আর্টিস্ট, ক্রীড়াশিল্পী। এ ধরনের ফাঁকা শিল্পের নিদর্শন বড় আর্টিস্টের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিকও। পদাবলীর এরকম ভাবুকতা-শূন্য অনুকৃতি এককালে কবিওয়ালাদের প্রমত্ত করেছিল। 'সখি, শ্যাম না এল। (আমার) অলস অঙ্গ শিথিল কবরী বুঝিবা যামিনী বিফলে গেল'। কিন্তু রবীন্দ্রের সমকক্ষ অনায়াস কৌশলের অধিকারী তাঁরা ছিলেন না। আবার নৈষ্ঠিকতার আতিশয্য থাকলেই যে কাব্যচমৎকার ঘটবে এমন কোনও কথা নয়। কল্পনাশক্তিই এখানে কবিকৃতির প্রধান নিয়ামক। 'ব্যর্থযৌবন' কবিতার নির্মাণে কবি তাঁর উচ্চ কল্পনাকে নিযুক্ত করেন নি।

স্বল্প কথা এবং নগণ্য তত্ত্ব এবং সেই সঙ্গে উদার কল্পনা ও শব্দার্থ-চমৎকারই কাব্যলক্ষ্মীর স্বচ্ছন্দ বিহারভূমি। সন্দেহ নেই আমরা অর্থ এবং তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাই ব'লে কাব্যসৌন্দর্যের স্পর্শ থেকে কতকটা বঞ্চিত থাকি। কিন্তু সমস্যা এই যে আধুনিক গীতিকবিদের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে বিষয়ার্থ কখনও কখনও খুব স্বচ্ছভাবে প্রকাশিত থাকে না। সেরকম স্থলে বাচ্যার্থের অস্পষ্টতার জন্য কাব্যবোধ বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। 'চিত্রা' কাব্যের কবিতানিচয়, একমাত্র 'জীবনদেবতা' শ্রেণীর কবিতা কটি ছাড়া, সর্বত্র অর্থের কুহেলিকা থেকে মুক্ত, বরং অর্থপ্রকাশের ঋজুতা ও স্পষ্টতাই পূর্বাপেক্ষা এখানে লক্ষণীয় বিষয়।

এর দ্বিতীয় কবিতা **'সুখ'** রচনাটির ভাব-সংযমন লক্ষণীয়। কবি যে-শান্ত ও বিচিত্র নিসর্গের ছবি দেখলেন (ভেসে যায় তরী প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি—ইত্যাদি) তা নিয়ে পরবর্তী অংশে সুদূর-কল্পনা ও উচ্ছ্বাসের অবকাশ কম ছিল না। কিন্তু সে পথে না গিয়ে কবি অনাবিল সহজ তৃপ্তির মধ্যেই নিমগ্ন থাকতে চাইলেন। প্রথমাংশে নিসর্গসৌন্দর্য নির্মাণ এবং দ্বিতীয় অংশে আত্মভাব-প্রকাশ—এ রহস্য অন্তরে চিরকালের জন্য মুদ্রিত এবং বাহিরে প্রকাশিত করবেন এমন ভাষা নাই। কবির এই অনুভব যদিও আমাদের কাছে মূল্যবান, তবু কবিতার সৌন্দর্য নির্ভর করছে প্রথমাংশের ঐ চিত্রগুলির সংযোজনের মধ্যে। পরিচিতের মধ্যে অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্যের

গ্রন্থন কবি শুধু বিভাব-চিত্রগুলির নির্বাচনের মধ্যেই সমাধা করেছেন। এই বিভাবগুলির বস্তুরূপ হ'ল পদ্মা, তরণী, বালুচর, তীর, কুটির, পথ, স্নাননিরতা গ্রামবধূ, জেলে, উলঙ্গ বালকের সন্তরণ, আকাশের নীলিমা, মধ্যাহ্ন এবং আতপ্ত বাতাস। বর্ণনার কৌশলে এবং ছন্দের মধ্যে লীলায়িত উত্তম গদ্যরীতির সাহায্যে পদ্মাতীর থেকে সংক্ষিপ্ত এক কল্পলোক চয়ন ক'রে কবি আমাদের উপহার দিয়েছেন।

'চিত্রা'য় অক্ষরমাত্রিক ছন্দোরীতির প্রতি অধিকতর আনুগত্য একটি লক্ষণীয় বিষয়। এর সঙ্গেই মিলিয়ে দেখতে হবে একালের রচনায় প্রৌঢ়তা-গুণ এবং কাব্যচমৎকারের প্রগাঢ়তা। চিত্রার উন্নত প্রকাশগুলি এই রীতির মধ্যে, গুণসমৃদ্ধ উত্তম গদ্য ভাষার মধ্যস্থতায়। প্রেমের অভিষেক, সন্ধ্যা, বিজয়িনী, আবেদন, পূর্ণিমা, স্বর্গ হইতে বিদায়, উর্বশী—এই উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি সুচারু গদ্যের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট অক্ষরমাত্রিক ছন্দে লেখা, এর অধিকাংশ আবার চোদ্দ অক্ষরের বিশিষ্ট অমিতাক্ষর-ছেদ পদ্ধতিতে। এগুলিকে বিষয় হিসেবে দুভাগে বিভক্ত ক'রে দেখা যাক্—সৌন্দর্য-অনুভব এবং পৃথিবী-প্রীতি বা জীবনানুরাগ।

সৌন্দর্য-অনুভবের কবিতাগুলির চারুতা নির্ভর করছে (১) ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে আগত কল্পচিত্রগুলির পরিচয় দানে (২) নারীরূপের আরোপে (৩) বাস্তবতার অতিরিক্ত সুদূরতার রহস্য সঞ্চারে। **'চিত্রা'** নামীয় প্রথম কবিতাটি সৌন্দর্য-বিষয়ক অন্যান্য কবিতাগুলির সারসংগ্রহবিশেষ। যে সৌন্দর্য-নারীসত্তা কবিকে হাস্যে, পরিহাসে, চঞ্চলগমনে এবং রূপোৎসারে বিহ্বল করেছে তাকে স্থিরভাবে নিরীক্ষণ করবার এবং সপ্রশংস স্তুতির ভাব এই কবিতাটিতে প্রবল। যাকে শব্দস্পর্শাদির মধ্যে পাচ্ছেন তাকে আরাধনা করতে চাচ্ছেন দ্বিতীয় স্তবকে, তাই এই অংশের সৌন্দর্য-সত্তা দ্বিতীয় আর এক সৌন্দর্যসত্তার মত প্রতিভাত হচ্ছে মাত্র, আসলে পৃথক্ নয়। কোনো-ক্ষেত্রেই কবি ইন্দ্রিয়ানুবর্তিতাকে অতিক্রম করছেন না। এই আরাধ্য-আরাধক সম্পর্ক কল্পনা 'অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা' 'একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি' প্রভৃতির মধ্যে প্রকাশিত। রূপগন্ধশব্দাদি ব্যক্ত হয়েছে—

> মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে,
> অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে,
> মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে

প্রভৃতির মধ্যে। এই শব্দস্পর্শাদির মধ্যে অনুভবের তীব্র আগ্রহ পরিস্ফুট হয়েছে **'জ্যোৎস্নারাত্রে'** কবিতায়—

বাজিতেছে সুমধুর
রিনিঝিনি রুনুঝুনু সোনার নূপুর—
কার কেশপাশ হতে খসি পুষ্পদল
পড়িছে আমার বক্ষে, করিছে চঞ্চল
চেতনাপ্রবাহ। কোথায় গাহিছ গান।
তোমরা কাহারা মিলি করিতেছ পান
কিরণ-কনক-পাত্রে সুগন্ধি অমৃত,
মাথায় জড়ায়ে মালা পূর্ণবিকশিত
পারিজাত—গন্ধ তারি আসিছে ভাসিয়া
মন্দ সমীরণে—

সমস্ত কবিতাটি কবির রূপাভিলাষের আগ্রহে পূর্ণ। এ রূপ দিব্যসৌন্দর্যময়ী নারীর ব'লে শৃঙ্গাররসমাধুর্য এরকম কবিতার সর্বাঙ্গ বেষ্টন করে রয়েছে এবং এই শ্রেণীর কবিতাগুলিকে শুষ্ক সৌন্দর্য-সত্য অন্বেষণের ব্যাপারমাত্রে পর্যবসিত করে নি। নারীসৌন্দর্যময়ীর সঙ্গে কবির বিরহই যেহেতু স্বাভাবিক সেইহেতু রসের দিক থেকে কবিতাটি বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের হয়েছে। 'পূর্ণিমা' কবিতায় অবশ্য বিরহ তীব্র হয় নি, সেখানে রহস্যময়ী অভিসারিকা বেশে তার আবির্ভাব। সর্বত্র নিষুপ্ত পূর্ণিমা রাত্রির পটভূমি। কবির তীব্র নারীরূপমোহ নিম্নলিখিত ভাষাভঙ্গিতে পরিস্ফুট হয়েছে—

বক্ষ হতে লহ টানি
অঞ্চল তোমার, দাও অবারিত করি
শুভ্র ভাল, আঁখি হতে লহ অপসরি
উন্মুক্ত অলক। কোনো মর্ত্য দেখে নাই
যে দিব্য মূরতি আমারে দেখাও তাই
এ বিশ্রব্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে।

এই পর্যায়েরই কিছুকাল পূর্বে লেখা **'মানসসুন্দরী'** কবিতায় বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-অনুভবের চেয়ে ব্যক্তিগত অনুরাগ-বাসনা প্রবলতর হয়েছে দেখতে পাই—

উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ
রেখো ওষ্ঠাধরপুটে, ভক্তভৃঙ্গ তরে

সম্পূর্ণ চুম্বন এক,.........
শুধু মোর করে তব করতলখানি,
শুধু অতি কাছাকাছি ছুটি জনপ্রাণী,
অসীম নির্জনে ; বিষণ্ণ বিচ্ছেদরাশি
চরাচরে আর সব ফেলিয়াছে গ্রাসি—
শুধু এক প্রান্তে তার প্রলয়মগন
বাকি আছে একখানি শঙ্কিত মিলন,
ছুটি হাত, ত্রস্ত কপোতের মতো ছুটি
বক্ষ ছুরুছুরু.........

হতে পারে প্রত্যক্ষের কোনো রূপময়ী নারীর স্মৃতি, কল্পনায় অভিলষিত বাস্তবে অপ্রাপ্ত সঙ্গবাসনা কবির সৌন্দর্য-ভাবনার সঙ্গে মিশে গেছে, অথবা ঐ বাস্তব রূপানুরাগ এবং রূপোল্লাসই কবি-মনস্তত্ত্বের নিয়মে অলৌকিক সৌন্দর্যবাসনায় ভাবান্তর পরিগ্রহ করেছে। আমরা গ্রন্থান্তরেও ব্যক্ত করেছি যে রবীন্দ্র-সৌন্দয-অনুভবের সঙ্গে সর্বত্র নারীরূপমোহের যোগ এই শ্রেণীর কবিতানিচয়ের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। মানস-সুন্দরী কবিতার আবেগ-উচ্ছ্বাসের আতিশয্য এবং বাগ্‌বাহুল্য কবিতার প্রত্যাশিত পরিমিতির হানি ঘটিয়েছে। যদিও স্থানে স্থানে কবিকল্পলোকের রমণীয় পরিচয়ে এবং প্রতিভার স্বাক্ষরে কবিতাটি স্মরণীয় হয়েছে, যেমন—

(১) ছুটি কর্ণে ছুলিত মুকুতা, ছুটি করে
সোনার বলয়, ছুটি কপোলের পরে
খেলিত অলক, ছুটি স্বচ্ছ নেত্র হতে
কাঁপিত আলোক নির্মল নির্ঝর-স্রোতে
চূর্ণরশ্মি সম।

(২ স্বর্গ হতে মর্ত্যভূমি
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল ; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা ; পূর্ণতটিনীর জলে
করিছ বিস্তার তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি।

(৩) পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কিনা তুমি
আমারি জীবনবনে সৌন্দর্যে কুসুমি,
প্রণয়ে বিকশি। মিলনে আছিলে
বাঁধা শুধু একঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে গন্ধ বাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার।
গৃহের বনিতা ছিলে, টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়।

এই পঙ্‌ক্তিগুলি ভাষা ও অলংকারগত বক্রতারও পরিচায়ক। কিন্তু মানস-সুন্দরীতে অতিকথন এবং একই বিষয়ের পুনঃপুনঃ উদ্দীপন ক্লান্তিবহ হয়েছে। পূর্ণিমা, জ্যোৎস্না-রাত্রে প্রভৃতি কবিতায় এ পরিস্থিতি নেই। 'মানসসুন্দরী'তে রসগত একটি প্রবল অসংগতিও লক্ষণীয় হয়েছে। তা হ'ল শৃঙ্গাররসের বিভাব-চিত্রের মধ্যে বাৎসল্য বিভাবের প্রশ্রয়। এই কারণেও মনে করা যেতে পারে কবিতাটির কবির অন্তর্লোকে স্ফুরণের মূলে বাস্তব-প্রসক্তি নগণ্য নয়। নিম্নলিখিত অংশে বাৎসল্যের ছায়াপাত ঘটেছে এবং এ-বাৎসল্য শৃঙ্গারের বাৎসল্য এমন মনে করলেও দীর্ঘস্থায়ী প্রগল্‌ভ প্রণয়চিত্রের ব্যাঘাত থেকে সৌন্দর্যকে রক্ষা করা যায় না—

জানালায়
একেলা বসিয়া যবে আঁধার সন্ধ্যায়
মুখে হাত দিয়ে মাতৃহীন বালকের
মতো বহুক্ষণ কাঁদি স্নেহ-আলোকের
তরে—ইচ্ছা করি, নিশার আঁধারস্রোতে
মুছে ফেলে দিয়ে যায় সৃষ্টিপট হতে
এই ক্ষীণ অর্থহীন অস্তিত্বের রেখা,
তখন করুণাময়ী দাও তুমি দেখা
তারকা-আলোক জ্বালা স্তব্ধ রজনীর
প্রান্ত হতে নিঃশব্দে আসিয়া; অশ্রুনীর

অঞ্চলে মুছায়ে দাও ; চাও মুখপানে
স্নেহময় প্রশ্নভরা করুণ নয়ানে ;
নয়ন চুম্বন কর ; স্নিগ্ধ হস্তখানি
ললাটে বুলায়ে দাও ; না কহিয়া বাণী
সান্ত্বনা ভরিয়া প্রাণে, কবিরে তোমার
ঘুম পাড়াইয়া দিয়া কখন আবার
চলে যাও নিঃশব্দ চরণে।

এ তো স্পষ্ট বালকের প্রাপ্য বাৎসল্য স্নেহ। বাস্তব-সংসক্তি থেকে আগত ভাবের অসংযম বা অতিকথনই কবিতাটিকে নিঃসন্দেহে পরিমিত অখণ্ড প্রকাশ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

এই পর্যায়ের নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং স্বদেশীয় বিদেশীয় আধুনিক গীতিকাব্যেরও শ্রেষ্ঠ উপহার **'উর্বশী'**। এই কবিতাটির রূপনির্মাণ সম্বন্ধে গ্রন্থান্তরে* আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। এখানে অতিপ্রয়োজনীয় কয়েকটি কথা মাত্র উচ্চারণ করছি। এর ছন্দোগত পঙ্‌ক্তি নির্মাণে বর্ণনা এবং বন্দনার ভাব একত্র যুক্ত হয়েছে। এর শব্দবিন্যাস এবং অর্থপরম্পরা যেন পরস্পর পরস্পরকে সৌন্দর্যে অতিক্রম করতে চাইছে এবং এইভাবে এক আশ্চর্য রমণীয়তার সঞ্চার ঘটেছে। এর কল্পচিত্রগুলি পার্থিব সাধারণত্বকে অতিক্রম করেছে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রেই মহাকাব্যোচিত ব্যঞ্জনার পরিচয় দিয়েছে। রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি প্রভৃতি অর্থালংকার এবং ধ্বন্যাতিরেকহীন শব্দালংকারে এর কল্পিতার্থ এবং চিত্রবহ বাক্যাঙ্গ মনোহারী হয়েছে।

প্রথম স্তবকে এক অপার্থিব নারীসত্তাকে কবি লৌকিক সম্পর্ক থেকে বিনির্মুক্তভাবে দেখেছেন। কবির ভাবনা এই যে, লৌকিক সম্পর্কে আবদ্ধ আমাদের পরিচিত পৃথিবীর নারী যতই রমণীয় হোক, কল্পিত অপার্থিব সৌন্দর্যের অধিকারিণী হতে পারে না। অথচ বিশেষ এই যে, এই সৌন্দর্যসত্তা যদি নারী না হয় তার প্রতি কবির আকর্ষণও নেই। অর্থাৎ নিসর্গ বস্তু থেকে, অথবা কীট্‌স্‌-এর মত, সৃষ্ট সৌন্দর্যের বস্তু থেকে কবি প্রায় নিরবয়ব সৌন্দর্যের ধ্যানে নিরত হচ্ছেন না, আর এও স্পষ্ট যে পূর্বকল্পিত কোনো ধারণাও তদনুযায়ী একটা রূপ নির্মাণে কবিকে প্রবৃত্ত করছে না। কবির এই অনুভব নিতান্তই ইন্দ্রিয়ানুগ, 'immediate', এবং নারীরূপ ও নিসর্গ

---

*'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়' দ্রষ্টব্য।

(যেমন জ্যোৎস্না-বিচ্ছুরিত আকাশ ও পৃথিবী) একত্রে কবির এহেন চমৎকারবোধের উদ্দীপক হয়েছে। আংশিকভাবে কোনও কোনও ইংরেজি কবিতা, বৈদিক উষার বর্ণনা এবং বিশেষভাবে 'বিক্রমোর্বশী'য়ের উর্বশী-চিত্র কবির কল্পনাকে ঐশ্বর্য দিয়ে প্রগল্‌ভ এবং সুচারু করেছে। কবিতাটি রসের দিক থেকে বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের চর্বণপ্রকারে পরিণত হয়েছে, আর যে-নামহীন অশরীরী রূপলোকে চিত্তকে মুক্তি দিয়েছে তার লক্ষণ অলংকারশাস্ত্রে পাওয়া যাবে না।

'উর্বশী' কবিতার প্রথম স্তবকে বিশেষে তার গৃহবধূ-স্বভাব কবি অস্বীকার করছেন। ফলতঃ 'মানস-সুন্দরী' কবিতায় উপলক্ষিত প্রণয়-বাসনা থেকে এখানকার নিছক রূপবাসনা পৃথক হয়ে পড়েছে। মানস-সুন্দরী লৌকিক এবং অতিলৌকিকের মধ্যবর্তী। উর্বশী পুরামাত্রায় অতিলৌকিক। এই কবিতার দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্তবক পর্যন্ত কবির প্রৌঢ় অথচ উদ্দাম কল্পনাশক্তির পরিচয়। এই উচ্চকল্পনামূলক চিত্রসমূহের বিন্যাসেই 'উর্বশী' কবিতা নিতান্ত আকর্ষণীয় হয়েছে। নতুবা নারীরূপের সঙ্গে সৌন্দয-বিরহব্যাকুলতার বর্ণনা অন্যত্রও সুলভ। এই উদাত্ত কল্পনা উর্বশীর আবির্ভাবের বর্ণনে, বালিকাবস্থার চিত্রণে, তার আকাশ ও পৃথিবী-বিহারী স্বরূপ নিরূপণে। অতলস্পর্শ সমুদ্রতলে রূপকথার মায়ারাজ্যে যার বালিকাবস্থা কেটেছে তার যৌবনদীপ্ত প্রথম প্রকাশে তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্র শান্ত হয়ে পড়ে, অশান্ত মলয়বায়ু তারই দেহসুবাস বহন করে, আকাশে দ্রুত সঞ্চরণশীল কলহংসনিক্কণে তারই নূপুরশব্দ প্রতিধ্বনিত হয়। সুরসভায় যখন চঞ্চল পদক্ষেপে উর্বশী নৃত্য করে তখন পৃথিবীতে সমুদ্র তরঙ্গক্ষেপে আপন আনন্দ ব্যক্ত করে, শস্যক্ষেত্রে বাতাসের সঞ্চরণে পৃথিবী তার শিহরণ ব্যক্ত করে, আর উল্কারূপে নৃত্যপ্রমত্তা উর্বশীরই স্তনভারচ্যুত মণি ভ্রষ্ট হয়ে দিগন্তে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। এই সব উদাত্ত কল্পনাগুণেই 'উর্বশী' দুর্লভ সমুন্নতি লাভ করেছে।

এই আশ্চর্য নির্মাণের সঙ্গে কবির মনোযোগের অভাবজনিত যদি দু'একটি ছোটখাট ত্রুটি থাকতও, কিছু এসে যেত না, কিন্তু তা নেই। বলা চলে, শুধু সমুন্নত নয়, অনবদ্যও। কেউ কেউ এতে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যতত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে—এই বিষয়টি ধ'রে নিয়ে 'বিশ্বের প্রেয়সী' এবং 'বিশ্ব-বাসনা' এই শব্দ দুটির প্রয়োগে দোষের কল্পনা করেছেন। এবিষয়ে প্রথমে দেখতে হবে সৌন্দর্যতত্ত্ব হৃদ্‌গত করাবার জন্য কবি 'উর্বশী' রচনা করেন নি, আর ঐ শব্দ দুটিতে সৌন্দর্য

অবিশুদ্ধও হয়ে পড়ছে না। 'ক্রন্দসী' শব্দ কুশলী কবির কৌশলেরই পরিচয় দেয়। এর সঙ্গে কাব্য-চমৎকারের তেমন কোনও সম্বন্ধ নেই। বেদে রোদসী এবং ক্রন্দসী দুটি শব্দেরই প্রয়োগ আছে, ভিন্নার্থে। 'রোদসী' শব্দে দ্যাবা-পৃথিবী অর্থাৎ স্বর্গ ও পৃথিবী এবং 'ক্রন্দসী' শব্দে যুদ্ধনাদ। এর মধ্যে 'রোদসী'র সাদৃশ্যে ক্রন্দসী প্রয়োগ করে তিনি একাধারে ক্রন্দন-পরায়ণ এবং স্বর্গমর্ত্য দুই-ই ব্যঞ্জিত করেছেন। শেষ স্তবক দুটিতে সৌন্দর্য সম্পর্কে কবির বিরহ-ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যাংশে এই ভাব-বিবৃতিও সুন্দর, কিন্তু পূর্বেকার অদ্ভুত চিত্র-সংবলিত স্তবকগুলির মত নয়। আট-দশ মাত্রার দীর্ঘ পর্বে গ্রথিত স্তবকের শেষে আট-ছয়ের ও ছয়ের চরণ ও মিল-বিন্যাস এবং সেই সঙ্গে অন্তিম চরণে বিশেষণের বিন্যাস, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে ঐভাবে সম্বোধনের যোগ প্রভৃতি অতিরিক্ত বন্দনার মত সৌন্দয যুক্ত করেছে।

এই পর্যায়ের **'বিজয়িনী'** কবিতাতেই বরং সংক্ষিপ্ত একটি কথার গ্রন্থনে কবিচিত্তের বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতি মানসিক আগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। 'বিজয়িনী'র প্রথমাংশে বসন্ত-পরিবেশে স্নাননিরত নারীর বর্ণনায় নারী-সৌন্দর্যের মধ্যেই যৌনবাসনার সঙ্গে সম্পর্কবহিত অপরূপ অপাথিব সৌন্দর্যকে কবি দেখছেন। পরের অংশে মদনের আত্মসমর্পণ কবির অনুভব পরিস্ফুট করার কৌশল মাত্র। 'বিজয়িনী'র মানবীরূপের মধ্যেই অমানবীয়তার আভাস দর্শন অংশটিব নির্মাণে সংস্কৃত কাব্যের, বিশেষতঃ কাদম্বরীর ছায়াপাত ঘটলেও এবং ইতিপূর্বে চিত্রাঙ্গদায় এই ধরনেব নির্মাণে কবি সিদ্ধ হলেও, এখানকার নারীদেহ-সৌন্দর্য এবং বসন্ত-পরিবেশ যে দেহাতিরিক্ত স্বপ্নের সহায়ক হয়েছে তা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু **'আবেদন'** কবিতায় সৌন্দর্য-ময়ীর যে নিসর্গ-পরিবেশ কবি রচনা করেছেন তার তুলনা রবীন্দ্র-কাব্যেও কুত্রাপি নেই। স্পষ্টতঃ এই উদ্দীপন বিভাব নির্মাণে সংস্কৃত কাব্য-নাটক কবিকে উৎসাহ এবং উপকরণ দুই-ই দিয়েছে। রবীন্দ্র সৌন্দর্য-কল্পনার নির্মাণে সংস্কৃতের ঐশ্বর্যদান সম্পর্কে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। বর্তমানে আমাদের লক্ষণীয় হ'ল ঐ চিত্রগুলির বিন্যাসে অভিপ্রেত সৌন্দর্যের রাজ্য উন্মুক্ত হয়েছে কিনা। আর এ-সৌন্দর্যচিত্র কবির অভিপ্রেত প্রয়োজন-সম্পর্কহীন আর্টের রাজ্যে বিচরণের উৎসাহ চিত্তে প্রদীপ্ত করে কিনা। আমাদের অভিমতে কবি নিঃসন্দেহে সার্থক হয়েছেন। লক্ষ্য করতে হবে রানীর যে-পরিবেশ কবি অঙ্কন করেছেন তা একালের বাস্তব কোনও পরিবেশ

নয়, এমনকি সমগ্রভাবে প্রাচীনেরও বাস্তব পরিবেশ কিনা সন্দেহ। সংস্কৃত কাব্য-নাটকের নানাস্থানে এরকম পরিবেশ বিক্ষিপ্তভাবে চিত্রিত হয়েছে। সে সবের একটি সংগ্রথিত রূপ রোম্যান্টিক কবি তাঁর স্বপ্নসহচর ক'রে রেখেছিলেন, তারই কিঞ্চিৎ বিন্যাস ক'রে আমাদের রোম্যান্টিক অনুকূল চিত্তে তার প্রতিক্রিয়া জাগরিত করেছেন। যাঁদের সংস্কৃতের সাহিত্যরাজ্যে প্রবেশ ঘটে নি তাঁরা এর সৌন্দর্যের অংশ মাত্র পেতে পারবেন, পূর্ণ নয়। স্বল্প বর্ণনা দেখলেই পাঠক বুঝবেন প্রয়োজন-সম্পর্কে আবিল বাস্তব সংসার এ সৌন্দযের যোগ্য নয় ব'লে প্রায় কাল্পনিক জগতেই কবি একে স্থাপন করেছেন। বলা বাহুল্য, শব্দ ও বাক্যের অনুপ্রাসাদিময় বক্রতার মধ্যস্থতাতেই এই সৌন্দর্যরাজ্য সমধিক স্ফূর্তিলাভ করতে পেরেছে—

এ পারে নির্জন তীরে
একাকী উঠেছে ঊর্ধ্বে উচ্চ গিরিশিরে
রঞ্জিত মেঘের মাঝে তুষারধবল
তোমার প্রাসাদসৌধ, অনিন্দ্যনির্মল
চন্দ্রকান্তমণিময়। বিজনে বিরলে
হেথা তব দক্ষিণের বাতায়নতলে
মঞ্জরিত ইন্দুমল্লী-বল্লরীবিতানে,
ঘনচ্ছায়ে, নিভৃতকপোতকলগানে
একান্তে কাটিবে বেলা ; স্ফটিক প্রাঙ্গণে
জলযন্ত্রে উৎসধারা কল্লোলক্রন্দনে
উচ্ছ্বসিবে দীর্ঘদিন ছলছলছল—
মধ্যাহ্নেরে করি দিবে বেদনাবিহ্বল
করুণাকাতর।

লক্ষণীয় এই যে, বর্ণ, ধ্বনি, স্পর্শ প্রভৃতি ভাষায় ও শব্দে পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত না ক'রে অনুপ্রাস-প্রয়োগে কবি আভাসিত করেছেন। আমাদের মনে হয়, অনুপ্রাস বা ব্যঞ্জনধ্বনির এমনকি স্বরধ্বনিরও অর্থবহ প্রয়োগ যে বাঙ্‌লায় সম্ভব, রবীন্দ্রনাথ তার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখিয়ে গেছেন। এবিষয়ে আজও সাম্প্রতিক কবিবন্ধুগণ রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তী হচ্ছেন মাত্র। 'আবেদন' কবিতায় নারীরূপের অর্থাৎ আলম্বন বিভাবের বর্ণনা যে নেই এমন নয়, তবু উদ্দীপন বা নিসর্গের রমণীয়তার সমকক্ষভাবে তা গঠিত হয় নি।

আর তার প্রয়োজনও বোধ হয় ছিল না, কারণ নিসর্গ-বর্ণনেই রানীর রূপের অপার্থিব মহিমা অনুমিত হয়েছে। তবু এবিষয়েও কবির দৈন্য নেই এবং বেণীবন্ধনাদির মধ্যে রানীর রূপবর্ণনা যেটুকু অবলম্বিত হয়েছে তা নিসর্গের সঙ্গে একান্ত সংগতি রেখে অতিরিক্ততা সহকারে সম্ভোগ-শৃঙ্গারের চমৎকারিতা প্রস্ফুট করেছে—

যেথায় নিভৃতকক্ষে ঘন কেশপাশ
তিমিরনির্ঝরসম উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস
তরঙ্গকুটিল এলাইয়া পৃষ্ঠ'পরে
কনকমুকুর অঙ্কে, শুভ্রপদ্মকরে
বিনাইবে বেণী। কুমুদসরসীকূলে
বসিবে যখন সপ্তপর্ণতরুমূলে
মালতী-দোলায়—পত্রচ্ছেদ-অবকাশে
পড়িবে ললাটে চক্ষে বক্ষে বেশবাসে
কৌতূহলী চন্দ্রমার সহস্র চুম্বন।
আনন্দিত তনুখানি করিয়া বেষ্টন
উঠিবে বনের গন্ধ বাসনা-বিভোল
নিশ্বাসের প্রায়, মৃদু ছন্দে দিব দোল
মৃদুমন্দ সমীরের মতো।

পুনশ্চ, আমাদের উপলব্ধি এই যে এখানকার অর্থচিত্রের অনেকাংশ রবীন্দ্রনাথ শব্দালংকারেই নির্বাহ করেছেন, তাও আবার গন্ধের মিত্র অক্ষর-মাত্রিক ছন্দে, এই তাঁর তৎসম-শব্দসহ বাঙ্‌লার উপর অধিকারের নিদর্শন।

কবির পার্থিব স্নেহপ্রণয়ের প্রতি নিতান্ত অনুরাগ এখানে যে ক'টি কবিতার মধ্যে ভাষারূপ লাভ করেছে **'স্বর্গ হইতে বিদায়'** তার অন্যতম। এই কবিতাটিতে বিষয়-সংস্থাপনের মধ্যেই বক্রতার সমাবেশ করা হয়েছে। এইভাবে পৃথিবী যে স্বর্গের থেকে অধিক আকাঙ্ক্ষিত তা অতি অনায়াসে অথচ সুচারুরূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। লৌকিক স্বর্গবাসের আকাঙ্ক্ষার বিপরীত কথা শোনান হয়েছে ব'লেও বেশ অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের সঞ্চার ঘটেছে। স্বর্গ থেকে পৃথিবীর পার্থক্যের মূলে কবি দুঃখবেদনাকে স্থাপন করেছেন। স্বর্গে দুঃখ নেই ব'লে স্নেহপ্রেমের মাধুর্যও নেই।

স্বর্গভ্রষ্টের মনোভাব দেবদেবীদের লক্ষ্য ক'রে ব্যক্ত হয়েছে ব'লে

কবিতাটিকে নির্মাণরীতির দিক থেকে 'Dramatic monologue' বলা যেতে পারে। সমস্ত কবিতাটি ঘিরে রয়েছে স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যজীবনের বৈপরীত্য, কখনও ইঙ্গিতে আভাসিত, কখনও স্ফুটভাবেই প্রকাশিত। পার্থিব প্রীতি-সম্পর্কের চরমতা, শত উচ্ছ্বাসময় বর্ণনাতে যা কাব্য-সমাধান লাভ করত না, স্বর্গের সঙ্গে বৈপরীত্যেই তাকে পাঠকের হৃদ্‌গত করানো হয়েছে। এই মৌলিক বক্রভঙ্গিই এই কবিতায় কবির প্রধানতম কৌশল। অন্যান্য কৌশল দেখা যাক। প্রারম্ভে স্বর্গের বস্তু ও দেবতাদের জীবনবৈচিত্র্য সম্বন্ধে আমাদের কাল্পনিক লৌকিক ধারণাগুলিকে কবি কাজে লাগিয়েছেন। মন্দারপুষ্প, ললাটের জ্যোতির্ময়তা, শোকদুঃখের অভাব, চক্ষুর নিষ্পলকতা, নন্দন, মন্দাকিনী, অপ্সর, ইন্দ্র-শচী, অমৃত—এই সব স্বর্গের বৈশিষ্ট্য, যার জন্যে আমরা অনেকেই কাতর, সেগুলিকে বর্ণনার মধ্যে ব্যবহার কবা হয়েছে এবং সেগুলির তুচ্ছতা প্রদর্শন কবা হয়েছে। বক্তব্যের অন্তরালে নাটকীয়তার আভাস রয়েছে এবং একটি বিশেষ মুহূর্তে যে বক্তা আপন অন্তর উদ্‌ঘাটিত করছেন এই ভাবটি কবিতাটিকে এক ভিন্ন ধরনেব চমৎকারিতা দিয়েছে। কবিতাটির ভাব-প্রকর্ষ যদ্যপি শেষাংশে 'যখনি ফিবিব পুন তব নিকেতনে' ইত্যাদি উপসংহার-পঙ্‌ক্তিগুলিতে, এবং এই পঙ্‌ক্তিগুলির নির্মাণ-সৌন্দযও যদ্যপি উৎকৃষ্ট, তবু শৃঙ্গাররসঘন 'ধরাতলে দীনতম ঘরে যদি জন্মে প্রেয়সী আমার' প্রভৃতি ভাবচিত্রগুলিই কবিতাটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু। রবীন্দ্রের সমগ্র নির্মাণেও দাম্পত্য প্রেমচ্ছবির এই সংক্ষিপ্ত অপূব প্রকাশ আর কোথাও নাই। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, (১) লৌকিক বাঙ্‌লা বাগ্‌ভঙ্গির উপরই কবি বক্তব্যের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ রক্ষা করেছেন এবং প্রসাদগুণে সমস্ত অংশটি দীপ্ত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। (২) চরণমধ্যে ছেদের সন্নিবেশ এমনভাবে করা হয়েছে যাতে যতিপাত বিঘ্নিত না হয়, যতি ও ছেদের মধ্যে কলহ উপস্থিত না হয়; সুতরাং শ্রুতির অনায়াস-সুখকরতা এতে রক্ষিত হয়েছে। (৩) স্থানে স্থানে অনুপ্রাসের মাধুয, এমনকি স্বরধ্বনিরও ভাবানুযায়ী দীর্ঘ গ্রন্থন সৌন্দয-বর্ধনের কারণ হয়েছে। যেমন 'সীমন্ত সীমায় মঙ্গলসিন্দূরবিন্দু' এবং অন্যস্থানেও—'ধরণীর সুদীর্ঘ নিশ্বাস' 'ধরিত্রীর অন্তহীন জন্মমৃত্যুস্রোতে' 'অলস-কল্পনা-প্রায় কোথায় মিলালো'। আবৃত্তির সময় এরকম দীর্ঘস্বরযুক্ত স্থান টেনে পড়লেই সৌন্দর্য রক্ষিত হয়। শব্দে এবং অর্থে দ্রুত বৈপরীত্য সংঘটন ক'রে কবি স্বর্গ থেকে পৃথিবীর আকর্ষণীয়তা পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন,

যেমন, 'মর্তভূমি স্বর্গ নহে, সে যে মাতৃভূমি' 'স্বর্গে তব বহুক অমৃত, মর্তে থাক দুঃখে সুখে অনন্তমিশ্রিত প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি'। কয়েকটি বিশেষণের সুপ্রযুক্ততা এবং চিত্রনির্বাচনও লক্ষণীয়—'অয়ি দীনহীনা, অশ্রু-আঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা, অয়ি মর্তভূমি' এবং 'সিন্ধুতীরে সুদীর্ঘ বালুকাতট, নীল গিরিশিরে শুভ্র হিমরেখা, তরুশ্রেণীর মাঝারে নিঃশব্দ অরুণোদয়' ইত্যাদি। এইভাবে ভাষাভঙ্গিতে রমণীয়তা এবং সার্থকতা রক্ষিত হলেও নিতান্ত অবহেলার যোগ্য কয়েকটি ত্রুটিও শব্দকে অধিকার ক'রে রয়েছে। যেমন, 'ধরা হতে মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসি আসিত বায়ুস্রোতে ধরণীর সুদীর্ঘ নিশ্বাস'—এখানে 'ধরা' এবং 'ধরণীর' একই শব্দ, একটির প্রয়োগ নিরর্থক। একটি দৃষ্টান্তে শব্দের মধ্যেই যতির স্থান বিহিত হওয়ায় ছন্দোভঙ্গিতে শ্রুতিকটুতা এসেছে। যেমন, 'অশ্রুতে পুরিল, অমনি এ স্বর্গলোক' এই পঙ্‌ক্তিতে 'ম' অক্ষরের পরে।

কবির ভাবগত যে আন্তরিকতা অক্ষরমাত্রিক রীতির কবিতাগুলিকে মাত্রাবৃত্ত থেকে বিশিষ্টতা দিয়েছে তার চরম উদাহরণ **'এবার ফিরাও মোরে'** কবিতায়ই পাওয়া যাবে। এর মধ্যে উন্নত আর্টের লক্ষণ তেমন নেই। শক্তিশালী গদ্যে ভাবপরম্পরাকে প্রবাহিত করার দৃষ্টান্ত আছে মাত্র। অর্থবিচারে—রবীন্দ্রচিত্তের বাস্তব-সংশ্লেষ এতে তীব্র হয়ে উঠেছে ব'লে কবিতাটি সাধারণ্যে বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল—বিশেষতঃ স্বদেশীযুগে। আমরা গ্রন্থান্তরে রবীন্দ্রচিত্তের বিবর্তন নির্ণয় প্রসঙ্গে কবিতাটিকে বাস্তব জীবনবোধে তথা জীবনদেবতাবোধে উত্তরণের 'Crucial instance' বা পথ-নির্দেশক চিহ্নরূপে অভিহিত করেছি। রবীন্দ্রমানসের বাস্তবজীবনাগ্রহ পরবর্তী কালে বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের জড়ত্ব, ভীরুতা এবং অন্যান্য গ্লানি কবিকে উদ্দীপিত ক'রে উৎসাহ, নির্ভয়, দুঃখবরণ, মৃত্যুলঙ্ঘন প্রভৃতি ভাবের মধ্যে নিমগ্ন করেছে এবং প্রায়শঃ রূপক ও সংকেতময় শব্দার্থে ঐ ভাববস্তুর প্রকাশের প্রেরণা দিয়েছে। 'এবার ফিরাও মোরে'র মত স্পষ্ট এবং ঋজু ভাষায় ঐসব কাব্য-নাট্য প্রকাশিত নয় ব'লে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবের কবিই নন, মহাশূন্যে নিরালম্ব আছেন, এরকম ভাবনা সমীচীন নয়।

কবিতাটিতে যুগোচিত ভাব-স্পন্দকে একমাত্র ছন্দোরূপ ছাড়া প্রায় বিনা কৌশলেই অবতীর্ণ করানো হয়েছে। তবু বলা যায়, কোথাও দীপক অলংকারের প্রকাশ, কোথাও ক্রমোৎকর্ষের—কবিতাটির স্থানবিশেষকে

আবেদনের দিক থেকে তীব্র এবং স্থায়ী ক'রে তুলেছে, যেমন—'মূঢ় ম্লান মূক মুখে' 'শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে' 'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু' ইত্যাদি। এছাড়া বাক্য ও শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনাধর্মের বিন্যাসও সূক্ষ্ম চারুতার উদ্ভব ঘটিয়েছে স্থানে স্থানে। যেমন, 'দুলায়োনা সমীরে সমীরে, তরঙ্গে তরঙ্গে আর' 'দিন যায়, সন্ধ্যা হয়ে আসে' 'হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম-অর্ঘ্য-উপহারে' ইত্যাদি। Personification, metonymy, metaphor প্রভৃতিও ভাষাব প্রকাশ-সৌকর্য সাধন ক'রে পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করেছে, যেমন, 'মৃত্যুর গর্জন' 'দহিয়াছে অগ্নি তারে, বিদ্ধ করিয়াছে শূল' 'জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন' ইত্যাদি। 'ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি আঁকে নাই কলঙ্কতিলক' প্রভৃতির পল্লবিত ভাষণ কবিতাটির অন্তর্নিহিত গদ্যভঙ্গিকে রমণীয় ক'রে তুলেছে। মোটের উপর কবিতাটিতে অর্থের কল্পিত অলংকার নয়, গদ্য-ভাষার সাধাবণ অলংকারের যোজনা এক শক্তিশালী ভাবপ্রকাশ-সামর্থ্যের স্বাক্ষর রেখেছে। বলা বাহুল্য, ভাব-প্রাবল্যের ফলে এবং আবেগ-উচ্ছ্বাস বন্ধনহীন হওয়ায় কবিতাটিতে বাগ্‌বাহুল্য ঘটেছে প্রায় প্রতি পঙ্‌ক্তিতে এবং কবি 'জানি না কে। চিনি নাই তারে।' ইত্যাদি থেকে আরম্ভ ক'রে উপসংহার পর্যন্ত আদর্শবোধেব প্রেরণায় জীবনের আশা ও সাফল্যের যে-চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে কবিতাটির সংহতি বিপযস্ত হয়েছে। সৌন্দয ও প্রেমের এই নারীমূর্তি কবির ঐন্দ্রিয়ক রূপানুভব থেকে স্ফুরিত হয় নি, আদর্শবোধ থেকে গঠিত হয়েছে। সেইজন্য আদর্শ-অনুরাগের বিষয়রূপে এই নারীমূর্তির ধারণা ক'রে কবি যখন বর্ণনা করেন—'তাহারি মহান গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে, তাহারি অঞ্চলপ্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে'—তখন পাঠকের স্বাভাবিক ভাবেই খটকা লাগে। নিসর্গের বর্ণগন্ধস্পর্শের মধ্যে কবি যাকে অনুভব ক'রে বিহ্বল হচ্ছেন, এবং যার সঙ্গে বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের একটা যোগও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এ তো সে নয়। অথচ নিসর্গের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট সৌন্দর্যময়ীর বেশেও তাকে এখানে দেখা হচ্ছে। এক পক্ষে বাস্তব জীবনের আদর্শবোধগত সৌন্দর্য, অন্যদিকে বাস্তবের রূপানুভূতির সৌন্দর্য, এ দু'য়ের সমীকরণ কি সম্ভব? এই বিরোধের সমাধান এখানে, যে, বর্তমান ক্ষেত্রে, প্রবল জীবনগত আদর্শ-চেতনায় বিশ্ববিজয়িনী সৌন্দর্যমূর্তি—যা জীবনের চরম প্রাপ্তিরই একটা আদর্শরূপ—তাকে প্রবল আবেগে অতিশয়িত ক'রে কবি দেখেছেন। এরই ফলে 'Intellectual' সৌন্দর্য Sensuous সৌন্দর্যের

ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করেছে। Shelley-বিরচিত আদর্শবোধগত সৌন্দর্যেও এই রকম ব্যাপকতার ছোঁওয়া লেগেছে। বিষয়ের দিক থেকে 'জীবন-দেবতা'তেও এইভাবে সৌন্দর্য-সংস্পর্শ ঘটেছে।

'জীবনদেবতা' সম্পর্কে লেখা অন্তর্যামী, জীবনদেবতা, সাধনা এবং সিন্ধু-পারে—চারটি কবিতাই ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা। এই সময়ে লেখা 'পুরাতন ভৃত্য' এবং 'দুই বিঘা জমি'ও একই রীতির। অথচ শেষের দুটি যেমন রূপরসময় কাব্য হয়েছে, জীবনদেবতা-শ্রেণীর কবিতা সর্বত্র তেমন নয়। কারণ, জীবনদেবতা-শ্রেণীর কবিতায় কবির ব্যক্তিগত অনুভবের জীবনের ইতিহাস, ব্যক্তিগত স্বপ্ন ও আশা, সার্থকতা ও ব্যর্থতার বিষয় বিবৃত হয়েছে মাত্র। আত্মভাবুক গীতিকবির জীবনজিজ্ঞাসা এগুলির বিষয়রহস্য: এগুলির উৎপত্তি কবির ব্যক্তিগত জীবনের বিকাশ সম্পর্কে বিস্ময় থেকে। ফলে একধরনের বিস্ময়রসমিশ্র কাব্য হ'লেও এগুলি যে-পরিমাণে একটি নিগূঢ় ভাবজীবনের ইতিবৃত্ত হয়েছে সেই পরিমাণে সার্বজনিক আবেদন থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। কবির ব্যক্তিত্বের নির্বাধ প্রকাশ থেকে ভাবের সংযমন এবং সৌন্দর্যে সমুন্নয়নই যে উত্তম কাব্যনীতি এ সম্বন্ধে সন্দেহ কী? সর্বত্র পরিস্ফুট রসভাবনিস্যন্দ এগুলির মধ্যে নেই ব'লেই বোধ হয় পাঠকেরা এর মধ্যে গুরুতর তত্ত্ব খুঁজেছেন এবং ধরে নিয়েছেন যে কবি এখানে ভগবৎ-দর্শী হয়ে চরম তত্ত্বকথা বলেছেন। কিন্তু সর্বত্র না থাকলেও 'জীবনদেবতা'-শ্রেণীর কবিতানিচয়ের মধ্যে স্থানে স্থানে যে উত্তম গীতিভাবুকতা ও প্রকাশশিল্পের পরিচয় আছে সে কথাও স্বীকার্য। এগুলি সেই স্থান যেখানে কবি জীবনদেবতাকে মহিমময়ী নারীর রূপে দেখেছেন এবং প্রণয়ের মিলন-বিরহ ও পূজার ভাব একত্রিত করেছেন। এরকম স্থানে 'মানস-সুন্দরী'তে দৃষ্ট কাতরতার পরিচয়ও দুর্লভ নয়, যেমন—

শতজনমের চিরসফলতা
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা,
আমার বিশ্বরূপী—
মরণনিশায় উষা বিকাশিয়া
শ্রান্তজনের শিয়রে আসিয়া
মধুর অধরে করুণ হাসিয়া
দাঁড়াবে কি চুপি চুপি? (অন্তর্যামী)

ঝটিকাহত দাবদগ্ধ পুরুষ এখানে নারীর কাছে আশ্রয় এবং আশ্বাস চাইছে। ইনি সেই চেনা-অচেনার মধ্যবর্তী বিদেশিনী, যিনি কবিকে বারংবার প্রলুব্ধ ক'রে স'রে গিয়ে ব্যাকুলতা বাড়িয়েই তুলেছেন। এর পরিবেশ রচনায় কবি প্রত্যক্ষ বাস্তব বা নিসর্গলোক থেকে দূরবর্তী নভোলোকের শূন্যতার কল্পনা করেছেন এবং রূপবর্ণনায় অপার্থিব সৌন্দর্যমূর্তির আভাস দিয়েছেন—

অচল আলোকে রয়েছ দাঁড়ায়ে,
কিরণবসন অঙ্গ জড়ায়ে
চরণের তলে পড়িছে গড়ায়ে
ছড়ায়ে বিবিধ ভঙ্গে।
গন্ধ তোমার ঘিরে চারিধার,
উড়িছে আকুল কুন্তলভার
নিখিল গগন কাঁপিছে তোমার
পরশরস-তরঙ্গে।

এই রূপ আমরা 'জ্যোৎস্না-রাত্রে' 'উর্বশী' প্রভৃতি কবিতায় লক্ষ্য করেছি। **'অন্তর্যামী'** কবিতার শেষাংশে কবির 'জীবনদেবতা' সম্পর্কে একটি বেদনাময় ব্যাকুলতার ভাব শৃঙ্গাররসমিশ্রিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট হয়ে এই সব স্থান কবির আত্মজিজ্ঞাসার কঠিন মৃত্তিকার উপর রমণীয় পুষ্প-সমারোহের সৃষ্টি করেছে। অন্তরগত সত্তাকে কবি বিরহবেদনাদাত্রী নিষ্ঠুরা রমণীর বেশে দেখছেন—

তবে তাই হোক। দেবী অহরহ
জনমে জনমে রহ তবে রহ
নিত্যমিলনে নিত্যবিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে।
নব নব রূপে ওগো রূপময়,
লুণ্ঠিয়া লহ আমার হৃদয়,
কাঁদাও আমারে ওগো নির্দয়
চঞ্চল প্রেম দিয়ে।

এই 'অধরা'-কে ধরবার আগ্রহের দিক দিয়ে কবিতাটি একালের

সৌন্দর্য-ব্যাকুলতা এবং 'পূরবী' থেকে পরবর্তী কালের অনুসন্ধান-তৎপরতার সঙ্গে প্রায় একাত্ম হয়ে উঠেছে—

ওগো মায়াবিনী, কত ভুলাবার
মন্ত্র তোমার আছে।
আবার তোমারে ধরিবার তরে
ফিরিয়া মরিব বনে প্রান্তরে,

রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে বিরহ-ব্যাকুলতার কবিতাগুলির এই এক সুর।

আমরা পূর্ব পূর্ব আলোচনায় জীবনদেবতার আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার মধ্যে একটি পূর্ণতাবোধের উৎস লক্ষ্য করেছি। এবং এর সঙ্গে কবির নারীরূপাশ্রিত সৌন্দর্য-অনুভবেরও যে পূর্ণতা তা-ও লক্ষ্য করেছি। এই রূপাগ্রহ প্রবল হয়ে 'অন্তর্যামী' কবিতার শেষাংশে আত্মদিদৃক্ষাকে সমাচ্ছন্ন করেছে। কিন্তু একথা বলা সংগত হবে না যে নিরুদ্দেশ-যাত্রা-সঙ্গিনী অশরীরী রহস্যময়ীই কবির সমগ্র জীবনের অধিদেবতা। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার শেষেও একধরনের সৌন্দর্য-প্রতিমার কল্পনা রয়েছে তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। ফলতঃ সামগ্রিকভাবে 'জীবনদেবতা' বোধের মূলে কবির বাস্তব অনুরাগ ও বিরহ-সম্পর্কের প্রেরণা কাজ করেছে এমন কথা ভেবে নেওয়াও ঠিক হবে না। যাই হোক, এই আত্মজীবন-জিজ্ঞাসার কবিতাটি যে শুধু বিবৃতি এবং তত্ত্বমাত্রেই পর্যবসিত হয় নি, একেবারে প্রথম শ্রেণীর না হলেও রসাত্মক কাব্য হয়েছে, তার জন্য কবির এই সৌন্দর্য-বিরহ-সংযোগই দায়ী। মনে রাখতে হবে যে আমাদের সাধারণ বৌদ্ধিক বিচারের যুক্তি এবং কবির কল্পনার যুক্তি সমরেখায় অগ্রসর হয় না। সেই কল্পনার কোন্ বক্রভঙ্গিতে স্মৃতি-বিস্মৃতির বৈচিত্র্য কিরূপ সৌন্দর্যরসাবেশের স্ফুরণ ঘটাচ্ছে তা ধরতে হবে এ কল্পনার সহচর হয়ে। **'জীবনদেবতা'** নামীয় কবিতায় উক্ত সম্পর্কেরই উত্তম অনুবৃত্তি। তাই এরও কাব্যিক আবেদন ক্ষীণ জীবনেতিহাসকে বহুদূর পিছনে ফেলে রেখেছে। এর অনুপ্রাসময় ছন্দোভঙ্গির নিঃশেষ মাধুর্য এবং অনধিক ও অনল্প ভাববিন্যাস, উচ্ছ্বাসের সংযম এবং সংকেত-চাতুর্য রবীন্দ্র-রচিত প্রথম শ্রেণীর কবিতাবলীর মধ্যে একে স্থান দিয়েছে। আমরা বলি, এই কবিতাটির পিছনে যে তত্ত্বই থাকুক্ না কেন (খুব গুরুতর কোন তত্ত্ব নয়ও, শুধু আত্ম-প্রীতির ব্যাপার) সেদিক থেকে না দেখলে, কেবল প্রীতিরসবিলাস হিসেবে দেখলেই আমাদের

লাভবান হওয়ার কথা। এর সাতান্নটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে কোথাও বর্ণগত রসবিরোধ নেই, কোথাও বাক্যের বন্ধনের আড়ষ্টতা ও কৃত্রিমতা নেই। একটি অপ্রগল্‌ভ সুর ও সংগীতধ্বনি আদ্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। এই প্রণয়-বিলাসে বৈষ্ণব ভাব ও ভাষার মণ্ডন কাব্যগত ঐতিহ্যের নিয়মে স্বাভাবিক-ভাবেই যুক্ত হয়ে প'ড়ে পাঠকের পরিচিত এবং দূরশ্রুত একটি গীতিরসের রাজ্যে কবিতাটিকে সমুত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছে। 'অন্তর্যামী' কবিতার আবেগ-উচ্ছ্বাস এবং এর ভাব-সংযমন সহজেই তুলনার যোগ্য।

এই শ্রেণীর শেষ কবিতা **'সিন্ধুপারে'** 'জীবনদেবতা'র শেষ চরণ—'নূতন বিবাহে বাঁধিবে আবার নবীন জীবনডোরে'-এর ভাবের অনুবৃত্তিক্রমে রচিত। কিন্তু যে নিশাহ্বান-স্বপ্নের চিত্রপরম্পরা এর পরিবেশ রচনা করেছে তার অতিপ্রাকৃত রসমূল্য উচ্চশ্রেণীর হয়েছে, একথা মনে করা যায় না। এগুলি অবিন্যস্ত এবং স্থানে স্থানে কৃত্রিম হয়েছে এমনও মনে করা যেতে পারে। আমরা পূর্ব আলোচনায় নির্দেশ করেছি যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এরকম একটি স্বপ্নদর্শন কবিতাটির ভিত্তি ব'লে গৃহীত হতে পারে।

মাত্রাবৃত্তে গ্রথিত একালের কবিতারাজির মধ্যে কাব্যরসে সমুত্তীর্ণ একটি সহজ নিসর্গপ্রীতিরসের কবিতা হ'ল **'দিনশেষে'**। সন্ধ্যার শ্রান্তি এবং বৈরাগ্য এর ছন্দ, শব্দ এবং বাক্যকে ঘিরে যথার্থ 'পুরবী'র কোমল কারুণ্যকে উচ্ছলিত করেছে। এর পঙ্‌ক্তিশেষে কোথাও কোথাও 'assonance' ঘটলেও তা সকরুণ মাধুর্যকে পীড়িত করে নি, 'কাননে'-'কাঁকনে' 'উদাসে'-'প্রবাসে'—

> নামিছে নীরব ছায়া ঘনবনশয়নে,
> এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে।
> স্থির জলে নাহি সাড়া,
> পাতাগুলি গতিহারা,
> পাখিগুলি ঘুমে সারা কাননে··· ইত্যাদি।

এরই বিপরীতধর্মী প্রবাহিত ভাব-ছন্দের কবিতা হ'ল **'১৪০০ সাল'**—একটি অত্যন্ত সংযত সুন্দর ভাবাপ্রকাশ। বসন্তের পটভূমিতে কবিতাটির ভাবার্থের কবিচিত্তে সঞ্চার। কবির বক্তব্য—একালের সঙ্গে সেকালের ভাবসম্পর্ক রচনা —বিষয় হিসেবে খুব চমকপ্রদ না হলেও বসন্তের প্রেম, সৌন্দর্য, আনন্দ এবং গানের সঙ্গে বিষয়টিকে সংযুক্ত করাতেই এই চারুতা ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয়

স্তবকে পৃথিবীর মানচিত্রের উপর বসন্তের আধিপত্যের যে পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তা-ই হ'ল সমস্ত কবিতাটির ভাবসৌন্দর্যের বীজ—

নবীন ফাল্গুনদিন সকল বন্ধনহীন
উন্মত্ত অধীর—
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণুগন্ধমাখা
দক্ষিণ সমীর—
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা
যৌবনের রাগে

লক্ষণীয় এই যে, বিশেষভাবে দ্বিতীয় স্তবকের দীর্ঘপঙ্‌ক্তিগুলি মধ্যানুপ্রাস যুক্ত হয়ে সৌন্দর্যের সুকুমারতা বর্ধন করেছে। 'উড়ায়ে চঞ্চল পাখা' ইত্যাদির personification প্রাচীন কবিদের বহুবর্ণিত বসন্তসৌন্দর্যের মধ্যে আমাদের বিচরণ করিয়েছে এবং স্মৃতিসমৃদ্ধ হয়ে রসের প্রগাঢ়তা নিয়ে এসেছে।

একালের মধ্যে দুই ছন্দোরীতির রচনার প্রৌঢ়তা চিত্রার কবিতাগুলিতে। উত্তম বিচিত্রভাবের কবিতার সংখ্যাও 'চিত্রা' কাব্যেই সবচেয়ে বেশি। বয়ঃক্রম হিসেবে কবি এখন উত্তর-তিরিশ, অনাগত-চল্লিশ। কল্পনা এবং প্রকাশের একটা প্রৌঢ়রূপ আমরা একালেই পাচ্ছি। কিন্তু ভাষাভঙ্গির কাব্যোপযোগী সূক্ষ্ম সহজ চারুতানিষ্পত্তির জন্য কবির কিঞ্চিৎ অনুশীলন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন ছিল। অতঃপর সে-অধ্যায় আলোচিত হচ্ছে।

সংস্কৃতরীতির অনুশীলন
এবং
কাব্যসৌন্দর্যে নূতন গুণ ও ধর্মের প্রসার

বিষয়টি আমাদের পূর্বেকার একাধিক আলোচনায় বিবেচিত হয়েছে। এখানে সৌন্দর্যস্বরূপ অবধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক কথা মাত্র সন্নিবেশিত হচ্ছে। চিত্রা এবং চৈতালি কাব্যরচনার পূর্ব থেকেই কবির মনে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রেম, যৌবন এবং বসন্তের মাদকতাময় সৌন্দর্যচিত্র প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'চৈতালি' কাব্যে প্রাচীন সাহিত্য ও নিসর্গ ও জীবনের প্রতি অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ঠিক এরই পরে সংস্কৃত ভাষা-ভঙ্গির রমণীয়তাকে কবি বাঙ্‌লার মধ্যে সঞ্চারিত করার জন্য উদ্‌যোগী হলেন এবং ক্রমে যে আশ্চর্যরূপে সফল হয়ে উঠলেন তা বলাই বাহুল্য। 'কল্পনা'র কয়েকটি কবিতা সংস্কৃতের ভাব, চিত্র এবং ধ্বনিভঙ্গিমার অনুসরণে নব কাব্যনির্মাণের আগ্রহ প্রকাশ করছে। এর ধ্বনিগুণের পরীক্ষণমূলক কিছু কবিতা রচনার পর 'কথা' এবং 'ক্ষণিকা'র কবিতা লেখা হয়। 'কল্পনা'র প্রাথমিক কবিতাগুলিতে ধ্বনি সন্নিবেশের পরীক্ষা-নিরীক্ষার চিহ্ন স্পষ্ট। প্রথম কবিতা **'দুঃসময়'** বাহ্য শ্রুতিসুখকরতাকে অবলম্বন ক'রে গঠিত। এর অর্থগত শোক-ভাবের বিরোধী হয়ে এর অনুপ্রাস-মাধুর্য প্রকাশ পাচ্ছে। এর প্রারম্ভিক অনেকগুলি পঙ্‌ক্তিতে নাসিক্যধ্বনির একটি ক'রে অনুপ্রাস প্রতি পর্বে যোজিত হয়েছে, যেমন,—

যদিও সন্ধ্যা ॥ আসিছে মন্দ ॥ মন্থরে
সব সংগীত ॥ গেছে ইঙ্গিতে ॥ থামিয়া,
যদিও সঙ্গী ॥ নাহি অনন্ত ॥ অম্বরে

—ইত্যাদি প্রথম স্তবক। এবং 'এ নহে কুঞ্জ ॥ কুন্দকুসুম ॥ রঞ্জিত' প্রভৃতিও। এছাড়া সমধ্বনির অনুপ্রাসও অন্যস্থানে কৃত্রিমতার স্পর্শ রেখেছে— 'ফেনহিল্লোল ॥ কলকল্লোলে' 'বিশ্বজগৎ ॥ নিশ্বাসবায়ু' প্রভৃতি। ফলতঃ কবিতাটির শব্দবিন্যাস শ্রুতিমধুর হলেও, স্বাভাবিক হয় নি। এছাড়া এমনও বলা যায় যে শ্রুতিমাধুর্য সর্বত্র সমভাবে রক্ষিত হয় নি। মাত্র দুচারটি পঙ্‌ক্তি কৃত্রিম ধ্বনিবিন্যাসযুক্ত হ'য়েও কেমন ক'রে অব্যাহতি পেয়ে গেছে, এমন কথা বলা যেতে পারে। যেমন, 'এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে' 'বিশ্বজগৎ নিশ্বাসবায়ু সম্বরি' 'উষা-দিশা-হারা নিবিড়-তিমির-আঁকা'।

কবিতাটি যে শুধু শব্দমন্ত্র ঘোষণা করবার জন্য রচিত হয়েছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এর আদ্যন্ত অর্থগত অসংগতি এবং বাক্যবিশেষের নিরর্থকতা প্রভৃতি দোষ। প্রথম গোটা কবিতা ধরা যাক। এর নিসর্গ-পরিবেশ বর্ণনে স্পষ্টতই হতাশা, ব্যর্থতা, নির্বেদ, শঙ্কা প্রভৃতির ভাব ফুটে উঠেছে। 'এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা' ইত্যাদি কাতরোক্তি ব'লে প্রতিভাত হ'লেও পরিণামে 'ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহমোহ বন্ধন' প্রভৃতির মধ্যে উৎসাহের ভাব স্পষ্ট, যদিও ছন্দের ও ভাষার সংকেত দৈন্যের মনোভাবের। যদি হতাশা এবং দৈন্যের সংকেতই কবিতাটির মর্মোক্তি হয় তাহ'লে শব্দের ঝংকারে তা শোচনীয় ভাবে আহত হয়েছে বলে মনে করতেই হবে। কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে নিরর্থক অথবা অস্পষ্টার্থক বাক্যগ্রন্থনের চিহ্ন দেখা যায়, যেমন, 'সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা' এবং 'বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি' প্রভৃতি। 'এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত'-এর মধ্যে কুন্দফুলের চিত্র কেন, বিশেষতঃ কুন্দ যখন অনাড়ম্বর শুভ্র? স্পষ্টতই কবি এখানে অনুপ্রাসের মোহগ্রস্ত। এ কবিতাটির সমসূত্রে রচনা **'অসময়'**-এর ভাষাভঙ্গি অধিকতর আড়ষ্ট এবং কৃত্রিম, ভাবার্থ আরও অস্পষ্ট এবং অনর্থবহ, যেমন—

এত দিনে সেথা বনবনান্ত নন্দিয়া
নব বসন্তে এসেছে নবীন ভূপতি।
তরুণ আশার সোনার প্রতিমা বন্দিয়া
নব আনন্দে ফিরিছে যুবক যুবতী।
বীণার তন্ত্রী আকুল ছন্দে ক্রন্দিয়া —ইত্যাদি।

'অসময়'-এর মত এত দুর্বল রচনা কবির পরিপক্ক লেখনীতে নির্গত হয় নাই বললেই চলে। আসল কথা, এই সময় কবি সংস্কৃত শব্দের ধ্বনিগুণের বাঙ্‌লায় পরীক্ষা করছিলেন। এমন কি বিক্ষিপ্ত সংস্কৃত কবিতার ভাবের রেশ অনুসরণে কাল্পনিক ভাববিলাসের কবিতাও লিখছিলেন। এইজন্য কয়েকটি কবিতায় ধ্বন্যাতিরেক অথচ ভাবদৈন্য প্রকাশ পেয়েছে।

এই শ্রেণীর সজ্ঞান শিল্পচেতনার উল্লেখযোগ্য কবিতা হ'ল **'বর্ষামঙ্গল'**। এ কবিতাটিকেও অনুপ্রাসের আতিশয্যের দৃষ্টান্ত এবং কৃত্রিম বলা চলত, যদি না এর অর্থগত চিত্রের সমাহরণগুলি এত সুন্দর হ'ত। এই সূত্রেই এর অনুপ্রাস সীমাতিরেকী হয় নি এবং নিসর্গবর্ণনে কবির আন্তরিক নিষ্ঠা

অবিসংবাদিত ব'লে কবিকৌশল বহুল পরিমাণে কল্পনার অনুগামী হয়েই প্রকাশ পেয়েছে। তবু অর্থগত অসংগতি আছে, ধ্বনিসমৃদ্ধ চারুতাময় আবৃত্তিযোগ্যতার জন্য তা ধরা পড়ে না। মনে রাখতে হবে যে 'দুঃসময়' অথবা পূর্বেকার অন্যান্য ধ্বনিগুণসম্পন্ন কবিতার মত এটিও ছ'মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে নির্মিত। কিন্তু এতে মাত্রাতিরিক্ত ধ্বনি ব্যবহারের প্রয়াস অনেক পরিমাণে সংযত হয়েছে এবং আহরণ-কৌশল চিত্রকল্পনাকে অতিক্রম করতে পারে নি। এই কবিতার প্রথমের দিকের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি মাত্র ছন্দের দীর্ঘাক্ষরবিন্যাস-সমতা রক্ষার জন্য পরিবর্তিত করা হয়েছে, কিন্তু সেই নবীকরণ কাব্যাংশে অত্যন্ত দুর্বল হয়েছে। পুরানো পাঠ ধরে দেখা যায়, বর্ষায় মানুষ ও প্রকৃতির উল্লাসের কতকগুলি চিত্রই এর কাব্যসৌন্দর্যের ভিত্তি। আর এই চিত্রসম্পদ সংস্কৃত কাব্য থেকে সমাহৃত। সৌন্দর্যের ও প্রেমভাবুকতার আধার প্রাচীন কাব্যগুলি আধুনিক কবিচিত্তকে কী গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল এই শ্রেণীর কবিতা তার প্রমাণ। পূর্বেকার বাঙ্‌লা কাব্যে বর্ষাবর্ণন অপ্রচুর না হ'লেও তার কোনও স্মৃতিলোক এখানে কাজ করে নি। ঋতুসংহার, মেঘদূত, ঘটকর্পরের যমক-কাব্য, গীতগোবিন্দ এবং দুচারটি প্রকীর্ণ কবিতা কবির চিত্তে যে বর্ষার ভাবরাজ্য গঠন ক'রেছিল, তারই কিয়দংশ এখানে ছন্দোবদ্ধ হয়েছে। আর এই নবীনতার আস্বাদ দিতে পেরেছে ব'লেই কবিতাটি বিদগ্ধ পাঠকের চিত্তে আকর্ষণীয় হয়েছে। যে প্রাচীনের প্রতি রোম্যান্টিক্ আকর্ষণ আমাদের চিত্তে স্বাভাবিক, তাকে অবলম্বন করাতে আমাদের চিত্ত সহজেই সেই বহুকাল-বিচ্যুত অথচ অভিপ্রেত সৌন্দর্য ও প্রণয়রাজ্যের প্রতি আগ্রহশীল হয়। কবিতাটি নিসর্গের হ'লেও শৃঙ্গাররসময় বিরহ এবং মিলনাশ্বাসের উদ্দীপনই এর মুখ্য বিষয়। তাই প্রথম ও শেষ স্তবকের কেবল নিসর্গবর্ণনের মধ্যবর্তী স্তবকগুলি নিসর্গাশ্রিত শৃঙ্গারের। দ্বিতীয় স্তবক থেকে বিরহিণী পথিকবধূ, সুনীলবসনা অভিসারিকা, নবোঢ়া বধূ, বিপ্রলব্ধা পুরনারী প্রভৃতির ভাববৈচিত্র্য এবং বেশসজ্জার মোহময় বর্ণনা। বিষয়-সংস্পর্শে জীর্ণ লৌকিকতাময় আমাদের মত পাঠকের কাছে এক অপার্থিব কল্পলোকের স্পর্শ।

কবিতাটির মধ্যে নিসর্গ এবং প্রণয়-বাসনা মিশ্রিত হয়ে একটি অভীপ্সিত কল্পরাজ্য গঠিত হয়েছে ঠিকই এবং সংস্কৃত কাব্যের রসিক এ থেকে সমধিক আনন্দ সংগ্রহ করতে পারবেন এও সত্য, কিন্তু কবিতাটি যে পরিমাণে

সমাহরণ-সিদ্ধ হয়েছে সেই পরিমাণে অখণ্ড মহৎ প্রকাশও হয় নি। ক্ষণিকার নববর্ষা, অবিনয়, এমনকি পূর্বেকার সেই 'এমন দিনে তারে' সৃষ্টি হিসাবে এর থেকে নৈষ্ঠিক রচনা। 'বর্ষামঙ্গল'-এ কবির নৈষ্ঠিকতা বাস্তব-অনুভব-ভিত্তিক তেমন নয়, যেমন প্রাচীনের সাহিত্যতীর্থ পর্যটন থেকে সমুৎপন্ন। কবি প্রাচীনের সৌন্দর্যরাজ্যে প্রবেশ ক'রে এমনই আত্মহারা হয়েছেন যে উপস্থাপিত বিভিন্ন চিত্রগুলির মধ্যেকার অর্থসংগতি স্থানে স্থানে বিঘ্নিত হলেও উপেক্ষা করেছেন। ভাষার শব্দচিত্র কবির এই ঔদাসীন্যে সহায়তা করেছে। যেমন বলা যায়, দ্বিতীয় স্তবকের পথিকবধূ অর্থাৎ প্রোষিতভর্তৃকা অতএব বিরহিণীর নৃত্যচ্ছন্দে বর্ষার উৎসবে যোগ দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। অভিসারিকা যদ্যপি সন্ধ্যাগমে নীলবাস ধারণ করবেন, তিনি নিশ্চয়ই অলংকার-শিঞ্জিতের দ্বারা অভিসারে বাধার সৃষ্টি করবেন না। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিই এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাক—'মন্দং নিধেহি চরণং পরিধেহি নীলং বাসঃ পিধেহি বলয়াবলিমঞ্চলেন'। যদি বলা যায়, অভিসারিকাদের অভিসারের প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হচ্ছে না, প্রথম বর্ষার আবির্ভাবে প্রিয়মিলনের আশ্বাসজনিত আনন্দবোধ থেকে তাঁদের নৃত্যোৎসবে যোগ দেওয়ার বাধা কোথায়, তাহ'লে হয়তো বা সংগতি রক্ষিত হতে পারে কথঞ্চিৎ। চতুর্থ স্তবকের কেতকীকেশর এবং করবী এবং কদম্বরেণু ও কজ্জলের প্রসাধনচিত্র নিঃশেষ সুন্দর এবং একটি আনন্দ-উজ্জ্বল মিলনরজনীর ব্যঞ্জনাও এর নিহিত তাৎপর্য, কিন্তু 'করতলতাল-তরল-বলয়াবলী'-কলিত ভবনশিখীর নৃত্য শুধু প্রাচীনচিত্রমোহের ফলেই এতে সংযুক্ত হয়েছে ব'লে মনে হয়। ষষ্ঠ স্তবকের যূথীপরিমলবাহী সজল সমীর এবং ঘনায়িত সন্ধ্যায় দাদুরীর মিলনোল্লাস একদিকে যেমন স্বাভাবিক পল্লী-নিসর্গসৌন্দর্য সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে তেমনি অভিসারাদির উদ্দীপনও ঘটাচ্ছে, কিন্তু যে দোলারোহণের চিত্র এতে গ্রথিত হয়েছে তা বসন্তরজনীর ব'লে ভ্রম হওয়াই স্বাভাবিক। অপরপক্ষে, 'নববর্ষা'র মধ্যেকার অনায়াস-উদ্ভূত ঝুলনের কল্পচিত্র ভাবসংগতি বিক্ষুব্ধ করে নি।

কিন্তু 'বর্ষামঙ্গল' কোমল ও মধুর বঙ্গবাণীর সংস্কৃতস্পর্শজাত সমধিক রমণীয়তার উত্তম নিদর্শন এবং কলাবিলাসী রবীন্দ্রনাথের বাক্‌সৌন্দর্য, এবং চিত্রবিন্যাসের একত্র সমুচ্চ প্রকাশ। বস্তুতঃ ভাষাভঙ্গির ঐশ্বর্যময় রমণীয়তা কবিতাটির চিত্রসংযোজন-বিষয়ক কৃত্রিমতাকে অনায়াসে লঙ্ঘন করেছে এবং সাধারণ পাঠে আমাদের প্রিয় কবিতা হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই।

কাছাকাছি সময়ে লেখা 'ক্ষণিকা' কাব্যে বেশ কয়েকটি বর্ষার কবিতা রয়েছে। এদের দু'একটির কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এগুলিতে 'কেতকী-কেশরে কেশপাশ' প্রভৃতির মত যমক-অনুপ্রাসের সংযোগ নেই, মধ্যানুপ্রাস এবং অন্ত্যানুপ্রাস যা আছে তা কাব্যের গীতময়তার সঙ্গে একাত্মভাবেই বিলসিত হয়েছে। লক্ষণীয় এই যে 'বর্ষামঙ্গল' এ ষণ্মাত্রিক যতি কোথাও কোথাও শব্দমধ্যেও বিন্যস্ত হয়েছে (কোথা প্রিয় পরি ॥ চারিকা, কোথা তোরা অভি ॥ সারিকা) কিন্তু ক্ষণিকায় তা কুত্রাপি নয়। আসলে কল্পনা কাব্যে সংস্কৃতের আদর্শে অনুপ্রাসাদির প্রয়োগের ক্ষেত্রে আড়ষ্টতা যেটুকু এসেছে তা কবি শীঘ্রমধ্যেই কাটিয়ে উঠেছেন এবং ক্ষণিকার ধ্বনিগুণসম্পন্ন কবিতা-গুলির ক্ষেত্রে যতির সুমিত প্রয়োগ এবং অতিরেকহীন অনুপ্রাস-বিন্যাসে এক স্বচ্ছন্দ ও স্থায়ী চারুত্বের প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'কথা' কাব্যের মধ্যে প্রাচীন কথার উপর কবির নিতান্ত অনুরাগ এই অনবদ্য যতিবন্ধন এবং অনধিক অনুপ্রাস-ঝংকারের উপর নির্ভরশীল হয়েছে। এ আমরা একটু পরেই লক্ষ্য করব।

ক্ষণিকার বর্ষার কবিতাগুলি 'বর্ষামঙ্গল'-এর মত ঐশ্বর্যময় নয়, স্বাভাবিক এবং হৃদয়ের কাছে আবেদনের দিক দিয়ে অন্তরতর। **'আষাঢ়ে'** 'নববর্ষা' এবং 'অবিনয়' এই তিনটি মুখ্য বর্ষার কবিতায় পল্লীবাঙ্‌লার পরিচিত চিত্রকেই কবি প্রকাশকৌশলে অপূর্বত্বের সীমায় পৌছে দিয়েছেন। বিশেষ এই যে, **'নববর্ষা'** কবিতায় বাস্তব চিত্রের সঙ্গে কল্পচিত্র গ্রথিত হওয়াতে একটি প্রথম শ্রেণীর উন্নত নিসর্গ কবিতা সৃষ্ট হয়েছে। 'আষাঢ়ে' কবিতার প্রতিটি স্তবকে এক একটি স্বতন্ত্র চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথম স্তবকে পল্লীর মাঠ এবং দিগন্তের চিত্র, দ্বিতীয় স্তবকে বর্ষাপ্রভাবিত কৃষক জীবনের চিত্র, তৃতীয় স্তবকে খেয়াঘাট এবং চতুর্থ স্তবকে ঘাটের পথের বর্ণনা। বর্ষার দুর্যোগের দিনে সহজে কেউ ঘরের বাইরে যেতে চায় না, এই বিষয়টিকে ধুয়ার মত আবৃত্তি ক'রে কবি নিসর্গের মধ্যবর্তী পল্লী-জীবনচিত্রের একটি পূর্ণাঙ্গরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। মাত্রাবৃত্তে নির্মিত হলেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কলাশিল্পের পরিচয় কুত্রাপি নেই। বর্ষার দিনের পথঘাটের নির্জনতা কবির একটি প্রিয় বর্ণনীয় বিষয়, কারণ, কয়েকটি কবিতায়ই এই চিত্র অনুবৃত্ত হয়েছে

'নববর্ষা' কবিতায় পল্লী-নিসর্গের চিত্র-পরিচিতি থাকলেও ('ধেয়ে চলে

আসে বাদলের ধারা, নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা' 'ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে, কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে' ইত্যাদি) কবিচিত্তের কল্পলোক-সৃজন নিছক পল্লীর বাস্তবকে অতিক্রম করেছে এবং একটি মায়াজগৎ সৃজন করেছে। এই মায়ালোকের প্রারম্ভ 'ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে কে দিয়েছে কেশ এলায়ে' ইত্যাদি থেকে। এ নারী যথার্থ মানবী নয়, এবং শৃঙ্গাররসবৈচিত্র্যের কোনও একটির স্পর্শও এখানে বা অন্য স্তবকে নেই। যে দেহের উপর নীলবাস টেনে নিচ্ছে এবং তড়িতালোকে চঞ্চলা হয়ে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করছে, সে নিসর্গেরই বস্তু, এখানে নিসর্গের মানুষী রূপ কবির কল্পনায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে। অনুরূপ ভাবে 'ওগো নদীকূলে তীরতৃণতলে কে বসে অমল বসনে শ্যামল বসনে' প্রভৃতিতে—বর্ষাবেশে দেশ-মল্লারে যে বিরহ, বিষাদ, নির্বেদ প্রভৃতি ভাববৈচিত্র্যের সংঘটন হয়, তারই যেন একটি চিত্র কবি এঁকেছেন। পরের স্তবকে কর্মহীন প্রয়োজনহীন দিবসে একাকী নিজহৃদয়কে অবারিত ক'রে দেওয়ার একটি ছবি আত্মবিস্মৃত দোলারোহিণীর বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হয়েছে--

ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক—
কবরী খসিয়া খুলিছে।

পরবর্তী 'রাশি রাশি তুলি শৈবালদল, ভরিয়া লয়েছে লোল অঞ্চল' প্রভৃতিও প্রত্যক্ষের মধুর অনুকৃতি হতে পারে না। গীতিকবির হৃদয়ে বর্ষা যে-রাগিণীর সঞ্চার করেছে তারই যথাসম্ভব রূপাঙ্কন মাত্র। এই কল্পচিত্রগুলির মধ্যে সংস্কৃত কাব্যের স্পর্শ পাওয়া গেলেও 'বর্ষামঙ্গল-এ' দৃষ্ট খণ্ড চিত্রগুলির মত এগুলি বিদেশীয় ব'লে মনে হয় না।

'নিরুপমা' কবিতাটি যদিচ প্রণয়ের, তবু বর্ষা-নিসর্গেরই এখানে প্রাধান্য। কারণ, প্রণয়ের বর্ণিত বিকারসমূহ ঐ প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়া স্ফূর্তি পেতেই পারত না।

কবি আষাঢ়ের প্রথম দিবসের কথা উল্লেখ করলেও নিসর্গ বা প্রেমের বর্ণনে ঋতুসংহার বা মেঘদূত থেকে কোনও ভাব বা নিসর্গের পরিবেশ সঞ্চয়ন করেন নি। 'কল্পনা'র অধ্যায়ের পরীক্ষামূলকতার পরই কবি আত্মস্থ হয়েছেন, যদিও সংহত ভাষাভঙ্গির ঐ অনুশীলন কবির রচনায় একটি স্থায়ী

কলাচাতুর্যের স্বাক্ষর রেখে গেছে। 'অবিনয়' কবিতার প্রথম স্তবকে এই পরিমিতিযুক্ত এবং স্বকীয়তাগুণমণ্ডিত নির্মাণের চিহ্ন পরিস্ফুট।

বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
বকুলবীথিকা মুকুলে মত্ত কানন 'পরে ;
নবকদম্ব মদির গন্ধে আকুল করে।

এসব কবিতাতেও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যতি কুত্রাপি শব্দমধ্যে বিন্যস্ত হয় নি, আর খাঁটি বাঙ্‌লা বাক্‌রীতির আশ্রয়েই যাবতীয় চমৎকারিতা নিষ্পন্ন হয়েছে। নিম্নে উদ্ধৃত অংশের চিত্রসম্পদ্ আমরা পূর্বেও লক্ষ্য করেছি, কিন্তু এখানকার বর্ণিত অংশের সঙ্গেই আমাদের অন্তরঙ্গতা বেশি—

দিবালোকহারা সংসারে আজ
কোনোখানে কারো নাহি কোনো কাজ,
জনহীন পথ ধেনুহীন মাঠ যেন সে আঁকা—
বর্ষণঘন শীতল আঁধারে জগৎ ঢাকা।

'মানসী'র 'এমন দিনে তারে' কবিতায় নিসর্গের চেয়ে প্রণয়পক্ষে গুরুত্ব, এখানে নিসর্গপক্ষে। গীতিকাব্যের নাতিবিস্তৃত নাতিসংক্ষিপ্ত ভাবকথন-রীতি এতে অনুসৃত হয়েছে, ফলে কবিতাটি একটি উত্তম গীতিকাব্যের মহিমা লাভ করেছে। ' বর্ষার পটভূমিতে লেখা একটি কাল্পনিক ভাবের কবিতা **'আবির্ভাব'** এবং অন্য কয়েকটি পল্লী জীবনচিত্রের কবিতা রয়েছে। এর মধ্যে 'আবির্ভাব' রীতির দিক থেকে স্বতন্ত্র শ্রেণীর—ধ্বনিগাম্ভীর্যময় এবং নিছক কল্পনাবিলাসের কবিতা। আমরা পূর্বেকার আলোচনাসমূহে নির্দেশ করেছি যে কবিতাটির পরিস্ফুট কোনও বাচ্যার্থ নেই, এবং এইসব কবিতার মূলে কোনো-না-কোনো সংস্কৃত শ্লোকের উদ্দীপন থাকতে পারে। বসন্তে যাকে পাওয়া গেল না, অন্তরের পরিপূর্ণতার মধ্য দিয়ে কবি তাকে পেলেন বর্ষা-সমারোহে, কারণ বর্ষাই মিলনের ঋতু, ঐ সময়েই প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসে—এরকম একটা ভাবার্থ থাকলেও, নিচেকার মত পঙ্‌ক্তিগুলি শুধু অর্থহীন fancy-র ব'লেই প্রতীত হয়—

কে জানিত মোরে এত দিবে লাজ
তোমার যোগ্য করি নাই সাজ
বাসর ঘরের দুয়ারে করালে পূজার অর্ঘ্য বিরচন।

ঠিক এই 'আবির্ভাব'-এর সদৃশ লঘুকল্পনাময় চিত্তবৃত্তিবিশেষের কবিতা **'ঝড়ের দিনে'**। এর মধ্যে সংস্কৃত প্রণয় কবিতার চরণক্ষেপ মাঝে মাঝে শোনা যায়। বর্ষাভিসার এবং পূর্বরাগ ও বিরহের নানান্ শ্লোক একত্র কবির চিত্তে যে ছন্নছাড়া ভাবজগৎ তৈরি করেছিল তাকে আর্টিস্ট-কবি এখানেও ধরে রাখতে চেয়েছেন। মিলিত অর্থের দিক দিয়ে নানাস্থানে অসংগতি থাকলেও প্রণয়-বৈচিত্র্যবিলাস হিসেবে এর বহিরঙ্গ মাধুর্য উপেক্ষণীয় হয় নি।

পুনশ্চ 'কল্পনা'য় ফিরে আসা যাক। 'কল্পনা' যে-চিত্র এবং ভাব বিন্যস্ত করেছে তা সেকালের। একালের প্রণয়-রসিকেরা সেকালকার চিত্র প্রত্যক্ষ ক'রে যদি মিলনকে উজ্জ্বলতর এবং বিরহকে সহনীয় করতে চান, তাঁরা এসব কবিতা থেকে তা করতে পারবেন, আর যে সাহিত্যরসিক একালকার সৌন্দর্যরসাস্বাদে শ্রান্ত হয়ে কল্পিত অলকাপুরীতে প্রয়াণ করতে চান তাঁকেও আমাদের প্রাচ্যভাবরসিক কবি পরিতৃপ্ত করবেন। বস্তুতঃ কল্পনার প্রণয়চিত্রগুলি কবিমর্মের সেই মধুকোষ থেকে নিঃসৃত, যার প্রীতি সৌন্দর্য এবং প্রেমের, যৌবন এবং বসন্তের কাল্পনিক স্বর্গের সঙ্গে। যেহেতু এই স্বর্গ ক্ষণিক অথচ চিরন্তন, সেইহেতু একালের কবি সৌন্দযস্বপ্নচারণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণিকতাবাদীও হয়ে উঠেছেন। এই ক্ষণিক সৌন্দর্যপ্রীতির এবং প্রণয়বাসনার পরবর্তী পরিচয় 'ক্ষণিকা'য়। আর সংস্কৃত অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতের মহিমাবোধ থেকে জাতীয়তাবোধ এবং গৌরবজনক বা অন্যভাবে স্মরণীয় কথাবলীর সঙ্গে পরিচয়ের দৃষ্টান্ত 'কথা' কাব্য রক্ষা করছে। ভাবের দিক থেকে 'কল্পনা'তেই এই জাতীয়তাবোধ এবং ক্ষণিকতার ঐশ্বর্যের প্রতিষ্ঠা।

শৃঙ্গাররস-প্রধান সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে মদনের কাযকারিতার বর্ণনা গ্রথিত হয়েছে প্রায় সর্বত্র। এই দেবতার শক্তি এবং প্রতাপ বহু স্তবস্তুতির উদ্ভব ঘটিয়েছে এবং বিরহিণী ও কুমারীদের কাছে মীনকেতু পূজা গ্রহণ ক'রে তবে প্রসন্ন হয়েছেন। শুধু কালিদাসের কুমারসম্ভবেই নয়, অন্যত্রও প্রত্যক্ষে বা নেপথ্যে মদনের যে সব কাযকলাপ বিবৃত হয়েছে তাতে মদনের একটি চারিত্র্যই গড়ে উঠেছে। সেই চরিত্র অবলম্বন ক'রে আধুনিক কবি মদনের প্রভাব-পরিবেশ চিত্রিত করেছেন **'মদনভস্মের পূর্বে'** কবিতায়। একটি প্রাকৃত শ্লোকের মধ্যে এই কবিতার 'পঞ্চশর গোপনে লয়ে কৌতূহলে উলসি' ইত্যাদির ভাব পূর্বেই গ্রথিত হয়েছে—

'কণ্ণুপ্পল-দল-মিলিঅ লোঅণেহিং
হেলালোলণ-মাণিঅ ণঅণেহিং।
লীলই লীলাবঈহি নিরুদ্ধঅো
সিঢিলিঅ-চাবো জঅই মঅরদ্ধঅো॥'

অর্থাৎ কর্ণোৎপল ধারণ করেছে এবং 'হেলা'-রূপ ভাববিকার প্রকাশ করছে দৃষ্টিতে এমন লীলাময়ীদের দ্বারা প্রতিহত হয়ে কন্দর্প কুসুমধনু শিথিল করেছেন। এর মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যে দৃষ্ট মদনোৎসব বা বসন্তোৎসব, প্রথম শরাহতা কুমারীর হাব, ভাব, হেলা, তির্যক প্রাণীদের উপর তার প্রভাব, বিরহিণীর বিরহ-কাতরতার সংক্ষিপ্ত চিত্রসমূহ অবতারিত হয়েছে। এর ভাষায় রয়েছে সংস্কৃতের 'বৃত্তি' বা রসানুগামী বর্ণযোজনার আক্ষরিক অনুসরণ এবং ব্যাসে সমাস এবং সমাসে ব্যাসরূপ প্রৌঢ়ির সজ্ঞান প্রয়োগ। কবিতাটির সিদ্ধি কবির প্রাচীনকে উপস্থাপিত করার কৌশলের মধ্যে। **'মদনভস্মের পর'** বরং ঐ ঘটনা উপলক্ষ্য ক'রে এবং মদনের স্তবের, 'হরতাপি তনুং যস্য শম্ভুনা ন হৃতং বলম্' প্রভৃতিকে অবলম্বন ক'রে গীতিকবির নিজ মনোভাবের ইতিবৃত্ত। অবশ্য 'ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা' প্রভৃতি নিসর্গচিত্রে সংস্কৃত কাব্যই প্রতিফলিত হয়েছে। 'কল্পনা' কাব্যের মোটামুটি স্বভাবই এই। প্রাচীনের গুণ এবং ধর্মের প্রতিক্ষেপ, অনুসরণ এমনকি অনুকৃতি। এ কাব্যের মার্জনা, পসারিণী, স্পর্ধা, পিয়াসী প্রভৃতি কবিতার উদ্দীপন-মূল সংস্কৃত শতকাদির শ্লোক-কাব্য। ভাবমূলক বিস্তৃত সঞ্চরণ আধুনিক রোম্যান্টিক কবির স্বকীয়।

'কল্পনা'র সংস্কৃতানুসরণ কবির ভাষাভঙ্গিকে সমৃদ্ধ এবং কল্পনার নবদিগন্ত উন্মোচন করলেও প্রাচীন চিত্র যেখানে কবির বাসনালোকে প্রত্যক্ষভাবে অনুরঞ্জিত হয়েছে এবং পূর্বপ্রতিষ্ঠিত কল্পলোকের সমসূত্রে নবত্ব লাভ করেছে সেখানেই কবিকৃতি অপরূপ হয়ে উঠেছে। এরকম কবিতা হ'ল **'স্বপ্ন'**। নিঃসন্দেহে 'কল্পনা' কাব্যের এটি শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং রবীন্দ্র-সৃষ্টির মধ্যেও এটি কাব্য-সৌন্দর্যে অন্যতম। মানসী প্রিয়ার সন্ধানে কবির উজ্জয়িনী-প্রয়াণ এবং সেই প্রিয়ার সঙ্গে মিলনের বেদনাব্যাকুল চিত্র এর কাব্যবস্তু। কবির ঐ স্বকীয় কল্পনার সূত্রে সমাহৃত না হ'লে এর চিত্রগুলি এত অপরূপত্ব লাভ করত না এবং মালবিকার সঙ্গে মিলন সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত বিলাস-বাটিকায় মিলনের সদৃশ মাত্র হ'ত। এ মালবিকা রূপের দিক থেকে সংস্কৃত

সাহিত্যের নায়িকা হ'লেও কার্যতঃ কবির স্বকীয়া এবং জন্মপূর্ব মিলনের এক কল্পিত দৃশ্যটি একালের রোম্যান্টিক কবিরই—

মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু, কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি, নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত—মনে নাহি আর।
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহাপানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।

এ মিলন প্রেমবৈচিত্ত্যের, এর মধ্যে সুচিরকালের অশ্রু এবং দীর্ঘশ্বাসই উচ্ছ্বসিত হয়েছে। **'মেঘদূত'** কবিতা সম্পর্কে গদ্যে আলোচনার উপসংহারে কবি বলেছিলেন—'হে নির্জনগিরিশিখরের বিরহী, স্বপ্নে যাহাকে আলিঙ্গন করিতেছ, মেঘের মুখে যাহাকে সংবাদ পাঠাইতেছ, কে তোমাকে আশ্বাস দিল যে, এক অপূর্ব সৌন্দর্যলোকে শরৎ পুর্ণিমার রাত্রে তাহার সহিত চিরমিলন হইবে?' এ কবিতাটি যেন বর্ণনীয়ের ঐ প্রত্যাশাপূরণের একটি কল্পচ্ছবি। তাই এ মিলনে কোথাও উচ্ছ্বাস নাই, দেহবিভ্রমও নাই। এর পরিবেশেও বিষাদময় সন্ধ্যার একটি চিত্র দেওয়া হয়েছে, যার সঙ্গে কবি-রচিত পূর্বেকার সৌন্দয-ব্যাকুলতা সম্পর্কিত কবিতায় আমরা পরিচিত। এখানে ছন্দের নিয়মিত গতির পরিবর্তনও পরিবেশচিত্র রচনার যথার্থ সহায়ক হয়েছে—

রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।
দীপ দ্বারপাশে
কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমাহৃত প্রসাধনচিত্র সহ যে-প্রাচীন সৌন্দযপ্রতিমাকে কবি আমাদের সামনে এনেছেন তার সঙ্গে আমাদের কল্পস্বপ্নের একটি সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এই কল্পলোকবাসিনী প্রিয়ার সৌন্দয ও প্রসাধন যে-যে উপকরণ দিয়ে প্রস্তুত তার সঙ্গে যদি পাঠকের অন্তরের যোগ থাকে তো ভালোই, না থাকলেও স্বপ্নসৌন্দর্যে বিচরণের বাধা ঘটবে না কোথাও। কারণ, কবিতাটির পরিচ্ছন্ন চিত্র-অঙ্গে যে শব্দমন্ত্র অর্পণ করা হয়েছে তাতে অভিলষিত বাসনালোকে সহজেই উত্তীর্ণ হওয়া যায়, যেমন—

'তনুদেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।'
'অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ, কেশধূপবাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।'

প্রভৃতি লক্ষণীয়। ভাবানুযায়ী চরণের বন্ধন থেকে মুক্তিও এ কবিতার আন্তরিকতাকে স্পষ্ট করেছে। ফলে চিত্র, ধ্বনি এবং উচ্ছ্বাস-আতিশয্যহীন দূরাভিলাষ একত্র হয়ে কবিতাটিকে রবীন্দ্রেরই একটি উচ্চতম কলাসৃষ্টিতে পরিণত করেছে।

এই শ্রেণীর আর একটি কাল্পনিক চিত্রসমন্বিত কবিতা **'ভ্রষ্টলগ্ন'**-এ প্রাচীনের একটি ব্রীড়াময়ী নবকামিনীর চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। পথিক এবং নায়িকার বেশসজ্জা এবং পরিবেশে প্রাচীনের মণ্ডনকলাবিধি স্পষ্ট। প্রভাত, সন্ধ্যা ও রজনীর তিনটি পৃথক বিলাসবেশে এ-নায়িকা 'আবেদন' কবিতার রানীর মতই অসাধারণিকা। কবিতাটির শ্রুতিসুখকরতার কারণ এর যতিবিন্যাসে কবির পরম নৈপুণ্য। ছ'মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যদ্যপি অর্ধযতিবিভাগ দুই-চার, চার-দুই অক্ষরযুক্ত শব্দেও চলে, তবু তিন-তিন মাত্রাবিন্যাসই যেহেতু এর স্বরূপলক্ষণ সেইহেতু চার-দুই শব্দযুক্ত পর্বের বেলায় চার-অক্ষর শব্দের মধ্যেই ভেঙে নিতে হয়। শব্দ যদি তিন-তিন হয় তাহ'লে আর কোনও কথা থাকে না। 'কল্পনা'-যুগের ষণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তের কবিতামাত্রেই তিন-তিনের শব্দযোজনার আগ্রহ প্রকট। 'ভ্রষ্ট লগ্ন' কবিতার অধিকাংশ চরণ-বিন্যাসে এই রীতির অনায়াস স্ফুরণ ঘটেছে ব'লেই আবৃত্তিতে কবিতাটি এত রম্য। যেমন—ফাগুন : যামিনী। প্রদীপ : জ্বলিছে। ঘরে॥ দখিন : বাতাস। মরিছে : বুকের। পরে॥ সোনার : খাঁচায়। ঘুমায় : মুখরা। শারী॥ দুয়ার : সমুখে। ঘুমায়ে : পড়েছে। দ্বারী॥ ইত্যাদি।

যদি 'কল্পনা' কাব্যে গ্রথিত একালের গানগুলিকেও কবি-প্রবৃত্তির নির্দেশক হিসেবে ধরা যায়, তাহ'লেও প্রাচীন সাহিত্যের মর্মকোষ থেকে কল্পনা-মধু সঞ্চয় ক'রে যে তিনি ধনী হয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। 'যদি বারণ কর' 'কেন বাজাও কাঁকন' 'কেন যামিনী না যেতে' প্রভৃতি এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত। আমরা 'কেন যামিনী না যেতে' গানটির কল্পনামূলে কয়েকটি সংস্কৃত প্রকীর্ণ প্রণয়-কবিতার ছায়া লক্ষ্য করেছি। এগুলির ভাষাভঙ্গি এবং প্রণয়-বিলাস সংস্কৃতের মুক্তক প্রেমকবিতার সদৃশ। এগুলির রচনায় সুরতালের যে

চমৎকৃতিই থাকুক, কাব্যরচনা হিসেবে এগুলির আনন্দদানের ক্ষমতা অপরিসীম। এর মধ্যে 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর' সংগীতটি একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য। বাঙ্‌লা এবং সংস্কৃতের বাক্‌রীতি এতে মিশ্রিত, এবং ধ্বনি-সংঘাত ও পরিমিত ঝংকারের আশ্রয়ে প্রিয়বস্তুকে সুদূরের গৌরবে সমুন্নত ক'রে দেখার চমৎকারিতাও এ কবিতাটির প্রাপ্য। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ বাঙ্‌লা ভাষায় সংস্কৃতের হ্রস্বদীর্ঘ স্বরবিন্যাস নিয়ে সংগীতরীতিতে পরীক্ষা ক'রে দেখেন। তিনি নিঃশেষে জানতেন যে, কবিতায় এরকম স্থিরনির্দিষ্ট হ্রস্বতা দীর্ঘতা কৃত্রিম হবে, কিন্তু গানের সুরে গ্রথিত হলে চলে যাবে স্বচ্ছন্দে, কারণ মূল সুর ঠিক রেখে মাত্রাবিন্যাস করলে শ্রুতিসুখকরতাকে আহত করা হবে না। কীর্তনগীতে এ কলাবিধি পূর্বেই অনুসৃত হয়েছে।

সংস্কৃতানুসারী প্রণয়-কবিতা ছাড়া অন্য-ভাবুকতার কবিতাও 'কল্পনা'য় রয়েছে এবং তা কাব্যখানির উপাদান-বৈচিত্র্য রক্ষা করেছে। বৈশাখ, বর্ষশেষ, অশেষ প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতিতে লেখা **'বৈশাখ'** নিসর্গের কবিতা, কিন্তু **'বর্ষশেষ'** নিসর্গ-নির্ভর হলেও কবির অন্তরের ভাবুকতা ও কল্পনাই এর কাব্যস্বরূপ। অর্থাৎ নিসর্গচিত্র অবলম্বন ক'রেই কবি তাকে অতিক্রম করেছেন এবং স্বীয় ভাবলোকে ধাবিত হয়েছেন। নিসর্গের একটি নূতন অর্থ কবিচিত্তে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে, তারই উচ্ছ্বাসময় বিস্তৃতি শক্তিশালী ভাষায় শেষ পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছে। পূর্বেকার আলোচনায় আমরা নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছি যে আমাদের লৌকিক প্রত্যক্ষ জীবনের দীনতা, ভীরুতা, প্রথানুগত্য প্রভৃতি কবিচিত্তে প্রতিঘাতের সঞ্চার ক'রে মুক্তির জন্য অধীর করেছে। 'কল্পনা' রচনার কালে যে জাতীয়ভাবোদ্দীপনা কবিচিত্তকে অধিকার করেছিল এ কবিতাটি তার সগোত্র। ফলতঃ নিঃশেষ কাব্যসৌন্দর্যের জনক এ কবিতাটি হয় নি। তবু যেখানে যেখানে সংকেতময় নিসর্গচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে বা ভাবার্থ ব্যঞ্জনার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানেই উত্তম কাব্য স্ফুরিত হয়েছে বলা যেতে পারে, যেমন—

মত্ত হাহারবে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক তবে।
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত-আঘাতে

উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।

এখানে কালবৈশাখীর উপর উন্মাদনৃত্যপরা রমণীর চারিত্র্যের আরোপ কাব্যসৌন্দর্যের কারণ। পুরাতন সঞ্চয়কে ধূলি ও তৃণের সঙ্গে তুলনা ক'রে অতিতুচ্ছতা ব্যঞ্জনা করা হয়েছে। অঞ্চলের আবর্ত-আঘাতে উড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতিও রক্ষিত হয়েছে। ব্যঞ্জনার মধ্যে যেখানে আমাদের বাস্তব জীবনের অগ্রগামিত্ব পরিস্ফুট এমন পঙ্ক্তি হ'ল—

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্—
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার
উদ্দাম পথিক।

কিন্তু ব্যঞ্জনা নয়, অর্থগৌরবেই কবিতাটির প্রতিষ্ঠা, আর এর বহু পঙ্‌ক্তিই কবির অন্তরের আদর্শনিষ্ঠার বাণী বহন করছে—যে বাণী তাঁরই ভাষায় হ'ল 'বেদগাথা সামমন্ত্রসম সরল গম্ভীর' 'বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে'। কবিতাটির মধ্যে কবির যে নৈষ্ঠিক উপলব্ধি বর্তমান তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পুনরুক্তি করতে হয়েছে এবং প্রায়শঃ পল্লবিত ভাষণেরও আশ্রয় নিতে হয়েছে। ফলে কবিতাটিতে বাক্-সংযমের অভাব ঘটেছে সন্দেহ নেই। বিশেষণ-বক্রতা যেমন, 'বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা' 'ঋজু শুভ্র মুক্ত জীবনের' 'সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর' 'হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন' এবং ধ্বনিবক্রতা যেমন, "মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের জ্বলদচিরেখা' 'ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে' 'খিন্ন শীর্ণ জীবনের' প্রভৃতি এর পঙ্‌ক্তিগুলির ভাবপুষ্টিকারক গুণের মধ্যে অবশ্য গণনীয় হতে পারে। অন্তিম স্তবকে ভাবের শান্তি এবং উদাত্ত-গম্ভীর ভাব ও রসের শান্তরসপরিণামকে কেউ কেউ রসবিচ্যুতি দোষ ব'লে ধরেছেন। এ ধারণা অযথার্থ নয়। বিখ্যাত 'সুপ্রভাত' ('রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি') কবিতার আশ্চয বীররসের আকর্ষণ সকলেরই পরিচিত। ঐ কবিতার স্বাভাবিক সমাপ্তি 'মিলনযজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে বজ্রশিখার দাহনে' এর পর ছেদ না টেনে কবি যে আশ্বাস ও শান্তিময় পরিণামের কথা শুনিয়েছেন—'তিমির রাত্রি পোহায়ে, মহাসম্পদ্ তোমারে লভিব' ইত্যাদি—তাতেও রসভঙ্গ ঘটেছে ব'লে আমরা মনে করি। আসলে

কবিতাশেষে আত্মভাবুক কবি বিশেষভাবে নিজের কথা বলতে গিয়েই এ হেন শান্তিরাজ্যের কল্পনা করেছেন।

'বৈশাখ' কবিতায় উক্ত বিশেষণ-বক্রতা অধিকতর রসবহ হয়েছে এবং এর চিত্র-কল্পনা কবি-প্রৌঢ়ির সহযোগে নিঃশেষে চমৎকার হয়েছে। এর কাব্য-সৌন্দর্যের প্রধান কারণ বৈশাখের উপর বৈরাগী সন্ন্যাসীর (যা আবার রুদ্রের প্রতিরূপ) ব্যবহার-সমারোপ, এবং এর সঙ্গে মিলিতভাবে বৈশাখের নিসর্গের একটি পরিচ্ছন্ন এবং পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা। 'আবর্তিয়া তৃণপর্ণ, ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া চূর্ণরেণুরাশ' 'শুষ্কজল নদীতীরে শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে' 'ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে, ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্তস্বরে'—এ নিসর্গ আমাদের পরিচিত; অথচ সুনির্বাচিত চিত্রসমূহ অক্ষরমাত্রিক ছন্দোরীতির ব্যঞ্জন-ধ্বনিসংঘাতের আশ্রয়ে গ্রথিত হয়ে এক চারুতাময় অপূর্বতার সঞ্চার করেছে। এর প্রথম স্তবকে রুদ্র বা সন্ন্যাসীর মূর্তিই প্রধানভাবে ফুটে উঠেছে, 'ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল' ইত্যাদির মধ্যে। পরবর্তী স্তবকে এরই অনুবৃত্তি চলেছে—'ছায়ামূর্তি যত অনুচর' ইত্যাদি। বৈশাখের নিসর্গে ছায়ামূর্তি অনুচর কোন্‌খানে এই সংশয়ে রবীন্দ্র-কবিতার বিশ্লেষক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবিকে প্রশ্ন করেছিলেন এবং কবি তার একটা ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন মনে পড়ে। বৈশাখের মধ্যাহ্নে রিক্ত মাঠে ধোঁয়ার মত একটা বস্তু সঞ্চরণ করে এবং কখনও কখনও ঘূর্ণির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পড়ে। তা যদি দগ্ধ তাম্র দিগন্তের পার থেকে ছুটে আসা অজস্র ছায়ামূর্তি ব'লে কল্পনা করা যায়ও, তবু এ সন্দেহ ঘোচেনা যে রুদ্রের সঙ্গে তুলনা সম্পূর্ণ করার জন্যই এ কল্পনার প্রয়োজন হয়েছে। পরবর্তী স্তবকগুলিতে বৈশাখের নিসর্গই মুখ্যভাবে চিত্রিত, উপমেয়ই প্রধান। অবশ্য একথা ঠিক যে এই প্রাধান্য-অপ্রাধান্যের বিভাগে সমাসোক্তিগত চারুতার হানি কুত্রাপি ঘটে নি। তবে লক্ষণীয় এই যে, শেষপূব স্তবকে বৈশাখকে অতিক্রম ক'রে সাধারণভাবে মানুষের অস্তিত্বের দুঃখকেও কাব্যপ্রেরণার মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। যেমন—

> ···বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
> জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষকোটি নরনারী হিয়া
> চিন্তায় বিকল।

রৌদ্র, ভয়ানক, বিস্ময়, শান্তাদি ভাব কবিতাটিকে মিশ্ররসের ক'রে তুলেছে।

বস্তুতপক্ষে দেখতে গেলে আমাদের মনস্তত্ত্বে কোনও একটি ভাবের একক যাতায়াত নেই। প্রধান ভাব একটি থাকলেও অপ্রধানভাবে নানান্ ভাব-কণিকা মিশ্রিত অবস্থায় বিদ্যমান থেকে রসানুকূল বাস্তব অনুভবের উদ্রেক করে। কবিতায় কখনও ভাবসন্ধি, ভাবসংক্রমণের স্তরসমূহ স্পষ্ট ধরা যায়; কখনও ছায়াছবিতে, ধ্বনিতে, ভাষাবক্রতায় শুধু মানসিক উপলব্ধির যোগ্য হয়ে ওঠে। 'বৈশাখ' কবিতায় এইসব ভাব, চিত্র ও ধ্বনি সম্মিলিত হয়েছে। মূল্যের দিক থেকে এটি কল্পনাকাব্যের মধ্যেকার 'স্বপ্ন' এবং 'ভ্রষ্টলগ্ন'-এর পাশেই স্থান পাবে, যদিচ স্বাদে ও প্রকৃতিতে এটি স্বতন্ত্র। ভাষার চিত্র এবং শব্দমন্ত্রে নবচৈতন্য লাভের পর এবং সংস্কৃতের প্রেম ও সৌন্দর্যের ক্ষণিক মাধুর্যে কবির স্থির হবার পর তাঁর ক্ষণিকা, কথা এবং নৈবেদ্যের মধ্যে এরই অনুরণন নানাভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে এবং সংস্কৃতের সঙ্গে আত্মীয়তার ফলে কবি ধ্বনিগুণসম্পন্ন একশ্রেণীর কবিতা ও সংগীতের সৃষ্টি করেছেন যার সঙ্গে আমাদের অন্তরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছে।

'ক্ষণিকা'র কাব্য-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কোনও পাঠক প্রশ্ন করেছিলেন, 'ক্ষণিকা' কেন ছাত্রদের পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হয় না। আমি বলেছিলাম, অতিবিশুদ্ধ কাব্য ব'লেই বোধহয় হয় না। তা ছাড়া কাব্যের বিশুদ্ধ স্বরূপে চিত্ত প্রতিষ্ঠিত হ'লে ছাত্রেরা আমাদের মোটা বইগুলো পড়বে কেন? কিন্তু 'ক্ষণিকা' কেবল বিশুদ্ধই নয় সহজ এবং অনায়াসও। এতে প্রেম, যৌবন, বসন্ত, মিলন প্রভৃতিকেই শেষ কথা ব'লে ধরে নেওয়া হয়েছে। কল্পনায় সুদূর-সঞ্চরণ, সুগভীর সৌন্দর্যপিপাসা, নূতনের আবির্ভাব-তত্ত্ব প্রভৃতি গভীর, গুরুতর অথবা সূক্ষ্ম ভাবুকতার প্রসঙ্গ এতে নেই। 'ক্ষণিকা' যেন বোঝাই বাণিজ্যের মধ্যে হঠাৎ-ভেসে-আসা একটি পরিচ্ছন্ন চঞ্চল খেয়াতরণী। এর কবি-মনোভাবের স্বরূপ কয়েকটি কবিতায় খুব স্পষ্টভাবে কবি জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন—

> চিত্তদুয়ার মুক্ত ক'রে সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
> আজকে আমি কোনোমতেই বলব নাকো সত্য কথা।

অথবা,

> গভীর সুরে গভীর কথা শুনিয়ে দিতে তোরে
> সাহস নাহি পাই।

অথবা, বিখ্যাত 'যথাস্থান' কবিতার শেষাংশে 'যেথায় সুখে তরুণযুগল পাগল

হয়ে বেড়ায়' ইত্যাদির প্রণয় ও নিসর্গপ্রীতির মধ্যেই কবিতার স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। হতে পারে কবির এই নূতন মনোভাবের জন্ম সংস্কৃত কাব্যের অনুশীলন থেকে প্রারব্ধ হয়েছে। তবু গভীর কল্পনায় সমৃদ্ধ, উদীয়মান অরূপভাবুক কবির পক্ষে এ মনোভাব বাহ্যতঃ আশ্চর্য সন্দেহ নেই। আবার অন্তরঙ্গ বিচারে বিস্ময়কর নয় এই কারণে যে, সুকবিসত্তাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও শেষ লক্ষণ। সৌন্দর্যবোধ, জীবনবোধ এবং অরূপভাবুকতা তাঁর কাব্যরস-বিহ্বলতার সূত্রেই ঘটেছে। এ সব বিষয় 'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়' গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। আমরা এখন তাঁর কাব্যে যে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে তার বিশ্লেষণ ও সৌন্দর্য-প্রদর্শনের পক্ষপাতী।

ছড়ার ছন্দে আত্মপ্রকাশ 'ক্ষণিকা'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ কাব্যের সিকি অংশ মাত্র মাত্রাবৃত্তে লেখা। অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতির কোনো লেখাই এ কাব্যে স্থান পায় নি। এরই সমকালে লেখা 'কথা' কাব্যের কয়েকটি কবিতাতেও ছড়ার ছন্দ প্রযুক্ত হয়েছে। আবার এর কিছু পূর্বে লেখা 'কল্পনা'র মধ্যবর্তী 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতা—যার মধ্যে ছড়ার ছন্দ প্রয়োগের সম্ভাব্যতা সমধিক ছিল, তা মাত্রাবৃত্তেই গ্রথিত হয়েছে। মোটামুটি 'কল্পনা' কাব্যের রীতি হ'ল মাত্রাবৃত্তের, কিন্তু এর মধ্যেই সহসা ছড়ার ছন্দে তিনি কিভাবে এলেন, তার কোনও পরিচয় অর্থাৎ পরীক্ষামূলক অবস্থার অধ্যায়টি আমরা পাচ্ছি না। আমরা একেবারে তাঁর পাকা হাতের রচনায় এসে পড়েছি, যার মধ্যে ত্রুটির প্রশ্ন তো নেই-ই, উপরন্তু মিলবন্ধনের বৈচিত্র্য এবং যতিস্থাপনের অনবদ্যতা-সহ আধুনিক বাঙ্‌লা গীতিকাব্যের নূতন পথ উন্মোচনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমাদের পূর্বেকার বিবেচনায় মাত্রাবৃত্তে কবির যতিপাতের পরিমাপিত নিপুণতার কথা বলেছি। ছড়ার ছন্দেও যদিচ শব্দমধ্য যতিপাত নিন্দনীয় নয় তবু অপূর্ণপর্বের চরণান্ত ক্ষেত্র ছাড়া 'ক্ষণিকা'য় কদাচ শব্দমধ্যে কবিকে যতিস্থাপন করতেই হয় নি। এ হ'ল উন্নত ভাষাশিল্প ও ছন্দোবোধের পরিচয়। আমাদের ধারণা, কবি 'ছেলে-ভুলানো ছড়া'র রসে প্রথম যখন মগ্ন হয়েছেন তখনই ছড়ার ছন্দে রচনায় হাত দিয়েছেন। কিন্তু পূর্বেকার লেখকদের ঐ ছন্দে রচনায় সুকবির হাতেও যেসব অনিয়ম স্বাভাবিক ছিল (যেমন, পর্বে চারমাত্রার অধিক অক্ষর বা স্বল্প অক্ষরের ব্যবহার) রবীন্দ্রনাথের লেখায় তার চিহ্নমাত্র রইল না। এরই সঙ্গে গ্রথিত হয়েছে মিলের সুষমা—অন্ত্যমিল এবং মধ্যমিল—ত্রিপর্বিক, দ্বিপর্বিক এমনকি একপর্বিক চরণ-স্থাপনে। কিন্তু একে কি মিল

বলব, একি আমাদের পুর্বপরিচিত কবিদের মিল ? এ এক আশ্চর্য প্রসাধনবিধি, যা মহাকবির এক প্রযত্নেই সিদ্ধ হয়েছে, এ দৈব ঘটনা। এবং এ ব্যাপার ক্ষণিকার শ্বাসমাত্রিক ছন্দেই ঘটেছে, পরবর্তী 'পলাতকা' বা 'বলাকা'য় প্রযুক্ত ছড়ার ছন্দে এবং 'খাপছাড়া' বা 'ছড়ার ছবিতে'ও এ রমণীয়তা বিরল-গোচর। অনুপ্রাস-মাধুর্যে কবি 'কল্পনা'র সংস্কৃতানুশীলনের কালে দীক্ষিত হয়ে 'কথা' ও 'ক্ষণিকা'য় নিতান্ত সহজ হয়ে উঠেছেন একথা ঠিকই, তবু এই লৌকিক ভাষায় লৌকিক ইডিয়মের মধ্যে ঐ মাধুর্যের রক্ষণ, বিবৃদ্ধি এবং সীমিত গাণিতিক প্রয়োগ গীতিমহাকবির দৈবসিদ্ধির দিকেই অঙ্গুলিসংকেত জানায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে—

(১) ভাণ্ডারে আজ করছে বিরাজ
সকল প্রকার অজস্রত্ব।
কেন রাখব কথার ওজন ?
কৃপণতায় কোন্ প্রয়োজন ?
ছুটুক বাণী যোজন যোজন
উড়িয়ে দিয়ে যত্বণত্ব।

(২) চাইনে রে, মন চাই নে।
*
তাই নে রে মন, তাই নে।

(৩) সত্য থাকুন ধরিত্রীতে
শুষ্ক রুক্ষ ঋষির চিতে
জ্যামিতি আর বীজগণিতে,
কারো ইথে আপত্তি নেই—
কিন্তু আমার প্রিয়ার কানে
এবং আমার কবির গানে
পঞ্চশরের পুষ্পবাণে
মিথ্যে থাকুন রাত্রিদিনেই।

(৪) সবার তনু সাজিয়ে মাল্যে
পরিচ্ছদে
কহেন বিধি তুভ্যমহং
সম্প্রদদে।

(৫) তাই কলঙ্কে নিন্দাপঙ্কে
তিলক টানি
এলেম রানী
*
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।
*
পুরাণ-চিত্র বীর-চরিত্র
অষ্ট সর্গ
কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
নয়ন-খড়্গ।
*
সেসব ক্ষতি-পূরণ প্রতি
দৃষ্টি রাখি!
হরিণ-আঁখি!
লোকের মনে সিংহাসনে
নাই কো দাবি—
তোমার মনো-গৃহের কোনো
দাও তো চাবি।

নিঃসন্দেহে কবি ভাষার রাজা এবং মিল-সম্রাট। লক্ষণীয় এই যে, এই মিল যত্মপি সহজ বাঙলাতেই সিদ্ধ হয়েছে, তবু 'কল্পনা'-কালের ষণ্মাত্রিক পর্বের অনুপ্রাস-চারুতাই যে কবিকে স্বল্লাক্ষব মিল যোজনায় চালিত করেছে একথা বলা যায়। পর্বান্ত এবং চরণান্ত অনুপ্রাস ছেড়ে দিয়ে শব্দ-মধ্য অনুপ্রাস দেখা যাক—

(১) বন্ধু ফিরে বন্দী করে বুকে,
সন্ধি করে অন্ধ অবিদল,
অরুণ ঠোঁটে তরুণ ফোটে হাসি
কাজল চোখে করুণ আঁখিজল।

(২) শপথ ক'রে বিপথ-ব্রত নেব—
মাতাল হয়ে পাতাল-পানে ধাওয়া।

(৩) মেহাগিনির মঞ্চ জুড়ি
পঞ্চ হাজার গ্রন্থ।
(৪) নিজের ছায়া মস্ত ক'রে
অস্তাচলে বসে বসে
(৫) মঞ্জরিত কুঞ্জবনের
গোপন অন্তরালে
(৬) নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর-বিহঙ্গেরা।

এরকম ছিটেফোঁটা শব্দমধ্যানুপ্রাস লক্ষ্যগোচর হ'লেও, এর তেমন প্রয়োজন হয় নি, কারণ মিলবাহুল্য অন্যবিধ অনুপ্রাসের প্রয়োজন খর্ব করেছে। লৌকিক ইডিয়মযুক্ত এই বাঙ্‌লায় কবি যেমন স্বচ্ছন্দে ফার্সিশব্দ কোথাও কোথাও প্রয়োগ করেছেন, তেমনি সংস্কৃত ইডিয়মও করেছেন বিনা দ্বিধায় ; এবং বলা যায় বাঙ্‌লা ভাষার এই বারোয়ারি ক্ষেত্রে তাঁর মনোভাব হ'ল—'তুমি এসো, তুমিও এসো, তুমি এসো এবং তুমি।' কিন্তু মিল এবং যতির অসাধারণত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বচনগত সামান্যতাকে এ কাব্য অনায়াসে অতিক্রম করেছে।

'ক্ষণিকা'র জীবন সম্বন্ধে লঘু স্বচ্ছ ভঙ্গি সংস্কৃতের শৃঙ্গাররসিক কাব্যের সঙ্গে অথবা ওমর খৈয়ামের সঙ্গে তুলনীয়। কবি এখানে নিঃশেষে রসিকতা-সর্বস্ব। এই ধরনের মনোভাবের জন্য 'ক্ষণিকা'র কবিতানিচয়ে স্থানে স্থানে উজ্জ্বল হাস্যরসের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়েছে। এই হাস্যরস শুধু পণ্ডিত, শাস্ত্রবিৎ অথবা তত্ত্বজ্ঞের বিচক্ষণতার উপরেই নয়, নিজের স্বভাব নিয়েও। যেমন,—

আমার প্রিয়ার মুগ্ধ দৃষ্টি
করছে নূতন ভুবন সৃষ্টি,
মুচকি হাসির সুধার বৃষ্টি
চলছে আজি জগৎ জুড়ে।

* *

যদি বল, 'আর বছরে
এই কথাটাই এমনি করে

বলেছিলি, কিন্তু ওরে
শুনেছিলেন আরেক জনে'—
জেনো তবে মূঢ়মত্ত
আর বসন্তে সেটাই সত্য,
এবারো সেই প্রাচীন তত্ত্ব
ফুটল নূতন চোখের কোণে।

'শুনেছিলেন আরেক জনে' উক্তিতে অগভীরতার দোষ নিয়ে নিজের উপব কটাক্ষ এবং পরের পঙ্‌ক্তিগুলিতে কৌশলে সেই অপরাধ ক্ষালনে বুদ্ধিগত হাস্যরসের উদ্ভব। **'কর্মফল'** (পরজন্ম সত্য হলে) এবং **'কবি'** (কাব্য পড়ে যেমন ভাব) এই ভাবে আগাগোড়া নিজকে অথবা সাধারণকে নিয়ে হাস্যরসের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'আমি হবনা তাপস' এবং 'বিদায়-রীতির' হাস্যের ভিত্তি শাস্ত্রবাক্যের অসংগতি এবং আদিরসের বৈচিত্র্য। **'তথাপি'**তেও তাই, মানিনী নারীর প্রণয়কে ফিরিয়ে আনার জন্য বক্রভাবে অর্থাৎ কৌশলে শঙ্কা জাগিয়ে প্রার্থনা জানানো হচ্ছে—

তাহা ছাড়া চিরদিন কি কষ্টে যায়?
আমারো এই অশ্রু হবে মার্জনা।
ভাগ্যে যদি একটি কেহ নষ্টে যায়
সান্ত্বনার্থে হয়তো পাব চার জনা।
কিন্তু তবু তুমিই থাকো, সমস্যা যাক ঘুচি।
চারের চেয়ে একের 'পরেই আমার অভিরুচি।

'অচেনা' কবিতায় প্রেমের ক্ষেত্রে বেশি চেনার এবং মন-দেওয়া মন-পাওয়ার গুরুত্বকে কৌশলে কেমন হেয় করা হয়েছে। এখানে স্বপক্ষে যুক্তিবিস্তারের মধ্য দিয়ে হাস্য ফুটে উঠছে—

কে যাবে ভাই, মনের মধ্যে
মনের কথা ধরতে?
কীটের খোঁজে কে দেবে হাত
কেউটে সাপের গর্তে?

আমরা রসিকতা বলতে ছন্দোবন্ধে শৃঙ্গার এবং হাস্যরসপ্রকাশের দক্ষতাকেই ধরছি। এই রসিকতায় এবং সেই সঙ্গে কবিত্বেও কবি যে সমানভাবে দক্ষ তার

পরিচয় এই সব কবিতায়। পরবর্তীকালের 'প্রহাসিনী' কাব্যের নিতান্ত বৌদ্ধিক হাস্যরস বা 'wit' উন্নত সৃষ্টি হ'লেও সেখানে আদিরসের এই অপূর্বতা নেই। এই ধরনের কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটিরই উদ্ভবের মূলে স্বচ্ছন্দ একটি হাস্যের ভাব রয়েছে। আর তাকেই নানাভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে কবিতার মধ্যে। যেমন, 'সেকাল' অর্থাৎ 'আমি যদি জন্ম নিতেম'। পরিচ্ছন্ন কৌতুকপ্রিয়তাই হ'ল এই সব কবিতার কাব্যের ভিত্তি আর গুরুত্বপূর্ণ কথা উত্থাপিত যদিও বা হয়েছে তা প্রসন্ন কৌতুকময় হয়েই প্রকাশ পেয়েছে। 'ক্ষণিকা'র লঘুপর্বিক ছন্দ, লঘুতর জীবনবোধ এবং হাল্কা ভাষার সৌন্দর্য কবির চিত্তে একই সঙ্গে অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে উদ্ভূত হয়েছে, তাই গীতিকবিতা হিসেবে 'ক্ষণিকা' অনবদ্য।

প্রণয়-বিলাসের দিক ছাড়া এ কাব্যের অন্তর্গত কবিস্বভাবের অন্য লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল ভাবনা-ভারমুক্ত স্বচ্ছ নিসর্গপ্রীতি। এ নিসর্গ কবির জন্মান্তরীণ সৌহৃদ্যের রহস্যময়তায় সমাবৃত এবং কল্পনাবিহ্বল পৃথিবীপ্রীতির দ্বারা আবিষ্ট নয়। এ যেন ব্যক্তিসঙ্গমুক্ত আপনা থেকেই উদিত এক একটি মনোরম চিত্র-সন্নিবেশ। এর পূর্বে 'নববর্ষা' কবিতা প্রসঙ্গে আমরা গীতভাবুক কবির রাগচিত্র নির্মাণের বিষয় উল্লেখ করেছি। কিন্তু 'নববর্ষা'র চিত্রগুলির ভিত্তি বহুলভাবে কবিকল্পনা, ঠিক বাস্তব নয়। অথচ এসব জায়গায় চিত্রগুলি প্রত্যক্ষ থেকে সমাহৃত, উচ্চতর কল্পনায় অবক্ষিত ; আবার পল্লীতে দৃষ্ট এবং আমাদের নিতান্ত পরিচিত হলেও পরিচয়ের মালিন্য থেকে মুক্ত, যেন সহসা আবির্ভূত এক একটি আনন্দের মুহূর্ত। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

(১) সন্ধ্যাতারা উঠে অস্তে গেল
চিতা নিবে গেল নদীর ধারে,
কৃষ্ণপক্ষে হলুদবর্ণ চাঁদ
দেখা দিল বনের একটি পারে,
শৃগালসভা ডাকে ঊর্ধ্বরবে
পোড়ো বাড়ীর শূন্য আঙিনাতে

(২) নিবিড়-ছায়া বটের শাখে
কপোত-দুটি কেবল ডাকে
একলা আমি বাতায়নে—
শূন্য শয়ন-ঘর।

(৩) বেড়ার ধারে   পুকুর-পাড়ে
ঝিল্লি ডাকে   ঝোপে ঝাড়ে,
বাতাস ধীরে   পড়ে এল
স্তব্ধ বাঁশের শাখা।
হেরো ঘরের আঙিনাতে
শ্রান্তজনে   শয়ন পাতে

(৪) এ-ঘাট হইতে   ও-ঘাটে তাহার
কথা-বলাবলি   নাহি চলে আর
একাকার হ'ল   তীরে আর নীরে
তালতলায়।

*

পতঙ্গ যেন ছবিসম আঁকা
শৈবাল 'পরে   মেলে আছে পাখা,
জলের কিনারে   বসে আছে বক
গাছের ছায়।

এরকম চমৎকৃতিজনক স্বভাব-চিত্রণকেই প্রাচীন আলংকারিকেরা 'স্বভাবোক্তি'-অলংকার বলেছেন। বিশৃঙ্খলভাবে গ্রথিত যে-কোন সাধারণ স্বভাব-বর্ণন স্বভাবোক্তি নয়। আমাদেব ধারণায় অলংকার-পর্যায়ে পড়তে পারে এমন উত্তম স্বভাবোক্তির মূলে অতিশয় কিছু বিদ্যমান থাকেই। অর্থাৎ কবিরা যদিচ স্বভাবকেই বর্ণনীয় হিসেবে গ্রহণ ক'রে থাকেন, নিসর্গদৃশ্যের চমৎকারিত্বের উদ্‌ঘাটন যদি তাঁদের অভিপ্রেত হয়, তাহলে তাঁরা নির্বাচিত বস্তুই গ্রহণ করেন এবং ভাষা ও ছন্দোবন্ধের নিয়মেই তাকে পরিচালিত ক'রে থাকেন। অন্য সর্বত্র যেমন, এখানেও তেমনি, কবিকল্পনাই নিয়ামক শক্তিরূপে কাজ করে। এই কারণে, উত্তম কবির লেখনী থেকেই উত্তম স্বভাবোক্তি-নির্মাণের প্রকাশ ঘটতে পারে। রবীন্দ্র-কাব্যের অন্য বহু দৃষ্টান্তের মত ক্ষণিকার কবিতাগুলি তাঁর সহজ অথচ উত্তম নিসর্গবর্ণনের নিদর্শন। এরই সঙ্গে একটু কল্পনার রঙ্ মিশলে এবং ভাষায় অভাবনীয়ের স্পর্শ লাগলে স্বভাবোক্তি যে কত সুন্দর হতে পারে তার পরিচয় নিচেব কয়েকটি পঙক্তিতে লক্ষণীয়—

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা,

শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর-বিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে
বইছে নগনদী—

এ চিত্রে নির্বাচন এবং অনুপ্রাসাদির বৈচিত্র্য লক্ষিত হলেও কল্প-সত্য এবং বাস্তব-সত্য কেউ কাউকে আহত করছে না।

'ক্ষণিকা'র পূর্ব-উল্লিখিত বর্ষার কবিতাগুলি ছাড়া 'সেকাল' (আমি যদি জন্ম নিতেম), 'জন্মান্তব' (আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি) 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' (কোন্ বাণিজ্যে নিবাস তোমার) 'কৃষ্ণকলি' এবং 'এক গাঁয়ে' এক একটি বক্রোক্তি-প্রধান প্রথম শ্রেণীর কবিকৃতি হয়েছে। পাঠক-সাধারণ এগুলির আহ্লাদগত আবেদন সম্পর্কে পরিচিত। আমরা শুধু সংক্ষেপে সেই আকর্ষণের কারণ বিবৃত করছি। **'সেকাল'** কবিতাটির নির্মাণমূলে সাহিত্যে পরিবেশিত প্রাচীনের জীবন সম্পর্কে কবির আগ্রহ কাজ করেছে, কিন্তু সব জীবন নয়, প্রণয় এবং সৌন্দর্যের সঙ্গে, মিলন-বিরহের সঙ্গে জড়িত প্রয়োজন-মালিন্যহীন জীবনই কবির অভিপ্রেত বর্ণনীয়। কবির এই অপ্রয়োজনের আনন্দবিলাস প্রাচীনের ঐ জীবনচিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। এই কারণেই তা পুনঃ পুনঃ কবিকর্তৃক সমাহৃতও হয়েছে। এই বৈষয়িকতা-মুক্ত পলায়নপর স্বভাব নিয়ে প্রাচীনকে আশ্রয় করার মূলে প্রথম বক্রবৈচিত্র্য, এবং নির্বাচিত সৌন্দর্যময় দৃশ্য বা অবস্থার পরিবেশনে দ্বিতীয় বক্রবৈচিত্র্য এর মধ্যে উপস্থাপিত হয়েছে। কবির ত্বরাতাড়িত আধুনিক জীবনের প্রতি বিমুখতা প্রকাশ পেয়েছে নিচের পঙ্‌ক্তিগুলিতে—

জীবনতরী বহে যেত
মন্দাক্রান্তা তালে,

*

চিন্তা দিতেম জলাঞ্জলি,
থাকত নাকো ত্বরা—
মৃদুপদে যেতেম যেন
নাইকো মৃত্যু জরা।

তার পর চলেছে চিত্রের পর চিত্র বিন্যাস ক'রে অনুরাগ বিস্তারের পালা। এই সব চিত্রের বিন্যাসে কবি সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্যের সার সংগ্রহ করেছেন। এই সমাহরণ এবং গ্রন্থনে তাঁর নৈপুণ্য এবং কালিদাসাদির কাব্যের সঙ্গে গভীর আত্মিক সম্পর্কের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে, কিন্তু এ-কবিতার উপসংহারে কবি যেখানে স্বপ্ন ত্যাগ ক'রে বাস্তবেই তাঁর নিষ্কলুষ সৌন্দর্য-অনুসন্ধান-প্রবৃত্তির সমাধান করতে চেয়েছেন সেখানে আবার তৃতীয় বক্রবৈচিত্র্য উচ্ছ্বসিত হয়েছে—

তবু দেখো সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য
যেমনটি ঠিক দেখা যেত
কালিদাসের কালে।

মরব না ভাই, নিপুণিকা
চতুরিকার শোকে—
তাঁরা সবাই অন্যনামে
আছেন মর্তলোকে।

নিঃসন্দেহে উপসংহারের এই দিক-পরিবর্তনেই আধুনিক কবি বিজয়ী হয়েছেন।

ঠিক এই স্তরেরই পলায়ন-স্বভাবের অন্য উৎকৃষ্ট কবিতা হ'ল **'জন্মান্তর'**। এখানকার চিত্রসংসক্তিও প্রাচীনের, তবে রূপগোস্বামীর লেখা 'উদ্ধব সন্দেশ' ও 'হংসদূতে'র বৃন্দাবন-বর্ণন থেকে সংগৃহীত। হেবর্লিন্ সম্পাদিত 'কাব্যসংগ্রহ' যা কবি পুনঃ পুনঃ পাঠ করেছিলেন তার মধ্যে ঐ দুটি গ্রন্থও রয়েছে। এখানেও বাস্তব জীবনকে রূঢ় এবং সাহিত্যে চিত্রিত প্রাচীন জীবনকে বরণীয় ব'লে মনে করা হয়েছে। বৃন্দাবন-জীবন-চিত্রকে উপস্থাপিত করার মধ্যে যে পরম বৈচিত্রী তা এখানে উদ্ভূত হয়েছে।

ওরে শাঙন মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল মূলে,
ওরে এপার ওপার আঁধার হল
কালিন্দীরই কূলে।
ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে
কাঁপে খেয়াতরীর 'পরে

হেরো কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর
কলাপখানি তুলে।

চিত্র হিসেবে এ অপ্রত্যাশিত কিছু না হলেও কবির বাস্তব-বিসংবাদী অনুরাগের দ্বারা গ্রথিত হয়ে মনোহর হয়েছে। ব্যালাড্ জাতীয় নির্মাণভঙ্গি কবিতাটির চমৎকারাধিক্যের কারণ হয়েছে। **'কোন্ বাণিজ্যে নিবাস তোমার'** ইত্যাদিতে বাণিজ্য যাত্রার চিত্রের ব্যপদেশে রূঢ় সংসার ত্যাগ এবং অপ্রয়োজনের বস্তু অন্বেষণের স্পৃহা অর্থতঃ প্রকাশ পেয়েছে। এ বাণিজ্য সাধারণ বাণিজ্য থেকে নিতান্ত ভিন্ন এবং এ লক্ষ্মী কেবল-সৌন্দর্যলক্ষ্মী। যেমন 'তোমায় যদি না পাই, তবু আর কারে তো পাবই' ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশে উদ্দেশ্যহীন যাত্রার রম্যতা ঘোষিত হয়েছে। বাস্তব ছেড়ে কাল্পনিকতার রাজ্যে প্রয়াণের মধুর চিত্র রবীন্দ্র-পরবর্তী বাঙ্লা কাব্যে ও গীতে প্রচুর, কিন্তু চিত্রভঙ্গিসহ রবীন্দ্রনাথই এর প্রবর্তয়িতা। এ বাণিজ্য যে সাধারণ বাণিজ্য থেকে পৃথক, তা এর দিশাহারা অকূলের পথে পাড়ি দেওয়ার কথায় এবং নিসর্গ-চিত্রে পরিস্ফুট।—

কূল-কিনারা পরিহরি,
কোন্ দিকে যে বাইব তরী
অকূল কালো নীরে—

এবং 'যদি কোথাও কূল নাহি পাই তল পাবো তো তবু' ইত্যাদিতে নিরুদ্দেশ যাত্রার আগ্রহ বর্ণিত। এই আগ্রহের কাব্যিক চমৎকারিতা ফুটেছে বিখ্যাত 'নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ' ইত্যাদি নিসর্গ-চিত্রে। রবিন্‌সন্ ক্রুসো এবং সিন্ধুবাদ নাবিক এবং পৌল-বর্জিনীর অনুরাগী কিশোর যে পরিণত বয়সে শৈলবেষ্টিত নারিকেলশাখাবীজিত একটি রমণীয় দ্বীপের চিত্র অন্তরে বহন করবেন এ স্বাভাবিক। কিন্তু এই রোম্যান্টিক্ স্বপ্নচারণ তিনি কবিশক্তির বলে আমাদের চিত্তেও সমানভাবে সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছেন। এই অংশের অনুপ্রাসগত রহস্যনিপুণতার বিষয় পূর্বেই বলা হয়েছে।

ক্ষণিকার কয়েকটি কবিতায় দু'চার পঙ্‌ক্তি ধুয়ার মত পুনরাবৃত্ত হয়েছে। ব্যালাড্ জাতীয় রচনার এবং লোকগীতির এটি স্বভাব। করুণ কোমল ভাবের উদ্দীপনের প্রয়োজনেই এই রীতির বিকাশ। **'এক গাঁয়ে'** এবং **'কৃষ্ণকলি'** কবিতায় অন্যান্য কয়েকটি কবিতার মত এই রীতি বিশেষভাবে অনুবৃত্ত

হয়েছে। ফলে সহজ লৌকিক ভাব এবং সংঘবদ্ধ গ্রামজীবনের ভাবোচ্ছ্বাস-নিষ্ঠার একটি দিক অতিরিক্ত চমৎকারের সৃষ্টি করেছে। 'কৃষ্ণকলি' কবিতারও প্রতিটি স্তবকের শেষে 'কালো? তা সে যতই কালো হোক'—ইত্যাদি দু'পঙ্‌ক্তির অনুবৃত্তি, পাঁচালি থেকে কবিগান পর্যন্ত অনুসৃত বাঙালিচিত্তের সুকুমার প্রসাধনের স্থায়ী একটি রীতিরই অন্তর্ভুক্ত। লোকচিত্তের এই প্রবণতা বিষয়ে অভিজ্ঞ কবি এবং একালে এই চিত্তবৃত্তির সমানধর্মা কবি ছড়ার ছন্দে জীবনের সহজ প্রণয়মুখীনতার গ্রন্থনের সঙ্গে সঙ্গে এই রীতির বশীভূত হয়েছেন। এই সহজ গ্রাম্য ভাবোচ্ছ্বাসের নিখুঁত পরিবেশন ঘটেছে **'এক গাঁয়ে'** কবিতার ধুয়ার মধ্যে—

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা॥

ভাষায়, নামে, অনুপ্রাসে এবং অদৃশ্য জনগণের কলোচ্ছ্বাসময় পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির ধ্বনিতে এই কবিতাটিতে একটি পরিপূর্ণ গ্রাম্য আবহাওয়ার সৃষ্টি ঘটেছে। সাম্প্রতিক শহরবাসী এ ধরনের কবিতার পরিপূর্ণ উপভোগ থেকে বঞ্চিত থাকবেন। 'এক গাঁয়ে' কবিতার গ্রাম্য প্রণয়-মাধুর্যের আর এক অভিনব বৈচিত্র্য ফুটেছে পারম্পর্যক্রমে নায়কপক্ষ ও নায়িকাপক্ষের পারস্পরিক নিসর্গসম্পর্কের হৃদ্যতা বন্ধনে। 'তাদের খেতে যখন তিসি ধরে, মোদের খেতে তখন ফোটে শণ···তাদের বনে ঝরে শ্রাবণধারা, আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।' এই রীতির বৈচিত্র্য কবির কাব্যে পরে আর কোথাও বিশেষ ফোটে নি, এই পল্লীজীবন-সম্পর্কেরও অনুবৃত্তি ঘটে নি। রীতিবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এটি বিশেষ স্মরণীয় কবিতা।

'কথা' কাব্যের বিশিষ্ট সৌন্দর্য-সম্পদ্ সম্পর্কে কবি নিজে সংগতভাবেই মন্তব্য করেছেন যে 'কথার কবিতাগুলিকে ন্যারেটিভ্-শ্রেণীতে গণ্য করলেও তারা চিত্রশালা। তাদের মধ্যে গল্পের শিকল গাঁথা নেই, তারা এক একটি খণ্ড খণ্ড দৃশ্য।' ফলে একথা বলা যায় যে 'কথা' কাব্যে গীতরীতির সঙ্গে কাহিনী এবং চিত্রসম্পদের সম্মিলন ঘটেছে। একাব্যের মুখ্য কবিতাগুলির উৎস কবির স্বাদেশিকতা ও জাতীয়ভাবোদ্দীপনায়। শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, পূজারিণী, প্রতিনিধি, মস্তক-বিক্রয়, অভিসার প্রভৃতি কবিতার ভাবার্থ যে-আদর্শগত

মনস্তত্ত্বের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে তা হ'ল ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্তের প্রতি কবির অনুরাগ। এ মনোভাব 'চৈতালি'র যুগ থেকে আপনা হতেই ধীরে ধীরে কবির চিত্ত অধিকার করেছে। বাঙ্‌লায় এবং ভারতবর্ষে পরবর্তী জাতীয়তার উদ্বোধনে এসব কবিতার আবেদন স্মরণীয়। কিন্তু কবিকৃতি হিসেবে লক্ষণীয়, এর জীবনচিত্র বর্ণন এবং নিসর্গ পরিবেশ রচনা। এই সময়কার ভাষায় যথাযথ অর্থপ্রকাশের সহজ নৈপুণ্য কবির করায়ত্ত হয়েছে, আর অনুপ্রাস-বিন্যাসের সমারোহ ক্ষীণ হয়ে, নিরর্থকতা থেকে সার্থকতা ও ব্যঞ্জনাময়তার দিকে অগ্রগতি ঘটেছে। 'কথা'র ভাষা একদিকে যেমন বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, অন্যদিকে তেমনি চিত্রসৌন্দর্যরক্ষণে অদ্বিতীয়। **'প্রতিনিধি'** কবিতার সহজ বক্রতাময় বাক্যগুলির সঙ্গে আমাদের কিশোরেরাও পরিচিত। 'এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে' (সংস্কৃত থেকে আহৃত), 'সবারে দিয়েছ ঘর, আমারে দিয়েছ শুধু পথ' 'তাঁর ভিখারির ব্রত! এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা!' 'কিছুই অভাব তব নাহি, হৃদয়ে হৃদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি ফির প্রভু, সবার সর্বস্ব ধন চাহি' 'সন্ধ্যা হয়ে এল ওই, আর কত বসে রই, তব রাজ্যে তুমি এস চলে' প্রভৃতি বাক্যসমূহে কোথাও দৃষ্টান্ত, কোথাও বিষম, কোথাও বিশেষোক্তি প্রভৃতি অলংকারের চারুতা ফুটেছে, আর পরিস্ফুট অলংকার না থাকলেও বাগ্‌ভঙ্গিমায় ব্যঙ্গ্যার্থের অনায়াস মনোহারিতা যথেষ্ট। প্রবন্ধ হিসেবে বিচার করলে এগুলির মধ্যে অবান্তরবিহীন এক একটি মাত্র ঘটনার অথবা ঘটনাংশের বিবৃতি রয়েছে এবং এগুলির সমাপ্তি অংশ ছোটগল্পের সমাপ্তির মতই রমণীয় হয়েছে। বস্তুতঃ গীতিকবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের গঠনমূলে কিছু সাদৃশ্য আছেই। দু'য়েরই মধ্যে সীমিত অখণ্ডতা এবং সংক্ষিপ্ততা গুণ বর্তমান। পার্থক্য এই যে একের বৈচিত্র্য ভাব-কল্পনাগত, অন্যের কাহিনী-গ্রন্থনগত। গীতিকাব্যে যেখানে কাহিনী অবলম্বিত হয় সেখানে ছোটগল্পের সঙ্গে সাদৃশ্য অধিক পরিস্ফুট হয়ে থাকে। 'কথা'র কবিতাগুলির বিষয়-নির্বাচনে এবং প্রারম্ভ ও পরিণাম-বিরচনে প্রথম-বক্রতা বিচ্ছুরিত হয়েছে, এর দ্বিতীয় বক্রতা হ'ল বর্ণনে এবং চিত্রবিন্যাস-কৌশলে। চিত্র এর যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে এবং সেগুলির উপস্থাপনে কবির আসক্তি যে প্রচুর, তার প্রমাণ তার বহিরঙ্গে সার্থক অনুপ্রাসের অলংকরণ।

'ব্রাহ্মণ' কবিতাটি একটি সুন্দর নিসর্গ-চিত্র দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে। তপোবনে সন্ধ্যা-সমাগমের বর্ণনা। 'অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য' ইত্যাদি। এর মধ্যে স-ধ্বনির বারংবার আবৃত্তিতে সন্ধ্যার প্রশান্তি ব্যঞ্জিত হয়েছে। গুরু-শিষ্য নিয়ে যে বিষয়ের কবি অবতারণা করছেন একটি উপমায় তার প্রভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই পড়েছে,—'নক্ষত্রমণ্ডলী সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধকুতূহলী নিঃশব্দ শিষ্যের মতো'। এরপর সত্যকামের গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথের চিত্র—'পদব্রজে হয়ে পার ক্ষীণ শান্ত স্বচ্ছ সরস্বতী, বালুতীরে সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননীকুটীরে করিলা প্রবেশ' যে অত্যন্ত প্রত্যক্ষের সৌন্দর্য সঞ্চার করেছে তাতে সন্দেহ নেই। তপোবনের পাঠার্থী ছাত্রদের বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তুলতে একটু অলংকরণ এবং শব্দপ্রৌঢ়ির আবশ্যকতা ঘটেছে—

যত তাপস বালক
শিশির-সুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা,
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্রসিক্তজটা,
শুচিশোভা সৌম্যমূর্তি সমুজ্জ্বলকায়ে
বসেছে বেষ্টন করি বৃদ্ধবটচ্ছায়ে
গুরু গৌতমেরে।

তপোবনের এই সব চিত্র ঠিক উপনিষদে নেই। কালিদাসাদির কাব্য থেকে তিনি পেয়েছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর অন্তশ্চক্ষুও কাজ করেছে। মনে রাখতে হবে এর কয়েক বৎসর পরই তিনি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপনে যত্নবান হন। 'ব্রাহ্মণ' কবিতার সবটাই চিত্রসমষ্টি বলা যেতে পারে। এর বর্ণনাকৌশলই চিত্ররীতির। একটি উপমায় ছাত্রদের চঞ্চল অবস্থার যথাযথ বর্ণনা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছে—

ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মতো—

চিত্রাঙ্কন-মহিমায় **'পূজারিনী'** এবং বিশেষতঃ **'অভিসার'** কবিতাই সবচেয়ে উল্লেখ্য হয়েছে। পূজার থাল হাতে শ্রীমতীর পুরীভ্রমণের মধ্যেকার রাজবধূ অমিতার এবং কুমারী শুক্লার চিত্র আকর্ষণীয়, কিন্তু বর্ণনায়

সবচেয়ে মনোজ্ঞ হয়েছে সন্ধ্যাগমে সেকালের রাজপুরী ও রাজগৃহের পরিবেশ—

> দিবসের শেষ আলোক মিলালো
>
> নগর-সৌধ'পরে।
>
> পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
>
> কলকোলাহল হয়ে এল ক্ষীণ—
>
> আরতিঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন
>
> রাজদেবালয় ঘরে।
>
> শারদনিশির স্বচ্ছ তিমিরে
>
> তারা অগণ্য জ্বলে।
>
> সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
>
> বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
>
> 'মন্ত্রণাসভা হল সমাধান'
>
> দ্বারী ফুকারিয়া বলে।

এই কয়েক পঙ্‌ক্তির মধ্যে কবি সেকালের রাজধানীকে আমাদের সামনে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন। এই সব অংশে কবির ধ্বনিবিন্যাস-নৈপুণ্য লক্ষ্য করবার বিষয়। মধ্যেকার তিন তিন চরণের শেষাংশে দীর্ঘ ঈ-কার ও আ-কারের সঙ্গে হলন্ত নাসিক্যধ্বনি-প্রয়োগের ব্যঞ্জনার কার্যকারিতাও স্মরণীয়। 'অভিসার' কবিতার চিত্রাবলী আরও সুন্দর। সে চিত্র ছড়িয়ে রয়েছে অভিসারমদে মত্তা নর্তকীর বর্ণনে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বর্ণনে এবং প্রাচীনের মথুরার নিসর্গ-পরিবেশ বর্ণনে। বর্ষাভিসারিকার গমনপথে অলংকারধ্বনি সাধারণভাবে শাস্ত্রসম্মত নয়, কিন্তু যেহেতু সে নর্তকী সেইহেতু অসংগতির উদ্ভব তো হয়ই নাই, উপরন্তু সৌন্দর্যের বিস্তার ঘটেছে। 'সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎশিখায়' প্রভৃতি চিত্র নর্তকীর জীবনের পরবর্তী দুর্ঘটনার সংকেত আভাসিত করার জন্য প্রয়োজনীয় হয়েছে। এর পর চৈত্ররজনী এবং বিশেষে পূর্ণচন্দ্রের সেই স্মরণযোগ্য বর্ণনা—

> জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
>
> গেছে মধুবনে ফুল-উৎসবে
>
> শূন্য নগরী নিরখি নীরবে
>
> হাসিছে পূর্ণচন্দ্র।

'ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল, যামিনী জোছনামত্তা' এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় মাত্র তিনটি বিষয়ের সন্নিবেশে মাদকতাময়ী চৈত্ররজনীর সম্পূর্ণ সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। 'কথা'র এই শ্রেণীর কবিতাগুলিতে প্রয়োজনবশে তিন রীতির ছন্দ ব্যবহৃত হলেও ষণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্তেই চমৎকারিতা অধিক পরিস্ফুট হয়েছে।

'কাহিনী'র নাট্যকল্প রচনাগুলির রমণীয়তা সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি পূর্বেকার গ্রন্থে* বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে। এখানে তার পুনরাবৃত্তিতে লাভ নেই। শুধু লক্ষণীয় এই যে, কেবল চরিত্র-গ্রন্থনে এবং ভাবের বিষয়ের উপস্থাপনেই নয়, অর্থগৌরবময় আলংকারিক ভাষার নির্মাণেও এর মধ্যে স্থানে স্থানে বিষয়-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র রম্যতাব সৃষ্টি হয়েছে। 'গান্ধারীর আবেদন' নাট্যকাব্যই তার বিশেষ দৃষ্টান্ত। এর পূর্বেকার কোনও নাট্যে সংলাপের ভাষার মধ্যে এরকম ঋজুতা ও তীক্ষ্ণতা দেখা যায় না, এবং প্রতি চরণে ইংরেজি ও বাঙলা অলংকারের চমকপ্রদ গ্রন্থন সহ এত শক্তিশালী সংহত গদ্যের পরিচয়ও কোনও কাব্যের ভাষাভঙ্গিতে পাওয়া যায় না। সেদিক থেকেও নাট্যকাব্যগুলি বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক হয়েছে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ভাষাভঙ্গির যে পরিমিতি এবং সংহতি কবি এ যাবৎ সৃষ্টি করেছেন, যাকে এ-যুগের ক্লাসিক্যাল রীতি বলা যায়, নৈবেদ্যের সনেটকল্প রচনাগুলিতে তার মনোরম ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ দেখতে পাই।

নৈবেদ্যের সনেটকল্প রচনাগুলি অর্থগৌরবপ্রধান, কিন্তু সবগুলিই যে কাব্যের রমণীয় সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত এমন নয়। স্থির ভাবনা বা আদর্শের বন্ধন যেখানে একটু আলগা হয়েছে এবং কবি যেখানে স্বানুভব ও কল্পনাকে ভাব-আকর্ষণের কাজে লাগিয়েছেন সেখানেই আদর্শ অথবা তত্ত্ববিবৃতি অতিক্রম ক'রে কাব্যরস উচ্ছলিত হয়েছে। কিন্তু রচনাগুণের এমনই একটি পরিপক্কতা কবি একালে অর্জন করেছেন যে ভাবোদ্দীপক কবিতাসমূহের মধ্যেও শুধু ভাষাভঙ্গির একটি রম্যতা অনায়াসেই ব্যাপ্ত হয়েছে, যেমন বলা যায়—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' 'এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময়' 'তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে' 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির' 'হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি' ইত্যাদি পাঠকদের পরিচিত ভাবঘন নীতিমূলক বহু কবিতার স্মরণীয় পঙ্‌ক্তিসমূহ। এর মধ্যে শব্দের সঙ্গে

* 'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়' দ্রষ্টব্য

শব্দের এবং অর্থের সঙ্গে অর্থের দৃঢ় সম্পর্ক গঠিত হয়েছে, কিন্তু সে সম্পর্ক নির্মিত হয়েছে একটি বিশিষ্ট জীবনভাবুকতার উপর, কল্পনার অভিনবত্বের উপর নয়। কবির এই শ্রেণীর রচনায় আমাদের একটি দেশীয়ভাব এবং চরিত্রবল যে গঠিত হয়েছে তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই। নিম্নে কাব্যরস-প্রধান কয়েকটি কবিতা উপস্থাপিত ক'রে সেগুলির শব্দার্থ-সৌন্দর্য আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
এ কী অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার!
এ কি জ্যোতি, এ কি ব্যোম দীপ্ত দীপ-জ্বালা,
দিবা আর রজনীর চিরনাট্যশালা!
এ কি শ্যাম বসুন্ধরা, সমুদ্রে চঞ্চল,
পর্বতে কঠিন, তরুপল্লবে কোমল,
অরণ্যে আঁধার। এ কি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয়যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ!
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।

তোমারি মিলনশয্যা, হে মোর রাজন,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্রকান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,
দেহে মনে প্রাণে আমি একি অপরূপ!

নিঃসন্দেহে কবিতাটিতে কবি তাঁর উপলব্ধ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এ বিস্ময় নিসর্গের সঙ্গে আন্তরিক যোগের। এই সম্পর্কের ফলে নিজের অস্তিত্বের মধ্যে লীলার অনুভব এবং পশ্চাৎ এ লীলার সঙ্গে ব্যাপ্ত লীলাময়ের অস্তিত্ব অনুভব। দিবারাত্রিময়ী এবং সূর্যতারকাময়ী প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে নাট্যশালা রূপে বর্ণনা করায় সৃষ্টি সম্পর্কে তত্ত্বভাবনা নয়, সৌন্দর্যরসিকতা ব্যঞ্জিত হয়েছে। বসুন্ধরার শ্যামত্ব, চঞ্চলতা, কাঠিন্য প্রভৃতি বৈচিত্র্যের শুধু অনুভব নয়, তার সঙ্গে কবির সৌহার্দ্যও পরিস্ফুট হয়েছে। কল্প-স্বপ্ন এবং সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল রচনায় নিসর্গের কার্যকারিতা বর্ণনে কবির এই অনুরাগের কারণ স্পষ্ট করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে কাব্যানুভবের স্পর্শও সঞ্চারিত করা

হয়েছে। কবিচিত্তের বিস্ময়াবেগে কবিতাটি আদ্যন্ত স্পন্দিত হয়েছে। 'একি' শব্দটির পুনঃপুনঃ ব্যবহারে বিস্ময়ের আতিশয্য ব্যক্ত করা হয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি প্রাণী যে রহস্যময় পৃথক্ জগৎ এই উপলব্ধি বিস্ময়-রসকেই প্রগাঢ় করেছে। বসুন্ধরার বর্ণনায় ইংরেজি বাক্রীতির অনুসরণে সপ্তম্যন্ত বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষণ-সম্বন্ধ এক ভাষাবৈচিত্র্যের অভ্যুদয় ঘটিয়েছে। 'আকাশ' স্থানে 'ব্যোম' শব্দের ব্যবহারে এবং সূর্য-তারকাকে জ্যোতি এবং দীপ-জ্বালা ব'লে উল্লেখে লক্ষণার মধ্য দিয়ে বিস্ময় ব্যঞ্জিত হয়েছে। শেষাংশে নিজের মধ্যে অসীমত্ব এবং অনন্তত্ব উপলব্ধি পূর্বেকার নিসর্গ-অনুভবের বিস্ময়কে তত্ত্বের দ্বারা খণ্ডিত করছে না, কারণ, এখানেও সৌন্দর্য এবং বিস্ময়ের অনুভবই প্রধান বিষয় হয়েছে। পরিণামে নিজের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভবে ঐ বিস্ময়ের সঙ্গে শান্তরস মিশ্রিত হয়েছে। প্রথম দুই পঙ্ক্তিতে ব্যক্ত নিজলীলার অনুভব উপসংহারে মিলিত হয়ে কবিতাটিকে একটি অখণ্ড গীতিকাব্য ক'রে গঠন করেছে। কবিতাটিতে মধ্যযতি শব্দের মর্যাদাকে কদাচিৎ লঙ্ঘন করেছে এবং পরিমিত অথচ অর্থব্যঞ্জক ধ্বনিসুষমায় সমাবৃত হয়ে কবিতাটি চারুতা লাভ করেছে।

(২) প্রভাতে যখন শঙ্খ উঠেছিল বাজি
তোমার প্রাঙ্গণতলে, ভরি লয়ে সাজি
চলেছিল নবনারী তেয়াগিয়া ঘর
নবীন শিশিরসিক্ত গুঞ্জনমুখর
স্নিগ্ধবনপথ দিয়ে। আমি অন্যমনে
সঘনপল্লবপুঞ্জ ছায়াকুঞ্জবনে
ছিনু শুয়ে তৃণাস্তীর্ণ তরঙ্গিণী-তীরে
বিহঙ্গের কলগীতে সুমন্দ সমীরে।

আমি যাই নাই দেব, তোমার পূজায়—
চেয়ে দেখি নাই পথে কারা চলে যায়।
আজ ভাবি ভালো হয়েছিল মোর ভুল,
তখন কুসুমগুলি আছিল মুকুল—
হেরো তারা সারাদিনে ফুটিতেছে আজি।
অপরাহ্নে ভরিলাম এ পূজার সাজি।

কবিতাটিতে ভগবদ্ভক্তির মত একটি অর্থ থাকলেও তা অতিক্রম ক'রে বর্ণয়িতার জীবনের ছবিই প্রধান হয়ে উঠেছে। সেখানে দেখি, দলে দলে যাত্রী চলেছে পার্থিব অনুরাগ ও সৌন্দর্যের পথ দিয়ে, কিন্তু কবি চলছেন না, নিসর্গ সৌন্দর্যের মধ্যে নিলীন রয়েছেন। নিসর্গের মধ্যে যে অরূপের লীলা চলছে, সে সম্বন্ধে তিনি অনবহিত। তাঁর চিত্ত তখন সম্পূর্ণ বিকশিতই হয় নি। কিন্তু তাতে তাঁর খেদ নেই, কারণ, স্বকীয়ভাবে পাওয়ার যে অপরিসীম আনন্দ তা এখন প্রৌঢ়ত্বে তিনি লাভ করছেন।

বিষয়টি হ'ল এই, কিন্তু চিত্রে গ্রথিত হয়ে তা তথ্য অতিক্রম ক'রে সৌন্দর্যের বাহক হয়েছে। যে-কৌশলে কবি তা করতে পেরেছেন তা উল্লেখ করলে বলা যায়--(১) যাত্রার এবং কবির স্বপ্ননিলীনতার ছবি (২) মুকুল এবং মুকুলের বিকাশ বর্ণন এবং তা দিয়ে লেখক সাজি ভ'রে তুলছেন এই চিত্র। (৩) কয়েকটি অংশে বাচ্যার্থের ক্ষেত্রে ধ্বনির সাহায্য গ্রহণ, যেমন, কৈশোর এবং তারুণ্যের স্থানে 'প্রভাত', অরূপ-প্রেরণার বর্ণনে 'শঙ্খের ধ্বনি', পূর্বেকার কবিতা বোঝাতে 'মুকুল' এবং এখনকার কবিতা বোঝাতে 'কুসুম', পরবর্তী জীবন বোঝাতে 'অপরাহ্ন'—ইত্যাদির ব্যবহার। যাত্রা এবং স্বপ্নবিমুগ্ধতার চিত্রে অনুপ্রাসের প্রয়োগ মাধুর্য বর্ষণ করেছে। প্রকাশের এই সব বক্রতা কবিতাটিকে তথ্যসীমা থেকে সমুত্তীর্ণ করেছে এবং কবির অনুভূত আনন্দলোকে নিয়ে গেছে। কবিতাটির সারল্য এবং প্রসাদগুণও এর প্রকাশ-সম্পদের মধ্যে বিবেচিত হবার যোগ্য।

(৩) তোমার ইঙ্গিতখানি দেখিনি যখন
ধূলিমুষ্টি ছিল তারে করিয়া গোপন।
যখনি দেখেছি আজ, তখনি পুলকে
নিরখি ভুবনময় আঁধারে আলোকে
জ্বলে সে ইঙ্গিত ; শাখে শাখে ফুলে ফুলে
ফুটে সে ইঙ্গিত ; সমুদ্রের কূলে কূলে
ধরিত্রীর তটে তটে চিহ্ন আঁকি ধায়
ফেনাঙ্কিত তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
স্ফুরিত সে ইঙ্গিত ; শুভ্রশীর্ষ হিমাদ্রির
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঊর্ধ্বমুখে জাগি রহে স্থির

শুদ্ধ সে ইঙ্গিত। তখন তোমার পানে
বিমুখ হইয়াছিনু কী লয়ে কে জানে!
বিপরীত মুখে তারে পড়েছিনু তাই
বিশ্বজোড়া সে লিপির অর্থ বুঝি নাই।

অর্থের দিক থেকে কবিতাটি পূর্বকবিতার সদৃশ। কিন্তু সেখানে এর কাব্য-বৈচিত্রী নিহিত নেই। এর চমৎকার ফুটেছে কবি-উপলব্ধ 'ইঙ্গিত'-এর প্রকাশ-বৈচিত্র্য বর্ণনে। জলে, ফুটে, চিহ্ন আঁকি ধায়, জাগি রহে প্রভৃতি ক্রিয়ার বক্রতা লক্ষণীয়, আর সেই সঙ্গে 'ফেনাঙ্কিত তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়' প্রভৃতি নিসর্গ-বর্ণনে যে সাংকেতিকতা ফুটেছে তা-ও অনুধাবনযোগ্য। কয় চরণে প্রতিটি বাক্যের শেষে 'সে ইঙ্গিত' শব্দের ব্যবহারে ইঙ্গিতকে শুধু অতিশয়িত ক'রেই তোলা হয় নি, এ যে প্রত্যক্ষ সত্য তা বোঝানো হয়েছে। ইঙ্গিতকে জীবন্ত বা Personify-ও করা হয়েছে। এইভাবে শুধু বর্ণনবৈচিত্র্যেই এই কাব্যখণ্ডে অসামান্যতা বিচ্ছুরিত হয়েছে।

(৭) মর্ত্যবাসীদের তুমি যা দিয়েছ প্রভু,
মর্ত্যের সকল আশা মিটাইয়া তবু
রিক্ত তাহা নাহি হয়। তার সর্বশেষ
আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশ।
নদী ধায় নিত্যকাজে, সব কর্ম সারি।
অন্তহীন ধারা তার চরণে তোমারি
নিত্য জলাঞ্জলিরূপে ঝরে অনিবার।
কুসুম আপন গন্ধে সমস্ত সংসার
সম্পূর্ণ করিয়া তবু সম্পূর্ণ না হয় —
তোমারি পূজায় তার শেষ পরিচয়।
সংসারে বঞ্চিত করি তব পূজা নহে।
কবি আপনার গানে যত কথা কহে
নানা জনে লয় তার নানা অর্থ টানি,
তোমাপানে ধায় তার শেষ অর্থখানি।

কবিতাটি অর্থগৌরব-প্রধান, সৌন্দর্য-প্রধান নয়। কবির ভাবুকতায় স্বকীয়ত্ব থাকলেও প্রকাশের মধ্যে তা অপরূপ হয়ে ধরা দেয় নি। ভাবের বিবৃতিই হয়েছে কবির উদ্দেশ্য। এর ভাবার্থ এই : লৌকিক প্রয়োজন সাধনের ক্ষেত্রে

মানবসত্তা এবং জীবসত্তা এক, কিন্তু মানুষের বুদ্ধি, চিন্তা, কল্পনা মানুষের জৈব এবং সাংসারিক প্রয়োজন সমাধা ক'রেই নিঃশেষিত হয় না। মানুষ সুদূরের অন্বেষণ করে, কাব্য-চিত্র-সংগীতে আত্মনিয়োগ করে। তার এই সব চেষ্টা প্রয়োজনের গণ্ডীতে সীমিত নয়। এখানেই সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমের দিকে মানুষের পক্ষ-বিস্তার। নিসর্গের মধ্যেও নানাভাবে এই অতিরিক্ততার চিহ্ন পরিস্ফুট। কবির কাব্য মানুষের প্রয়োজনে লাগে। এতে তার সৌন্দর্যতৃষার তৃপ্তি ঘটে, দুঃখতাপের মধ্যে, আশা এবং শান্তিও আনে। কিন্তু কবির কাব্য এর অতিরিক্ত কিছুও সূচিত করে। তা থেকে বোঝা যায়, কোন্ অদৃশ্য নিয়মের বশবর্তী হয়ে মানুষ বিশ্বের সঙ্গে মিলতে চাইছে, নিসর্গ এবং মানুষের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করতে চাইছে। কাব্য-চিত্র-গীতের রচনা এবং প্রভাবও স্রষ্টা এবং তার লীলা-রহস্যের দিকেই অঙ্গুলিসংকেত করে।

এই বিষয়গুলি বোঝাতে কবি নদী এবং ফুলের উপমান-বাক্য প্রয়োগ করেছেন। উপমানগুলিও ঐ প্রয়োজনই সিদ্ধ করেছে, স্বকীয়ভাবে কোনও সৌন্দর্যলোক গঠন করছে না। 'সংসারে বঞ্চিত করি তব পুজা নহে'—এই বাক্যার্থ কবিতাটির মূল প্রস্তাবের সঙ্গে সংগতিহীন।

(৫) তুমি সর্বাশ্রয়, এ কি শুধু শূন্যকথা ?
ভয় শুধু তোমা 'পরে বিশ্বাসহীনতা
হে রাজন্। লোকভয় ? কেন লোকভয়
লোকপাল ? চিরদিবসের পরিচয়
কোন্ লোক সাথে ? রাজভয় কার তরে
হে রাজেন্দ্র ? তুমি যার বিরাজ অন্তরে
লভে সে কারার মাঝে ত্রিভুবনময়
তব ক্রোড়, স্বাধীন সে বন্দিশালে।

মৃত্যুভয়

কী লাগিয়া হে অমৃত ? দুদিনের প্রাণ
লুপ্ত হলে তখনি কি ফুরাইবে দান—
এত প্রাণদৈন্য, প্রভু, ভাণ্ডারেতে তব ?
সেই অবিশ্বাসে প্রাণ আঁকড়িয়া রব ?
কোথা লোক, কোথা রাজা, কোথা ভয় কার !
তুমি নিত্য আছ, আমি নিত্য সে তোমার।

এ কবিতাটি ভাবার্থ-সমৃদ্ধ হ'লেও প্রকাশরীতির অভিনবত্বে সমুজ্জ্বল হয়ে কাব্য-চমৎকার সৃষ্টি করতে পেরেছে। লোকভয়, রাজভয়, এমন কি মৃত্যু-ভয়ও অকর্তব্য, কারণ, বিধাতা রয়েছেন। তাঁর প্রতি অবিশ্বাসই আমাদের যাবতীয় ভয়ের কারণ। কবি নিজে এই বিশ্বাসে স্থির হয়ে সমস্ত ভয় ত্যাগ করতে চান। কোথাও শুধু প্রশ্ন, কোথাও প্রশ্ন-বক্রোক্তি অলংকারে এবং সমুচিত প্রত্যুত্তর নির্মাণে কবি তাঁর বক্তব্যকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছেন। 'লোকপাল', 'রাজেন্দ্র' এবং 'অমৃত' ঈশ্বরের এই তিনটি বিশেষণ লোকভয়, রাজভয় এবং মৃত্যুভয়ের পাশাপাশি গ্রথিত হয়ে বৈপরীত্যের চমৎকার সংঘটন করেছে। 'কোথা লোক' ইত্যাদিতে তীব্র নিষেধের ভঙ্গিও সুন্দর হয়েছে। সমস্ত কবিতাটি ব্যাপ্ত ক'রে কবির নিতান্ত ভগবৎ-নির্ভরের ভাব শান্তরসময় বৈচিত্র্য এনেছে।

(৬) শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘমাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমেষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

কবিতাটিতে যুদ্ধবিশেষের উপর কবির তীব্র বিরাগ ও প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম চরণে নিসর্গের সংকেত-চিত্র দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধকে হিংসার উৎসব ব'লে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপক গঠন করায় নরহত্যা বিষয়ে পশ্চিমের উল্লাসের জঘন্যতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে আধুনিক রাষ্ট্র—স্বার্থময় সভ্যতাকে কবি ধিক্কার দিয়েছেন। এখানেও রূপক এবং

personification-এর চারুতা। দ্বিতীয় অংশে প্রায়-নিরলংকার উক্তিতেই সুতীব্র নিন্দাবাক্য প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। শেষাংশে ব্যঞ্জনায় পশ্চিমের একশ্রেণীর কবির নিন্দা করা হয়েছে। কবিতাটি যদিও ভাবমাত্রের উদ্বোধক হয়েছে, তবু সাহসিকতাময় যুদ্ধ-বিরোধিতার ভাব আমাদের চিত্তে অভিনব ব'লে এবং বীর, রৌদ্র, ভয়ানক প্রভৃতি মূল ভাবগুলির এবং আনুষঙ্গিক ব্যভিচারী ভাবগুলির সামঞ্জস্যময় মিশ্রণ ঘটেছে ব'লে কাব্য-চমৎকারের উদয় হয়েছে। শব্দ ও বাক্যের ওজোগুণ ভাবার্থকে অভিপ্রেত রূপ দিতে সাহায্য করেছে।

(৭) হে অনন্ত, যেথা তুমি ধারণা-অতীত
সেথা হতে আনন্দের অব্যক্ত সংগীত
ঝরিয়া পড়িছে নামি, অদৃশ্য অগম
হিমাদ্রিশিখর হতে জাহ্নবীর সম।
সে ধ্যানাভ্রভেদী শৃঙ্গ, যেথা স্বর্ণলেখা
জগতের প্রাতঃকালে দিয়েছিল দেখা
আদি অন্ধকার-মাঝে, যেথা রক্তচ্ছবি
অস্ত যাবে জগতের শ্রান্ত সন্ধ্যারবি,
নব নব ভুবনের জ্যোতির্বাষ্পরাশি
পুঞ্জ পুঞ্জ নীহারিকা যার বক্ষে আসি
ফিরিছে সৃজনবেগে মেঘখণ্ডসম
যুগে যুগান্তরে—চিত্তবাতায়ন মম
সে অগম্য অচিন্ত্যের পানে রাত্রিদিন
রাখিব উন্মুক্ত করি হে অন্তবিহীন।

কবি বিস্ময়সহকারে অচিন্ত্য অনন্তশক্তির উপর নির্ভরশীলতা জ্ঞাপন করছেন। এর কাব্য-চমৎকার নির্ভর করছে কয়েকটি কল্পনার উপর। প্রথম, অন্ধকার-ময় অবস্থার মধ্য থেকে আলোকোজ্জ্বল সৃষ্টির প্রত্যূষ এবং সেই আলোকের বিলীনতার কল্পনা। দ্বিতীয়, নীহারিকা থেকে অগণিত পৃথিবীর সৃষ্টিকল্পনা। দ্বিতীয়টি নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানভিত্তিক, কিন্তু বিস্ময়োপলব্ধি কবির স্বকীয়। অনন্ত-শক্তি কেন কবির সর্বথা চিন্তনীয় হবে, তার কারণ সম্পর্কে যে যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে তা কাব্যিক, ফলতঃ কবির কাব্যভাবনার মূলেই অনন্ত তাঁর কাছে ধরা দিয়েছেন। এইভাবে কবিতাটিতে কাব্যরস প্রাধান্যলাভ করেছে।

জ্ঞানের দিক থেকে যা অচিন্ত্য তাকে কবি প্রারম্ভেই আনন্দময় রূপে দেখেছেন। কিন্তু এই অংশের উপমেয়ে 'অদৃশ্য অগম হিমাদ্রিশিখর হতে' ইত্যাদি খুব সাধারণ হয়েছে, অভিনব কোনও চিত্রসম্পদের কারণ হয় নি।

(৮) একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতিক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধে গীতে
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারি ভিতে।
সেথা উষা ডান হাতে ধরি স্বর্ণথালা
নিয়ে আসে একখানি মাধুর্যের মালা
নীরবে পরায়ে দিতে ধরার ললাটে,
সন্ধ্যা আসে নম্রমুখে ধেনুশূন্য মাঠে
চিহ্নহীন পথ দিয়ে লয়ে স্বর্ণঝারি
পশ্চিম সমুদ্র হতে ভরি শান্তিবারি।
তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ,
অপার সঞ্চারক্ষেত্র, সেথা শুভ্র ভাস;
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই—নাই নাই বাণী।

ব্রহ্ম এক ধারণায় অজ্ঞেয় এবং নির্বিশেষ, সুতরাং আমাদের প্রতি নিরপেক্ষ, অন্য ধারণায় তিনি প্রকাশমান, সুন্দর, কল্যাণময় এবং সকলের আশ্রয়। এই দুই ধারণা পরস্পর-বিরুদ্ধ, কিন্তু কবির কাব্যে এ দু'য়ের বিরোধ নেই। নিঃসন্দেহে কবি কাব্যই লিখছেন, তত্ত্বপ্রচার করছেন না। 'আকাশ' এবং 'নীড়' এই শব্দ দুটি ব্যঞ্জনা বহন করছে। নীড়ের অর্থাৎ সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য দেখাতে গিয়ে উষা এবং সন্ধ্যার সমাসোক্তিময় দুটি চিত্রের গ্রন্থন এই অংশটিকে কাব্যালোকে সমুত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছে। 'আত্মার আকাশ'-এর বৈশিষ্ট্য কবির স্বকীয় উপলব্ধিতে আসে কিনা সন্দেহ থাকলেও এবং কবি উপনিষদের ভাবের দ্বারা চালিত হয়েছেন, অর্থাৎ 'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং' এবং 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' প্রভৃতি মন্ত্রের অনুকরণ মাত্র করছেন এমন মনে করা গেলেও কবির নিষ্ঠা এবং ভাবুকতায় সন্দেহের কিছু নেই। 'নাই' শব্দের বহুল ব্যবহারের দ্বারা তত্ত্বের চেয়ে চমৎকারই বেশি

প্রকাশ পেয়েছে। কবিতাটিতে সংযত ভাব এবং প্রসাদ-গুণযুক্ত অথচ সংহত বাণীর প্রকাশ লক্ষণীয়।

(৯) দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল,
হে ইন্দ্র, হৃদয়ে মম। দিক্‌চক্রবাল
ভয়ংকর শূন্য হেরি, নাই কোনো খানে
সরস সজল রেখা—কেহ নাহি আনে
নববারিবর্ষণের শ্যামল সংবাদ।
যদি ইচ্ছা হয় দেব, আনো বজ্রনাদ
প্রলয়মুখর হিংস্র ঝটিকার সাথে।
পলে পলে বিদ্যুতের বক্র কষাঘাতে
সচকিত করো মোর দিক্-দিগন্তর।
সংহর সংহর, প্রভো, নিস্তব্ধ প্রখর
এই রুদ্র, এই ব্যাপ্ত, এ নিঃশব্দ দাহ
নিঃসহ নৈরাশ্যতাপ। চাহো, নাথ চাহো,
জননী যেমন চাহে সজল নয়ানে
পিতার ক্রোধের দিনে সন্তানের পানে।

কবিতাটি কবির নৈরাশ্যময় একটি মানসিক মুহূর্তে, সেই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের আগ্রহে লেখা। এর ভাবার্থ নৈবেদ্যের অন্যান্য কবিতার ভাবার্থ থেকে পৃথক। বস্তুতঃ কোনও তত্ত্ব বা আদর্শের সঙ্গে সংলগ্ন নয় ব'লে এর মধ্যে সহজ আত্মভাষণের মহিমাই লক্ষণীয় হয়েছে। ফলে কবিতাটি আবেগে মুখরিত হয়েছে এবং ভাষাভঙ্গিতে উচ্ছ্বাসেরও চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে।

মানসের বিমূঢ়তা যে কবির কাছে অসহনীয় হয়েছে তার পরিচয় প্রথমেই—'দীর্ঘকাল, অতি দীর্ঘকাল' এই পুনরাবৃত্তিতে। ইন্দ্রকে আহ্বান, ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা ব'লে। 'যদি ইচ্ছা হয় দেব', ইত্যাদি বর্ণনায় ব্যঞ্জনাক্রমে তীব্র শোক দুঃখের দ্বারা নিজচিত্তের উদ্বোধন কবি কামনা করছেন। এই রুদ্র, এই ব্যাপ্ত ইত্যাদিরূপ বর্ণনায় নৈরাশ্যবিষয়ে নিতান্ত অসহনীয়তার ভাব ব্যক্ত হয়েছে। শেষ পঙ্‌ক্তির 'পিতার ক্রোধের দিনে' ইত্যাদিতে পিতা শব্দে কা'কে লক্ষ্য করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। 'চাহো, নাথ চাহো' ইত্যাদির মধ্যে 'নাথ' শব্দে যদি ইন্দ্রকেই লক্ষ্য করা যায় তাহ'লে ধরতে হয় যে, কবি এখানে বৈদিক দেবতাবাদের অনুসরণ করছেন। আসলে কাব্যসৌন্দর্যের

জন্য অনাবৃষ্টি এবং ইন্দ্রের কল্পনা করাতেই শেষাংশে এই অসংগতি ও অস্ফুটতা দৃষ্ট হয়।

(১০) জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে-ক্ষণে
এ আশ্চর্য সংসারের মহানিকেতনে,
সে-ক্ষণ অজ্ঞাত মোর। কোন্ শক্তি মোরে
ফুটাইল এ বিপুল রহস্যের ক্রোড়ে
অর্ধরাত্রে মহারণ্যে মুকুলের মতো?
তবু তো প্রভাতে শির করিয়া উন্নত
যখনি নয়ন মেলি নিরখিনু ধরা
কনককিরণ-গাঁথা নীলাম্বর-পরা,
নিরখিনু সুখে-দুঃখে খচিত সংসার,
তখনি অজ্ঞাত এই রহস্য অপার
নিমেষেই মনে হল মাতৃবক্ষসম
নিতান্তই পরিচিত, একান্তই মম।
রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি
ধরেছে আমার কাছে জননী-মূরতি।

এই কবিতাটির মধ্যে স্বানুভব দিয়ে কবি সৃষ্টির এবং আমাদের অস্তিত্বের একটি আনন্দময় অর্থ প্রতিভাত করেছেন। যাকে আমরা জানি না, যা রহস্যে আবৃত তা আমাদের কাছে ভয়ংকর। জন্মক্ষণে পৃথিবী আমাদের অপরিচিত, কিন্তু মুহূর্তপর থেকেই একান্ত নির্ভর হয়ে ওঠে। তারপর সুখদুঃখময় সংসারে আনন্দবেদনার লীলার অনুভব ঘটতে থাকে, পৃথিবীকে অপূর্ব সুন্দর লাগে। যে ছিল অনাত্মীয়, অপরিচয়মূলক ভীতির কারণ, সে-ই পরমাত্মীয় হয়ে ওঠে। কবি বিস্ময়সহকারে এই বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন এবং আমাদের চিত্তেও তাঁর এই উপলব্ধির প্রতি সহানুভব অনায়াসেই জাগিয়ে তুলেছেন। কবির ব্যাপক পৃথিবী-প্রীতির স্পর্শেও কবিতাটি রমণীয় হয়ে উঠেছে।

কবিতাটির ভাষারীতিতে প্রসাদ, মাধুর্য এবং ওজঃ তিনটি গুণেরই সম্মিলিত প্রকাশ ঘটেছে এবং কয়েকটি অনায়াস-উদ্ভূত অলংকারবৈচিত্র্য কবির বিস্ময়কে রমণীয়তর করেছে। প্রথম, কবির অজ্ঞাত অনাত্মীয় পৃথিবীতে আবির্ভাবের স্বরূপ প্রকাশ করতে একটি সার্থক উপমার প্রয়োগ—'অর্ধরাত্রে মহারণ্যে মুকুলের মতো।' মুকুলের উপমান পরপঙ্‌ক্তিতেও অনুসৃত

হয়েছে—'প্রভাতে শিব কবিয়া উন্নত' ইত্যাদি। তারপর পৃথিবীর সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য নারীর রূপ সমারোপ—'কনককিরণ-গাঁথা নীলাম্বর-পরা'। 'মাতৃ-বক্ষসম' ইত্যাদি বর্ণনায় পৃথিবীর সঙ্গে কবির সুগভীর স্নেহ-সম্পর্ক ব্যঞ্জিত হয়েছে। শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে অতিশয়ের চমৎকার ঘটেছে।

'নৈবেদ্য' পর্যন্ত কাব্যসৌন্দর্যের এক অধ্যায়ের শেষ বলা যায়। সংস্কৃতের প্রবর্তনায় ধ্বনিময় শব্দাবলীর সঞ্চয়ন, রীতিতে প্রস্ফুট গুণসন্নিবেশ, প্রাচীন পরিবেশের চমৎকার-সঞ্চার, ক্ষণিক প্রেম সৌন্দর্য ও নিসর্গপ্রীতির চরমতার অভিব্যক্তি, জাতীয় ভাবের উদ্বোধন প্রভৃতি একালের কবিনির্মাণের বিষয়বৈচিত্র্যের কারণ হয়েছে। এর পর স্বাদে স্পষ্টতঃ পৃথক একটি পর্যায়ের দিক আলোচিত হচ্ছে।

সংকেতিত বাণীর সৌন্দর্য

'কথা' ও 'কাহিনী' কাব্যের পর থেকে অক্ষরমাত্রিক ছন্দে দীর্ঘ শিল্পগ্রন্থন বিরল হয়ে এসেছে এবং নৈবেদ্যের পর থেকে এ-ছন্দে রচনার প্রবণতা বিশেষ নেই বললেই চলে। কবির রচনার সৌন্দর্য-স্বরূপ অনুধাবনে এটি একটি লক্ষণীয় বিষয়। 'উৎসর্গ'-এ অক্ষরমাত্রিকে রচনার কিছু অবশেষ আছে মাত্র, 'খেয়া'তে একটিও নেই। তারপর থেকে তো গীতি-উৎসারের পর্ব, যার মধ্যে অক্ষরমাত্রিকে নির্মাণ ক্বচিৎ দেখা যায়।

নৈবেদ্যকাব্যের উপনিষৎ-সম্পর্ক থেকে আগত, সুতরাং নীতিমূলক ভগবৎ-প্রসঙ্গের সঙ্গে স্বকীয়ভাবে ঈশ্বরানুভবের একটি সংকীর্ণ প্রস্তুতি-পর্ব চলেছিল। উৎসর্গে এর পরিচয় পাওয়া যায়। নিসর্গ-সৌন্দর্যই কবিচিত্তে অলক্ষ্যগোচর কোনও সত্তার ইঙ্গিত বহন করেছে। উৎসর্গের কয়েকটি কবিতায় এর পরিচয় রয়েছে। তারপর খেয়া থেকে কিছুকাল ধ'রে এই কল্পিত সত্তার আবির্ভাব এবং অন্তরগত-পরিচয়ের রহস্যানুভব-প্রকাশের পালা চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়ার্থের সঙ্গে প্রকাশরীতিতেও পার্থক্য ঘটেছে এই পর্যায়ের রচনায়।

গীতিকাব্য মাত্রেই যেহেতু বস্তুর চেয়ে সুর বা ভাবের ব্যঞ্জনায় অধিকতর মনোযোগ দেয়, সেইহেতু শব্দার্থে এই ব্যঞ্জনাশক্তি অর্পণ করবার জন্যে নানা-ভাবে সংকেতের সৃষ্টি অনিবার্য হয়ে ওঠে। নির্দিষ্ট কোনও অর্থের মধ্যস্থতা স্বীকার না ক'রে শব্দ ও বাক্যের গুণ ও রীতির বক্রতায় গীতিকবিতা বহুক্ষেত্রে কল্পসৌন্দর্যলোকে পৌঁছে দিতে চায়। গীতিকবিতা যদি যথার্থ গীত হয় তাহ'লে কেবল সুরের সাহায্যেই এই অঘটন ঘটাতে পারে। আর সুরে প্রযোক্তব্য না হ'লে অর্থহীন শব্দ এবং অনুপ্রাসের রমণীয় বন্ধনের সাহায্যেই অভিপ্রেত সুদূরের ব্যঞ্জনা দেওয়ার প্রয়াস করে। শব্দের রমণীয়তা কখনও কখনও গীতে সুরের অতিরিক্ত অলংকাররূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের গানে যেখানে কথা এবং সুরের সমান আধিপত্য সেখানে ভাষার বিভিন্ন অলংকারই গীতরূপ কাব্যকে সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ করেছে। আমাদের প্রাচীন গীতের মধ্যেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটেছে। কীর্তনের শব্দমন্ত্র আমাদের সুপরিচিত। আর বাউল-সংগীতের শব্দের অর্থসংকেতের সম্পদও

নগণ্য নয়। নিঃসন্দেহে কবি বাঙ্‌লা এবং হিন্দি প্রাচীন কাব্যাঙ্গ গীত থেকে কথা ও সুরের হরগৌরী-মিলনের বিষয়ে প্রেরণালাভ করেছিলেন। আর সুরকারের উপর কবি ব'লেই এই বিদগ্ধতা তাঁর মজ্জাগত ছিল। ফলে তাঁর রচিত এই শ্রেণীর গীতে, যেখানে কবিতার মতই শব্দার্থ-চমৎকার উদ্ভাসিত হয়েছে, কাব্যানন্দের স্বাদ পাওয়া যায় সুর-প্রযুক্তির পূর্বেই। সেই ধরনের কিছু গীত আমাদের এই অধ্যায়ে আলোচ্য হবে।

কবির সংকেতবাক্যময় গীতের উৎসার তাঁর অরূপদর্শনের সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত বলা চলে। গীতাঞ্জলি এবিষয়ে যদ্যপি একটি প্রধান দৃষ্টান্ত, কাব্যধর্মী গীত এর পূর্বেকার রচনাতেও কিছু রয়েছে, আর পরবর্তী রচনায় যেখানে বিশেষভাবে নিসর্গ কবির বর্ণনে অবলম্বিত হয়েছে সেখানে এর সংখ্যা হয়েছে সুপ্রচুর। অরূপ-দর্শনের ভাবে এবং রীতিতে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর-ভাবুক প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সাধকদের থেকে স্বতন্ত্র। যদিও একথা ভাবতে বাধা নেই যে, তিনি খ্রীস্টীয় মিস্‌টিক্‌দের কাছ থেকে দুঃখবরণের উৎসাহ এবং প্রাচ্য মিস্‌টিক্‌দের কাছ থেকে ভজনের এবং সন্ধানতৎপরতার ভাবের স্পর্শ পেয়েছিলেন, তবু তাঁর উপলব্ধ অরূপ এসব থেকে স্বতন্ত্র। এ তাঁর কাব্যোপলব্ধিরই প্রকারবিশেষ, সেই সূত্রেই সমাগত, ফলতঃ জীবনের ও নিসর্গের যাবতীয় প্রকাশ থেকে অভিন্ন। তাঁর অরূপ বিচিত্ররূপে প্রকাশময় বলেই এবং নিসর্গ-কোমলতা অথবা তার বিপরীত অভিব্যক্তির মধ্যে পরিদৃষ্ট ব'লে অরূপসম্পর্কহীন সাধারণ কাব্যের মতই অরূপ-সম্পর্কিত কবিতাগুলি আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-রচনায় ঈশ্বর থেকেও নেই, অর্থাৎ তার পূর্বদৃষ্ট ঐশ্বরিকতা বিলুপ্ত, কিছু কিছু ভাবের আভাস রয়েছে এই মাত্র। কবির অরূপ রূপময় জীবনময়, নিসর্গলীলাবিহারী, কাব্যমূর্তি বিশেষ। কবির গীতাঞ্জলি-তুল্য রচনাদৃষ্টে তাঁকে যাঁরা মিস্‌টিক ব'লে অভিহিত করেন তাঁরা তাঁর উপর অবিচার করেন, তাঁরা কাব্য-চমৎকারের বিষয়ে উদাসীনই থাকেন। সর্বত্র কাব্যার্থেই রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়। ভারতভূমিতে বিশেষতঃ বাঙ্‌লায় ভগবৎ-প্রেরণা বা শুদ্ধ অধ্যাত্ম-সাধনার ছন্দোবদ্ধ রচনার ও গীতের ফসল যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ যদি কেবল ঐ ভাবুকতাকেই সমৃদ্ধ করতেন তিনি এতখানি প্রিয় হতেন কিনা সন্দেহ। তাঁর কোনও কোনও কাব্য ও গীতে ভগবৎ-প্রসঙ্গ থাকলেও কাব্যের সঙ্গে মিলেই তার আবেদন এত রমণীয় হয়েছে। তা-ছাড়া তাঁর অধ্যাত্ম-উপলব্ধির বৈশিষ্ট্য (ঐ নিসর্গ-চমৎকার এবং জীবন-উপভোগের রমণীয়তার অভিব্যক্তি) তাঁকে

ভগবৎ-প্রেমিক সুরকারদের থেকে পৃথক্ ক'রেই তুলেছে। তথাপি রবীন্দ্রের ভগবৎ-আভাসের কবিতাগুলি যদি কোনও পাঠককে ভগবদভিমুখী করতে সহায়তা ক'রে থাকে আমরা আনন্দিতই হব। কিন্তু রুচি অনুসারে বর্তমানে আমরা শব্দার্থময় কাব্য-সৌন্দর্যের উপাসক মাত্র।

'উৎসর্গ' থেকে কবিকল্পলোকের আকাশকুসুম-চয়নের কয়েকটি উদাহরণ পরীক্ষা করা যাক। **'মোর কিছু ধন আছে সংসারে, বাকি সব ধন স্বপনে'** —এই কবিতাটি কবির স্বপ্নচারিতার নির্দেশক একটি বিশিষ্ট কবিতা। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে সেই বিষয়টিমাত্র জানানো হয়েছে। এর পর 'ওগো কোথা মোর আশার অতীত' 'রাজপথ দিয়া আসিয়ো না তুমি' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রমণীয় সৌন্দর্য ব্যক্ত হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কবি যে-নারীসত্তার অভিসার কামনা করছেন, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষতার কোনও সংস্রব নেই। 'আশার অতীত' 'পরশচকিত' 'স্বপনবিহারী' 'বিদেশী' প্রভৃতি বিশেষণযোগে কবি যাকে আহ্বান করছেন, সে চেনা-অচেনার মধ্যবর্তী ছায়ালোকের অধিবাসিনী এক কল্পসৌন্দর্যসত্তা। আহ্বানের মধ্যে ব্যাকুলতা, ঔৎসুক্য, প্রতীক্ষা প্রভৃতির ভাববিলাসের বীচিবিক্ষেপ এর পূর্বরাগময় সৌন্দর্যবিশেষকে পরিপুষ্ট করতে সাহায্য করেছে। 'নিবিড় নীরব চরণে' 'বসনে প্রদীপ নিবারি' 'প্রদোষের ছায়াতল দিয়ে' প্রভৃতির মধ্যে রমণীর রমণীয় অভিসার প্রতীক্ষিত হয়েছে সত্য, কিন্তু সে-অভিসার বাস্তবের নয়, স্বপ্নের। পূর্বজ্ঞাত অভিসার-চিত্র কবির প্রতীক্ষমাণ স্বপ্নব্যাকুলতাকে রমণীয় রূপ দিতে সাহায্য করেছে মাত্র। কবিতাটির মধ্যে কবির ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ কোনও প্রণয়বাসনার ব্যর্থতাই মর্মরিত হয়েছে এমন মনে করা যায় না, স্বপ্নবিলাসের আতিশয্য এ-পক্ষে বাধা। স্বপ্নচারণের স্বভাবের মূলে প্রত্যক্ষ বিরহস্মৃতি কাজ করেছে এমন ব্যাপার মনস্তাত্ত্বিক সত্য হলেও এর কাব্যপরিণাম স্বাদে বিভিন্ন হয়েছে। বিশেষ স্থায়িত্বলাভ করেছে একটি নির্বিশেষ বিরহমিলন-বিকারে। প্রিয়াবিরহ এবং অনির্দেশ্য সুদূরের অনুসন্ধান মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণে জড়িত-মিশ্রিত হ'লেও কাব্যসৌন্দর্যে পৃথক হয়ে পড়েছে। উৎসর্গের এই স্বপ্নময় সত্তার প্রতি অনুরাগ কবির পূর্বেকার নিরুদ্দেশ-যাত্রার সমশ্রেণীর, এখানে স্বপ্ননিলীনতা অধিক, আর্তির তীব্রতা অবিদ্যমান এবং নারীরূপবিমণ্ডন অপসৃত হয়ে সৃষ্ট সৌন্দর্যের অন্তশ্চর একটি সাধারণ সত্তার দিকে আগ্রহ ক্রমশঃ প্রকট হয়েছে।

উপরে আলোচিত কবিতাটিতে এবং 'আপনারে তুমি করিবে গোপন কী করি' প্রভৃতির—

আজি আসিয়াছ কৌতুকবেশে
মানিকের হার পরি এলোকেশে
নয়নের কোণে আধো হাসি হেসে
এসেছ হৃদয়পুলিনে।
ভুলিনে তোমার বাঁকা কটাক্ষে
ভুলিনে চতুর নিঠুর বাক্যে ভুলি নে।

পঙ্‌ক্তিগুলিতে নারীরূপ এবং নারীপ্রণয়ের আভাস ব্যক্ত হয়ে মাধুর্যময় আদিরসাত্মক চারুতার উদ্ভব ঘটালেও, দেখা যায়, অন্যত্র এই চারুতা অতিক্রান্ত হয়ে ভিন্ন ধরনের স্বাদবিশেষের আনন্দ আসছে। রমণীরূপের আভাস থাকলেও মধুররসের কোনও বৈচিত্র্যেই আনন্দপরিণাম ঘটছে না, যেমন,—

জ্যোৎস্নানিশীথে পূর্ণ শশীতে
দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে,
আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায় লখিতে।
বক্ষ সহসা উঠিয়াছে দুলি,
অকারণে আঁখি উঠেছে আকুলি,
বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছ চরণ চকিতে।

এখানে স্বপ্নবিলাসী কবির অনির্দেশ্য স্বপ্নচারণের সঙ্গী হয়েই আমাদের আনন্দ। ক্রমশঃ যে-সত্তার অনুসন্ধানে কবি এলেন, তা নারীরূপাশ্রয় ত্যাগ ক'রে নির্বিশেষ একটি সৌন্দর্যসত্তায় যে স্থিতিলাভ করেছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বিখ্যাত **'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসি'** প্রভৃতি। নিঃসন্দেহে এই নাতি-বিস্তৃত প্রসাদগুণসমন্বিত এবং গীতসৌন্দর্যপ্রধান কবিতাটি অর্থে এবং বিন্যাসে অপ্রাপ্য সুদূরের প্রতি সার্বজনীন অভিলাষ প্রতিধ্বনিত করেছে। এর প্রথম স্তবকে ব্যাকুলতা, দ্বিতীয় স্তবকে অনুরাগ এবং শেষ স্তবকে রূপাভিলাষ ব্যক্ত হয়েছে। আর 'ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর' ইত্যাদি বিচিত্রভাবে ধ্রুবপদের মত আবৃত্ত হয়ে এর করুণ ব্যাকুলতা ঘনীভূত করেছে। এর মিল-নির্মাণের মধ্যেও কোমল সৌন্দর্যের রক্ষণ লক্ষণীয়। এর আহ্বানের কোমলতা-ব্যঞ্জক ওগো, হে এই অব্যয় দুটির ব্যবহার, পরশ বাঁশরি পিয়াসি —এই কেবল-পদ্যে-প্রযোক্তব্য শব্দের এবং ডানা, ঠাঁই, পাসরি, প্রভৃতি

মৌখিক ভাষার শব্দের প্রয়োগও অকপট অভিব্যক্তির প্রকাশক হয়েছে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সুকুমার শৈলীতে প্রকাশিত হয়ে কবিতাটি গীতের রাগিণীর অনুরূপ বেদনাময় ব্যাকুলতার বিস্তার ঘটিয়েছে।

এই কাব্যিকতারই কতকটা তত্ত্বরূপ 'না জানি কারে দেখিয়াছি' প্রভৃতি কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। 'উৎসর্গ'-এর কবিতাগুলিতে সুদূরের আকর্ষণ অভিনবত্বের স্পর্শ এনেছে এবং কবি রূপ থেকে মর্মের গহনে আমাদের আকর্ষণ করছেন ঠিকই, কিন্তু যে-রূপকাশ্রয়ী বর্ণনা এবং শব্দার্থ-সংকেত মর্মমুখিতাকে বিবৃত না ক'রে স্বাদপ্রধান সৌন্দর্যরসে পাঠকের চিত্তকে ডুবিয়ে রাখে তা উৎসর্গে নেই, খেয়া এবং গীতাঞ্জলিতে আছে। আবার, গীতিমাল্যে গীতালিতে কথাসৌন্দর্যের চেয়ে যেখানে সুরের উপর কবি বেশি নির্ভর করেছেন, সেখানে সাংকেতিকতা থাকলেও কাব্যসৌন্দর্যের ক্ষেত্রকে অতিক্রম করছে। উৎসর্গের কতকগুলি কবিতা কেবল নৈবেদ্যের ভাবানুষঙ্গ রক্ষা করেছে মাত্র, যেমন, 'হে বিশ্বদেব মোর কাছে তুমি' অথবা 'আজ মনে হয় সকলেরই মাঝে তোমারেই ভালোবেসেছি' প্রভৃতি। তার অধিক সৌন্দর্য-মূল্য এগুলির নেই। এরই মধ্যে 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া' (**প্রবাসী**) কবিতাটি কবির সুদূরস্পৃহা এবং স্থায়ী বাসনারূপে নিবদ্ধ পৃথিবীপ্রীতিকে একসূত্রে আবদ্ধ ক'রে অভিনব রমণীয়তার উদ্ভব করেছে। চেনার মধ্যেও অচেনাকে, নিকটের মধ্যেও দূরকে কল্পনা করার এই নবীন অর্থ পরিস্ফুট হয়েছে প্রথম পঙ্‌ক্তিগুলিতে এবং 'আপনার যারা আছে চারিভিতে, পারিনি তাদের আপন করিতে' এবং 'তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে, দূরে এসে চাই ঘর বাঁধিবারে' প্রভৃতির মধ্যে, এমনকি কবিতাটির প্রথমার্ধে সর্বত্র। কবির প্রিয় এই অচেনা এবং সুদূর কবিতাটির শেষার্ধে কবির অন্তরঙ্গতা লাভ করেছে এবং নৈবেদ্য কাব্যের মত ভগবৎ-বিষয়ক একটি প্রত্যয়ের ভাবও কবিতাটির শেষে সঞ্চারিত হয়েছে, যেমন—

আছে আছে প্রেম ধুলায় ধুলায়,
আনন্দ আছে নিখিলে।
মিথ্যায় ঘেরে ছোটো কণাটিরে
তুচ্ছ করিয়া দেখিলে।
জগতের যত অণু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব

বহিছে একটি চিরগৌরব—
একথা না যদি শিখিলে
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে
প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে।

এই ভাবুকতা আমরা নৈবেদ্যের নানান্ কবিতায় পেয়েছি। ঠিক এই ভাবুকতার উপর কবিতাটির অর্থগত রমণীয়তা নির্ভর করছে না, করছে পূর্বাংশের ঐ পৃথিবী-প্রীতির মধ্যে সঞ্চারিত সুদূরের অন্বেষণে। এ বিষয়ে আমরা গ্রন্থান্তরে আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলতে হচ্ছে—মূলতঃ একটি প্রবল রোম্যান্টিক বাসনাই দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পৃথিবী-ছাড়া সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকর্ষণে কবিকে বিহ্বল করেছে, আবার পৃথিবীর মধ্যেকার রহস্য-অন্বেষণেও চালিত করেছে। 'প্রবাসী' কবিতায় ঐ দুই মানসিকতা খুব স্পষ্টভাবে একত্র গ্রথিত হয়েছে। এরই ঘনীভূত প্রকাশ কবিতাটির স্থানে স্থানে রূপে রমণীয় হয়েছে। যেমন, 'সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে বাহির হয়েছি ভ্রমণে' 'চিরদিবসের ভুলে যাওয়া বাণী কোন্ কথা মনে আনে সে' 'আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে ঘরের বাসনা মিটাতে' প্রভৃতি স্মরণযোগ্য পঙ্‌ক্তিসমূহে। কবিতাটি সহজ আন্তরিক ভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য, যদিও 'ফুলমাঝে আমি হব ফুলদল তাঁরি পূজারতি বরণে' এবং 'আছে তাঁরি পারে তাঁরি পারাবারে বিপুলভুবন-তরণী' প্রভৃতির মত ধ্বনিমনোহর পঙ্‌ক্তি কবিতাটির স্থানবিশেষে সুলভ, রবীন্দ্রের রচনা ব'লেই প্রত্যাশিত, এবং মিলবন্ধনের মধ্যে যদিচ 'চরণে—মরণে—বরণে' 'গগনে—লগনে—সঘনে' প্রভৃতির উত্তমতা দুই অক্ষরে স্বরব্যঞ্জনসহ রক্ষিত হয়েছে, তথাপি 'চাস—বাড়াস—বাতাস' 'ভিতে—করিতে—চিতে' প্রভৃতির মত মাত্র অন্ত্যব্যঞ্জন ও স্বরের মিলও এতে রয়েছে এবং 'স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে' 'ছোটো-বড়ো-হীন সবার মাঝারে করি চিত্তের স্থাপনা' প্রভৃতির মত ধ্বনির দিক থেকে অসুন্দর পঙ্‌ক্তিও এর মধ্যে সহজ প্রবেশের অধিকার লাভ করেছে।

'উৎসর্গ'-এর বহু কবিতায় আদ্যন্ত-ব্যাপ্ত রমণীয়তা না থাকলেও স্থানিক রমণীয়তা যথেষ্ট। অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে একালের আমাদের সার্বজনীন মনোভঙ্গির প্রকাশ কবি নিবদ্ধ করেছেন দু'চার পঙ্‌ক্তির রচনাতেই। উৎসর্গ ছাড়া অন্যত্রও এ-ধরনের প্রৌঢ়োক্তি রয়েছে এবং বলা যায়

এগুলি আমাদের রবীন্দ্রানুগত ভাবসংস্কারে পরিণত হয়ে পড়েছে। যেমন,

(১) পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরীমৃগসম।...
যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

(২) কুসুম ফুটিবে, বাঁধন টুটিবে,
পুরিবে সকল কামনা।

(৩) রমণীরে কে বা জানে—
মন তার কোন্‌খানে।

(৪) ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।

(৫) বাহির হইতে দেখো না এমন ক'রে,
আমায় দেখো না বাহিরে।

(৬) অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

(৭) সোনার ছন্দে পাতিয়াছি ফাঁদ,
বাঁশিতে ভরেছি কোমল নিখাদ
তবু সংশয় জাগে ধরা তুমি দিলে কি!

(৮) কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া,
বাহির হনু তিমির-রাতে
তরণীখানি বাহিয়া। —ইত্যাদি।

এ-রকম বচনসমাবেশের মধ্যে একত্র বহু ভাব ঘনীভূত হয়েছে এবং গূঢ়ার্থও অভিব্যক্ত হয়েছে। এর পূর্বেকার নিসর্গ-সৌন্দর্য বর্ণনের কবিতায় রূপের আশ্রয়ে সৌন্দর্য-বিরহ আভাসিত হয়েছে, এখানে ইন্দ্রিয়ানুভবের মোহকর রূপের বর্ণনা নেই বললেই হয়, তার পরিবর্তে রূপক এবং সংকেতময় ভাবেরই প্রাচুর্য। উৎসর্গের এই রূপহীন ভাববিলাসই একে পরিব্যাপ্ত কাব্যসৌন্দর্য

থেকে বঞ্চিত করেছে, কবির উপলব্ধি যেমন নিবিড়ই হোক না কেন। 'খেয়া'য় এই চিত্ররিক্ততা থেকে কবি সমুত্তীর্ণ হয়েছেন এবং চিত্রের সঙ্গে ভাবসংকেত সমানভাবে যোজনা করতে পেরেছেন। এইখানে উৎসর্গের সঙ্গে 'খেয়া'র পার্থক্য।

উৎসর্গের রূপকাশ্রিত একটি বিশেষ কবিতা হ'ল **'মরণ-মিলন'** (অত চুপি চুপি কেন কথা কও)। কবিতাটিতে মৃত্যু সম্পর্কে কবির তত্ত্ব কিছু থাক বা না থাক হরপার্বতীর বিবাহের চিত্র এবং প্রণয় ও মিলনের প্রসঙ্গ রূপকের মধ্যে মিশ্রিত হওয়ার জন্য প্রাথমিক সৌন্দর্যসম্পাত ঘটেছে। কবি বরযাত্রা এবং মিলনোৎসবের উল্লাসের মধ্যে যে নূতন অর্থ যোজনা করতে চেয়েছেন তাও কবিতাটিকে বিশেষত্বে ও অসাধারণত্বে উন্নীত করেছে। ফলে, সাধারণ শৃঙ্গার-রসবৈচিত্র্যের প্রসার ব্যাহত হয়েছে এবং শৃঙ্গারের সঙ্গে বীররসের, রতিভাবের সঙ্গে উৎসাহের এক অদ্ভুত বিমিশ্রণ কবিতাটিকে অর্থের দিক থেকে এ সময়কার অন্যান্য কবিতা থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে। কিন্তু এও বাহুবঙ্গ কথা। এর মধ্যে অর্থচিত্রের ঐশ্বর্য যেটুকু আছে তা নিরর্থকভাবেই আছে এবং ছন্দোবন্ধনের মধ্যে যতিস্থাপনের কারুকায ও কোমলাক্ষরের এক আশ্চর্যরীতির অনুপ্রাস-বিন্যাস এর অর্থগত রমণীয়তাকে রমণীয়তর কলা-কৈবল্যের পথেই চালিত করেছে। সেইখানেই কবির কাব্যসিদ্ধি ঘটেছে, মৃত্যুবরণের উৎসাহের তত্ত্বের মধ্যে নয়। অর্থাৎ আরও সহজ ক'রে বলতে গেলে বলা যায় যে, কী বলা হচ্ছে তা নয়, কেমন ক'রে বলা হচ্ছে তা-ই এ কবিতাটির সবচেয়ে বড় কথা। কবি নিঃসংশয়ে এখানে বাণীর চরমতার, art for art's sake এর উপাসক। চিত্র এবং সংগীতের এই চঞ্চল সমারোহ উৎসর্গে আর নেই, ক্ষণিকা এবং কল্পনাতেও ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অর্থচিত্র দেখা যাক—

> তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
> সে কি আগে পিছে কেহ ববে না ?
> তব মশাল-আলোকে নদীতট
> আঁখি মেলিবে না রাঙাবরন ?
> ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল···

এটি কল্পিত বিবাহযাত্রার পরিচয়, অসাধারণ হওয়াতে অভিনব সৌন্দর্য দ্যোতনা করছে। ছন্দের মধ্যে একদিকে মাত্রাতিরিক্ত স্বল্পাক্ষর, অন্যদিকে এক

একটি পর্বাঙ্গ এবং মধ্যে এক-একটি ষণ্মাত্রিক পর্ব যোজিত হয়ে অগ্রপশ্চাৎ দোলের সঙ্গে গমনের সুর অনুরণিত করেছে। এই অংশের মধ্যে 'বিজয়োদ্ধত ॥ ধ্বজপট' ইত্যাদির 'দ'-এর অনুপ্রাস মন দিয়ে শুনলেই দোলা-সহ যাত্রার ছবি ধরা পড়বে। 'মশাল-আলোকে নদীতট' প্রভৃতির মধ্যে মৃত্যুর ভয়ংকর-সুন্দর ছবি প্রতিভাত হয়েছে। মৃত্যুর আগমনের এই চিত্র অনায়াসেই কবিকে মহাদেবের বরযাত্রার ঐতিহ্যের অনুরাগী করে তুলেছে। এবং কবি কয়েকটি মাত্র পঙ্‌ক্তিতে এই বরযাত্রার এবং বধূবেশিনী গৌরীর পূর্বরাগের অনুপম ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। পাঠক লক্ষ্য করবেন বিশিষ্ট ছন্দোভঙ্গি এবং ব-ল অথবা জ-বর্গের অনুপ্রাসই কবিকে সৌন্দর্য-উত্তরণে নিঃশেষে সাহায্য করেছে—

> তাঁর লটপট করে বাঘছাল
>   তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে;
> তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
>   যত ভুজঙ্গদল তরজে।
> তাঁর ববম্‌ ববম্‌ বাজে গাল
>   দোলে গলায় কপালাভরণ…

বরবেশের অনুপযোগী এই পুরুষের ভাব-সৌন্দর্য কুমারসম্ভব থেকে প্রাচীন বাঙ্‌লা কাব্য পর্যন্ত বিস্তৃত। আর তারই একটি প্রতিচ্ছবি নিখুঁত গীতচ্ছন্দে ধরা পড়েছে। কিন্তু পার্বতীর ভাবাভিব্যক্তির ছবিটিই বোধ হয় সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়েছে এবং সমস্ত কবিতাটির মধ্যে এই অংশের নির্মাণ সর্বোত্তম হয়েছে নিঃসন্দেহে—

> সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল,
>   তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
> তাঁর বাম আঁখি ফুরে থরথর,
>   তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
> তাঁর পুলকিত তনু জরজর,
>   তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।

শুধু উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিনিচয়ের মধ্যেই নয়, সমস্ত স্তবকটিতেই 'র' এবং 'ল'-এর মিশ্রিত সুকোমল অনুপ্রাসের মধুরিমা জড়িত। গৌরীর কয়েকটি অনুভাব বা বিক্রিয়ার বর্ণনে তাঁর পূর্বরাগের সম্পূর্ণ একটি ছবি এখানে ব্যঞ্জনাক্রমে

আমাদের গোচরে এসেছে। এখানে ধ্বন্যাত্মক কলকল, ছলছল, থরথর, দুরুদুরু, জরজর—শব্দের প্রয়োগ কবির অভিপ্রেত সিদ্ধ করেছে। গৌরীর অনুরাগের ভাব-সৌন্দর্য ফুটেছে নিম্নলিখিত আত্মনিবেদনের চিত্রে—

তুমি উৎসব করো সারারাত
তব বিজয়শঙ্খ বাজায়ে।
মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি হাত
নব রক্তবসনে সাজায়ে।
তুমি কারে করিয়ো না দৃক্‌পাত
আমি নিজে লব তব শরণ···

পরিশেষে একটি নিসর্গ-চিত্রের রমণীয়তার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রতে হয়। এ ছবিটি রুদ্র-মহাদেবের প্রলয়কালের। এ ছবির সাদৃশ্য কবির 'পাগল' গদ্য-রচনা এবং 'তপোভঙ্গ' কবিতায় মিলবে—

যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা বিকাশে,······

এর প্রথম দু'পঙ্‌ক্তির শব্দচিত্র এবং দ্বিতীয় দু'পঙ্‌ক্তির অর্থচিত্র লক্ষণীয়। স্পষ্টতঃ, কবির এই মরণ-মিলনের উৎসাহ কাব্যহিসেবে শিব-পার্বতীর পূর্বরাগ এবং মিলন-অভিলাষের মানসিক চিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সমুদ্ভূত হয়েছে। যাঁরা এসব কবিতা নিয়ে তত্ত্ব গড়ে তুলবেন অথবা বাইরের কোনও ঘটনা বিশেষকে এরকম রচনার উৎস ধ'রে এর ইতিহাস নির্ণয়ের প্রয়াস করবেন, তাঁরা এর স্বপ্রকাশ কলাকৃতির স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকবেন। 'উৎসর্গ'-এর ভাবসংকেত-প্রাধান্যের মধ্যে এই রচনাটি রূপের আনন্দ বিতরণ ক'রে স্মরণযোগ্য স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে।

'খেয়া' কাব্যের নিসর্গচিত্র ও রূপক-বাহিত ভাবসংকেত বা নিবিড় মরমীয়তা উৎসর্গেই তার উষাভাস বিচ্ছুরিত করেছে। পূর্বে নিসর্গচিত্রহীন শুধু ভাবময় কয়েকটি কবিতার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন, মোর কিছু ধন আছে সংসারে, আপনারে তুমি করিবে গোপন, তোমায় চিনি ব'লে আমি করেছি গরব, আমি চঞ্চল হে—প্রভৃতি। কিন্তু 'খেয়া'র কবিতায় কবি প্রায়শঃ

নিসর্গরসাস্বাদের সঙ্গে ব্যাকুলতাময় মনের গহনে ডুব দিয়েছেন। এর কোনও কবিতায় আস্তস্ত নিসর্গচিত্র পাচ্ছি না, তাই বোধ হয় খণ্ডচিত্রগুলিই অপূর্ব হয়ে দেখা দিয়েছে। এর অনায়াস-লিখিত পল্লীর স্বভাবচিত্রগুলি 'ক্ষণিকা'র নিসর্গের সঙ্গে তুলনা করার যোগ্য। তফাৎ এই যে, এখানে নিসর্গের অতিরিক্ত কিছু পাচ্ছি এবং প্রণয়ভাবুকতার রোমাঞ্চময় হর্ষ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। 'খেয়া'য় চপল ও প্রদীপ্ত মধুরতা নেই, মাধুর্যের সঙ্গে স্নিগ্ধতা ও কারুণ্য মিশ্রিত হয়ে শান্ত-সুন্দর বৈরাগ্যের অভিমুখে পাঠকের চিত্তকে নিয়ে যাচ্ছে। লক্ষণীয় এই যে, নিসর্গচিত্রগুলির বেশির ভাগই সন্ধ্যামুখের রমণীয়তার দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়েছে। ঘাটের পথ, নদীর পার, গাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয়, কচিৎ বর্ষণ ও দুর্যোগ—এইসব নিসর্গের পরিবেশে আধ-আলো আধ-অন্ধকার এক বিশেষ প্রাকৃতিক অবস্থাই খেয়ার রচনায় কবির প্রিয় হয়েছে। 'খেয়া'র ভাষাভঙ্গির সহজ চারুতাও ক্ষণিকার সঙ্গে তুলনায় স্মরণের যোগ্য।

একালের একটি বহির্ঘটনা হ'ল কবির চিত্তে বাউল-জীবনের এবং বাউল সংগীতের সংস্পর্শ। এরই ফলে সংকেতময় চিত্রবিন্যাস, গীতের উৎসার, অরূপমুখীনতা এবং ভাষা ও ছন্দের অমনোযোগ-কারুশিল্প উদ্ভূত হয়েছে। 'খেয়া' থেকে 'গীতিমাল্য' রচনাকাল পর্যন্ত প্রায় দশ বৎসর কবির এই সহজ-সাধনের পালা চলেছে কি গানে, কি নাট্যে। অর্থাৎ উৎসর্গ-পূর্বেকার শব্দধ্বনির নিতান্ত শ্রুতিমধুরতার পথ পরিত্যক্ত হয়েছে, ব্যঞ্জনাময় শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে না, কিন্তু অর্থের মধ্যে ব্যঞ্জনা নিহিত করা হয়েছে. বাক্য থেকে বাক্যান্তরে বাহিত অর্থ সংকেতিত অখণ্ড ভাবের সৌন্দর্য সঞ্চারিত করেছে।

খেয়া-কাব্যের প্রথম কবিতা **'শেষ খেয়া'**। এর চিত্রিত সৌন্দর্য দিবাশেষের, সংকেতে অজানা লোকের প্রতি আগ্রহ। প্রথম কয়েক পঙ্‌ক্তিতে নদীতীরে সমাগত সন্ধ্যার ছবি ফুটেছে, যতিভারাক্রান্ত দীর্ঘ চরণক্ষেপের মধ্যে শ্রান্তি বিষাদ এবং বৈরাগ্যের উদ্দীপন ঘটেছে। চরণশেষে 'আ' স্বরের বাহুল্য নিরর্থক হয় নি। এ ছাড়া বহু চরণে দুই পর্বের মধ্যানুপ্রাস, যেমন, 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' 'তাদের পানে ভাটার টানে' 'অস্তাচলে তীরের তলে' প্রভৃতি কারুণ্যের মধ্যে কোমলতার সঞ্চার করেছে। অর্থগত অজানার প্রতি সংকেত এবং বিদায়ের বৈরাগ্য সূচিত হয়েছে—'নামিয়ে মুখ চুকিয়ে সুখ যাবার মুখে যায় যারা' প্রভৃতি বাক্যে এবং 'ওরে আয়, আমায় নিয়ে যাবি কে রে' ইত্যাদি ধ্রুবপদ-যোজনায় বিষাদ-বৈরাগ্য সহ অজানালোকে

যাত্রার আগ্রহ স্পষ্ট হয়েছে। 'ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে' প্রভৃতি বাক্যনির্মাণে তরীতে পারাপারের দৃশ্যকে অবলম্বন ক'রে ইচ্ছাপূর্বক একটি মায়ালোকের রহস্যজাল সৃষ্টি করা হয়েছে। কোনও অধ্যাত্ম কথা বলা এরকম পঙ্‌ক্তির উদ্দেশ্য নয়। 'দিনের আলো যার ফুরাল' প্রভৃতি বাক্যার্থে কবি কল্পনায় নিজকে প্রক্ষেপ করেছেন এবং নিঃসংশয়ে 'দিন তো গেল সন্ধ্যা হল' প্রভৃতির মত শতাধিক বাউল-গীতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এই প্রত্যক্ষ প্রভাবের জন্যই 'অস্তাচলে তীরের তলে ঘন গাছের কোল ঘেঁষে' প্রভৃতির মত কৃত্রিম চিত্র-বিন্যাসও কবিকে করতে হয়েছে। মোটের উপর এরকম ছবি তরণীর সঞ্চরণের, অথচ তাও যেন ঠিক নয়। বাউলেরা এরকম স্পষ্ট নিসর্গচিত্র যোজনা করতেন কিনা সন্দেহ। তবু একথা ঠিক যে ভাষাকৌশল সহ ('খেয়া'র এই একটি কবিতাতেই অনুপ্রাস-কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে) এই কবিতাটি কোমল-করুণ আবেশে বৈরাগীর মনোভাবের প্রকাশ অবারিত করতে পেরেছে। বলা বাহুল্য, কবি সুদূর ও অজানার প্রতি আগ্রহসম্পন্ন রোম্যান্টিক ব'লেই বাউলদের যাত্রী-মনোভাব সহজেই স্বাঙ্গীকৃত করতে পেরেছেন।

খেয়ার নিসর্গ-বিহ্বলতাময় দ্বিতীয় কবিতা **'ঘাটের পথ'**। কল্পনাপ্রবণ চিত্তে পথের যে একটি ব্যাকুলতাময় আহ্বান আছে, সেই মনোভঙ্গি এই কবিতাটির বীজ। বিশেষে জল-ভরার জন্য যাতায়াতের প্রবল আকর্ষণ নারী-চিত্তে সমধিক। এই ভাবনা ও চিত্রসম্পদ্‌কে আত্মস্থ ক'রে কবি আমাদের একটি ব্যাকুলতাময় সৌন্দর্য-অংশ উপহার দিয়েছেন। নিসর্গ এই মনোভঙ্গিকে কিভাবে পরিপুষ্ট করেছে তা দু'টি স্তবকের বর্ণনা থেকে উপলব্ধ হবে—

(১) বেণুশাখা 'পরে বারি ঝরঝরে,
একূলে ওকূলে কালো ছায়া পড়ে,
পথঘাট পিচ্ছল।

(২) গিয়েছি আঁধার সাঁঝে।
শিহরি শিহরি উঠে পল্লব
নির্জন বনমাঝে।
বাতাস থমকে, জোনাকি চমকে
ঝিল্লির সাথে ঝমকে ঝমকে
চরণে ভূষণ বাজে।

এ দু'টি বর্ণনা গোধূলি বা নিশামুখের, তার মধ্যে একটি বর্ষণের। প্রত্যেকটি চিত্র কয়েকটি খণ্ডচিত্রের সমষ্টি, স্বল্পকথায় বাঁধা। এই যাত্রাকে অভিসার বলা চলে, নিসর্গের মধ্যে আভাসিত অস্পষ্ট অজানার উদ্দেশ্যে। পরিবেশে তাই করুণ উদাসীনতা স্পষ্ট—'কপোতকূজন-করুণ আকাশে উদাসীন মেঘ-ঘোরে' 'দিনের আলোক ম্লান হয়ে আসে'। আমরা পূর্বে 'সোনার তরী' পর্যায়ে রহস্যময় সুন্দরীর আকর্ষণের পিছনে ঠিক এই ধরনের গোধূলি-ধূসর নিসর্গ-চিত্র লক্ষ্য করেছি। কবি বলছেন—

আমি বাহির হইব বলে
যেন সারাদিন কে বসিয়া থাকে
নীল আকাশের কোলে।

প্রতীক্ষমাণ অবরুদ্ধ অবস্থায় নিরানন্দ, সমস্ত প্রাপ্তির মধ্যেও অপ্রাপ্তির বেদনা, প্রয়োজনের জগৎকে অবহেলা এবং অজানা কল্পিত সত্তার প্রতি আগ্রহ—এই রবীন্দ্র-মনোভাব তার কবিতার প্রায় সর্বত্র। এরই নানান্ ভাব-বিকার ও চেষ্টার বর্ণনা মণ্ডনশিল্পকৌশলে বহু কবিতাতেই অপূর্ব হয়ে দেখা দিয়েছে। 'ঘাটের পথ' নিসর্গ-আশ্রিত এই মনোবিকারের একটি মনোরম ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। খেয়ার এই বস্তুত্যাগী প্রবৃত্তি উৎসর্গের চকিত-স্পর্শ-বিহ্বল মনোবিকার থেকে একটু স্বতন্ত্র হলেও এবং খেয়ার নিসর্গ-রমণীয়তা উৎসর্গে দৃষ্ট না হলেও কোনও বিশিষ্ট সত্তার জন্য ক্রমবর্ধমান আগ্রহের সূত্রে এ-দুয়ের কবিতাগুলি যুক্ত। এই সূত্র গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য পর্যন্ত সমরেখায় লম্বিত হয়েছে। গীতাঞ্জলিতে নিসর্গের রমণীয়তা কম নেই। আবার খেয়াতেও এমন ব্যাকুলতাময় অনুভব রয়েছে, যা গীতাঞ্জলিতে বহুল পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এখন খেয়ার অন্য দু'চারটি নিসর্গ-প্রেরণার কবিতা দেখা যাক।

একটি 'নিরুদ্যম', একটি 'বৈশাখে', আর একটি 'দিঘি'। তিনটিতেই কাজ-ভোলানো অলস মুহূর্তের জন্য কবির আগ্রহ পরিস্ফুট। **'নিরুদ্যম'** কবিতায় দেখা যায় কাজের জগতে সঙ্গীদের সঙ্গে বেরিয়ে কবি পিছিয়ে এসেছেন এবং 'আনন্দময় অগাধ অগৌরবে' মগ্ন হয়েছেন পল্লীর নিসর্গই কবিকে শান্তরসময় আত্মবিহ্বল ভাবজগতে নিয়ে গেছে—

বাঁশের ছায়া কী কৌতুকে
নাচে আমার চক্ষে মুখে,

আমের মুকুল গন্ধে আমায়
বিধুর ক'রে তোলে—
নয়ন মুদে আসে মৌমাছিদের
গুঞ্জনকল্লোলে।

নিঃসন্দেহে কবি তাঁর অপ্রমত্ত আনন্দবোধের পরিচয় সহজ চাতুর্যের সঙ্গে পাঠকদের চিত্তে সঞ্চার করতে পেরেছেন। 'বৈশাখে' কবিতায় এই ধরনের মধুর বৈরাগ্যের পিছনে নিসর্গের কার্যকারিতা বেশি স্পষ্ট। এ নিসর্গের মধ্যে কোনও কল্পনার অতিরঞ্জন নেই। বস্তুবিচারে দেখা যায়, বৈশাখের দ্বিপ্রহর, নিমের মঞ্জরী, মৌমাছির গুঞ্জন, বাঁধের জলে আলোর কম্পন প্রভৃতি। এই সাধারণের মধ্যে কবির পলাতক চিত্ত রমণীয় কোন্ সম্পদের আশ্বাসে ফিরেছে। কবির এই নিসর্গ-বিহ্বলতার সংক্ষিপ্ত রসোত্তীর্ণ ছবি হ'ল—'আজ দুপুরে আকাশতলে রিমিঝিমি নূপুর বাজে।' **'দিঘিতে'** অবগাহনের চিত্রেও কবির বাস্তব-বৈরাগ্যের ছবি ফুটেছে, অর্থাৎ নিসর্গ-সম্পর্কই বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে, কাজের সংসার গেছে মুছে—'সাঁতার দিয়ে চলে গেলেম, চলে এলেম যেন সকল-হারা দেশে' এবং এর রসাপ্লুত বিষাদ-বৈরাগ্যের রমণীয় অবস্থার চিত্র নিম্নলিখিতভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে—'এ কোন্ অশ্রুভরা গীতি ছলছলিয়ে উঠে কানের কাছে বাজে'। কবিতাটির শেষের দু'স্তবকে স্মরণযোগ্য নিসর্গের স্বভাবচিত্র যোজনা করা হয়েছে। এর মধ্যেও বৈরাগ্যের কারুণ্যই পরিস্ফুট হয়েছে—

শিউলি-শাখে কোকিল ডাকে করুণ কাকলিতে
ক্লান্ত আশার ডাক।
ম্লান ধূসর আকাশ দিয়ে দূরে কোথায় নীড়ে
উড়ে গেল কাক।
মর্মরিয়া মর্মরিয়া বাতাস গেল ম'রে
বেণুবনের তলে,

এবং,

সন্ধ্যাবেলার প্রথম তারা উঠল গাছের আড়ে,
বাজল দূরে শাঁখ।
রন্ধ্রবিহীন অন্ধকারে পাখার শব্দ মেলে
গেল বকের ঝাঁক।
পথে কেবল জোনাক জ্বলে, নাইকো কোনো আলো

খেয়াতে প্রধানভাবে নিসর্গের এই স্বভাবোক্তি-বিলসিত চিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। কোনও কল্পনার ঐশ্বর্য দিয়ে এ চিত্রকে প্রগল্‌ভ করা হয় নি। এ চিত্র পল্লীবাসীর নিয়তদৃষ্ট, নিতান্ত সহজ। অথচ রমণীয়তা এইখানে যে, এরই মধ্যস্থতায় মর্মের একটি স্থায়ী ভাবও অনায়াসে প্রকাশিত হতে পেরেছে। নিম্নলিখিত দু'ছত্রের গীতিকাব্যিক সৌন্দর্য কে অস্বীকার করতে পারে ?—

কুয়ার ধারে দুপুর বেলা
তেমনি ডাকে পাখি,
তেমনি কাঁপে নিমের পাতা—
আমি বসেই থাকি।

এ ছাড়া বর্ষাপ্রভাত, বর্ষাসন্ধ্যা, কোকিল, চাঞ্চল্য প্রভৃতি আরও কয়েকটি নিসর্গমূল কবিতা রয়েছে যার মধ্যে কবির বিচিত্র সূক্ষ্ম ব্যাকুলতা মূর্ত হয়েছে। ব্যাকুলতার অনুভব যেখানে রূপে রসে নিবিড় হয়েছে সেই অংশে কিছু কিছু উত্তম কাব্য আমরা উপহার পেয়েছি। এর মধ্যে দিনশেষের ভূমিকায় অতিথিশালার পরিচয় দিয়ে কবি যেখানে শ্রান্তি ও হতাশ্বাসের ব্যঞ্জনা দিচ্ছেন সেই অংশ স্মরণীয় হয়েছে নিঃসন্দেহে—

আমার দিনের যাত্রা-শেষে
কার অতিথি হলেম এসে!
হায় রে বিজন দীর্ঘ রাত্রি,
হায় রে ক্লান্ত কায়া!

এই হতাশ মনোভাবের পুষ্টিসাধন করেছে অনুরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ, শংকা-ত্রাসাদির দ্বারা পরিপুষ্ট—

শুষ্কজলা দিঘির পাড়ে
জোনাক ফিরে ঝোপে ঝাড়ে,
ভাঙা পথে বাঁশের শাখা
ফেলে ভয়ের ছায়া।

'খেয়া'র যে ক'টি কবিতায় প্রশ্ন, প্রত্যাশা অথবা অনুভবজাত আনন্দের আশ্বাস ফুটে উঠেছে সেগুলি পূর্বেকার 'উৎসর্গে'র সঙ্গে যুক্ত। আবার নিসর্গ এবং প্রত্যাশার চিত্র এবং সংকেত বা আভাসে উপলব্ধি মিলিয়ে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের পূর্বসূত্রও রচনা করছে। এরকম ভাবার্থচিত্র কবিকে অনিবার্যভাবে

কারো অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করেছে। রূপ থেকে ভাব এবং ভাব থেকে রূপে যাওয়া এর পর থেকে মুহুর্মুহু ঘটেছে—

সন্ধ্যা এখন পড়ছে হেলে
শালবনেতে আঁচল মেলে,
আঁধার-ঢালা দিঘির ঘাটে
হয়েছে শেষ কলস-ভরা।
মনের কথা কুড়িয়ে নিয়ে
ভাবি মাঠের মধ্যে গিয়ে—
সারাদিনের অকাজে আজ
কেউ কি মোরে দেয়নি ধরা।
আমার কি মন শূন্য, যখন
হল বধূর কলস ভরা।

'খেয়া'য় অক্ষরমাত্রিক ছন্দে গ্রন্থন নেই। অর্থাৎ গুরুতর কোনও বিষয় বা অর্থে কবির আগ্রহ নেই এতে, অথচ সহজ ব'লেই এ মানসিক অনুভবের অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়েছে। 'খেয়া' কাব্যের আর একটি প্রায় সাধারণ লক্ষণ—এর বিষয় এবং ভঙ্গিতে নারীমনের স্পর্শ। এর পূর্বে 'ব্যর্থ যৌবন' ('আজি যে রজনী যায়') কি 'পিয়াসী' ('আমি তো চাহিনি কিছু') প্রভৃতি কবিতায় বিচ্ছিন্নভাবে এবং সচেতনভাবেই কবি রমণীসুলভ ভাব-শিল্পের পরিচয় দিয়েছিলেন। 'খেয়া'তে এই নারী-মানসের অভিব্যক্তির পরিচয় অত্যন্ত অধিক এবং কবির অন্তশ্চৈতন্যে অথচ বহিরঙ্গ অচেতনতায় এগুলির সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ কবি অবশভাবে নিজ আভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তি দ্বারা এখানে চালিত হয়েছেন। এ থেকে 'খেয়া'য় কবির অনুভবের সহজ গভীরতা, মৃদুতা এবং আন্তরিকতা অনুমেয়। নিসর্গ থেকে কবি যে-স্বপ্নলীনতার মধ্যে আসছেন তা এত কোমল, স্পর্শকাতর এবং ক্ষণস্থায়ী যে কোনও উচ্চতা বা রূঢ়তার মধ্যে এর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীসুলভ অনুভবই বিবৃত হয়েছে। এই ভাবটি ফুলফোটানোর রূপক দিয়ে কবি বলতে চেয়েছেন—

তোরা কেউ পারবি নে গো,
পারবি নে ফুল ফোটাতে।
দৃষ্টি দিয়ে বারে বারে
ম্লান করতে পারিস তারে,

ছিঁড়তে পারিস দলগুলি তার,
ধূলায় পারিস লোটাতে—
…যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে।
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে,
অমনি যেন পূর্ণ প্রাণের
মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।…

যে ক'টি কবিতায় ভাবার্থ-সংকেত এবং রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে তা হ'ল—শুভক্ষণ, ত্যাগ, আগমন, দান, বালিকা বধূ, অনাবশ্যক এবং কৃপণ। এর মধ্যে **'শুভক্ষণ'** কবিতায় রাজপুত্র-দর্শনার্থিনী পুরবালিকার কাতরতাময় প্রাচীন চিত্রের ছায়া পড়েছে। 'ত্যাগ' এরই অপর পৃষ্ঠা, এখানে আর্টের শুভমুহূর্তের জন্য সর্বস্বত্যাগের অধীরতা ব্যক্ত হয়েছে। **'আগমন'** কবিতায় 'দুঃখরাতের রাজা'র আগমন-সংকেতে, ত্যাগের, দুঃখের মধ্য দিয়েই যে অনন্ত বা অরূপ লভ্য তা বলা হয়েছে। বাতাস এবং মেঘের গর্জনের চিত্রে মনের সংশয়াত্মক অবস্থা, তারপর ভেরীবাদ্য এবং অভ্যর্থনার আয়োজনের মধ্যে ঐ রাজার আগমনের একটি রূপকও চিত্রিত হয়েছে। সাংকেতিকতা উত্তম ফুটেছে এর শেষ স্তবকের নিসর্গচিত্রে—

বজ্র ডাকে শূন্যতলে
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা।

—এই বর্ণনায়। এর মধ্যে সমাজ ও দেশের রিক্ত ও বিপন্ন মানুষের অবস্থার ব্যঞ্জনাও দেওয়া হয়েছে। এই ভাবসংকেত এবং দুঃখবরণের সর্বস্বত্যাগের উৎসাহ 'গীতালি' 'বলাকা'য় বিস্তারিত হয়েছে। 'দান' কবিতায় মালার পরিবর্তে তরবারির সংকেতে কোমল সুখশান্তির পরিবর্তে তীব্র দুঃখকে বরণ করার উৎসাহ সূচিত করা হয়েছে। নারীর মনোভাব ও আচরণের চিত্রে বিষয়টির স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়েছে। চিত্র হিসেবে বালিকা-বধূ সুন্দর, কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে, এখানে বালিকা-বধূর বিশেষ কোনও আচরণের সমগ্র চিত্র অঙ্কন করা হয় নি। ভাবের ছবিগুলি সংকলন করা হয়েছে মাত্র

এবং যে-রীতিতে করা হয়েছে তাতে বর এবং বধূকে ত্যাগ ক'রে অনায়াসে পাঠকচিত্ত মানুষ এবং ঈশ্বরের একটা সম্পর্কের মধ্যে এসে পড়ে। স্থান-বিশেষের এরকম কয়েকটি ব্যঞ্জনার দৃষ্টান্ত, যেমন, (১) 'তোমার উদার প্রাসাদে একেলা'=মহান্ সৃষ্টির মধ্যে, (২) 'খেলিবার ধন শুধু'=কেবল সাংসারিক প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিত ক'রে দেখে। (৩) 'ধুলা দিয়ে ঘর রচনা করিয়া' =নশ্বর বস্তুকে পরমবস্তু মনে করা। (৪) 'পালিব পরাণপণে যাহা কহে গুরুজনে' =শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলা। (৫) 'অচেতন ঘুমভরে'=আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতা। (৬) 'শুধু দুর্দিনে ঝড়ে'=কঠিন বিপদের সময়। (৭) 'মোরা মনে করি ভয়' ইত্যাদি=শাস্ত্রনির্দেশ না মেনে নিজের স্বভাবেই থাকা সাধারণে অপরাধ মনে করে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে এটাই যথার্থ প্রীতি। (৮) 'একদিন এর খেলা ঘুচে যাবে'=বিশ্বের মধ্য দিয়ে বিশ্বেশ্বরকে অনুভবের অবস্থার পর ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ গভীর যোগ। 'অনাবশ্যক' কবিতায় রূপকের সাহায্যে—প্রয়োজন-সম্পর্ক না থাকলেই সৌন্দর্যের প্রকাশ অবারিত হয়—এই মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে। আর **'কৃপণ'** এর রূপকে—যে-পরিমাণে স্বার্থত্যাগ সেই পরিমাণে অরূপ-সৌন্দর্যের স্পর্শলাভ—এই বিষয় বোঝানো হয়েছে। এই কবিতাগুলি রূপকধর্মী ব'লে চিত্র এবং গীতের দিক দিয়ে তেমন রমণীয় হয় নি। সামগ্রিক রূপকের স্বভাবই হ'ল একটা অর্থ প্রকাশ করা বা বস্তু বুঝিয়ে দেওয়া। শব্দার্থের যে ধ্বনিময়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত মিলন উত্তম কাব্যের বিষয়, পরিণামে যা কতক প্রকাশ কতক অপ্রকাশ—তাব চিহ্ন রূপক-কবিতায় দুর্লভ। অবশ্য এ-কবির রচনায় যেখানে রূপক সাংকেতিকতায় গিয়ে মিশেছে সেখানে, যেমন ঐ 'আগমন' কবিতার 'বজ্র ডাকে শূন্যতলে' ইত্যাদি অংশে, কাব্য তার স্বক্ষেত্রে মুক্তি পেয়েছে।

'খেয়া'র সময় থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথের বন্ধনহীন অ-গতানুগতিক সংগীতের উৎসার ঘটেছে। গীতিকাব্য এবং গীত এ দুয়ের সাদৃশ্য এবং পার্থক্য বিষয়ে অবহিত হওয়া ভালো। এ দুয়ের রস-পরিণাম একই, কোন-না-কোন ভাবনির্ভর আহ্লাদবিশেষ। কিন্তু গীতিকাব্যে ছন্দ এবং অনুপ্রাস একদিকে, আরদিকে রূপের বা চিত্রের আয়োজন। খাঁটি গানে সুরেরই একাধিপত্য, এর রূপসৃষ্টি স্বরসামঞ্জস্যে ও তানে। মীড় গমক মূর্ছনা সুরের সঙ্গে একীভূত হয়ে অভিপ্রেত ভাবরসের উদ্বোধকে নিবিড় থেকে নিবিড়তর করে। বিষয়বাচক কথার মূল্য সুরের কাছে স্বল্পই। কথা মাত্র খুঁটোর কাজ

করে, সুরের লতাকে বর্ধিত ও বিকশিত করার জন্য। এ ছাড়া একজাতীয় সংগীত আছে যেখানে কথা বা বিষয়ের ব্যাখ্যানই মূলতত্ত্ব. সুর-সংযোগে তাকে রমণীয়ভাবে উপস্থাপিত করা হয় মাত্র। কবিরা ছন্দোবদ্ধ কাব্য লেখেন, গায়কেরা জনচিত্ত আকর্ষণের জন্য সুর ক'রে তাকে পাঠ করেন বা কোনো একটা সুরের কাঠামোতে ফেলে কথামূল গান রচনা করেন। প্রাচীন কালের ব্যালাড, আমাদের দেশের মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ প্রভৃতি এই জাতীয় রচনা। নিঃসন্দেহে বাল্মীকির রামায়ণও লবকুশ কর্তৃক এইভাবে মোটামুটি সুরে প্রযুক্ত ক'রে গান করা হয়েছিল। মানুষের চিত্তে খাপছাড়া সুরের আবির্ভাব তার আদিম অবস্থা থেকেই সঞ্জাত। সভ্যতার বিকাশ হ'লে এই সমস্ত সুররীতি সংগ্রথিত হতে হতে সামঞ্জস্যময় বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। আমাদের দেশে বৈদিক সভ্যতার পরবর্তী যুগ থেকে আর্যদের সাম-গানে অবলম্বিত কয়েকটিমাত্র-স্বর-সংবলিত ঠাটের সঙ্গে দেশীয় সুরের মিশ্রণ ঘটতে থাকে মুহুর্মুহু। ক্রমে মোটামুটি এক এক ভাব অনুযায়ী রাগিণীর আবির্ভাব ঘটতে থাকে, যার উপর ভিত্তি ক'রে সীমাবদ্ধ ও নির্বাচিত রাগ-গুলি গড়ে উঠেছে। রাগসমূহ মহাদেবের নিঃশ্বাস এবং ব্রহ্মার মুখ থেকে জন্মলাভ করেছে, এ কোনও কাজের কথা নয়। বস্তুতঃ বহু প্রাচীন লৌকিক সুরের ঠাটই সূক্ষ্ম রাগিণীতে ও রাগে বদ্ধ হয়ে পড়েছে। আবার অনেক হয়ওনি। আজও তারা দেশি সুর নামে জীবন্ত রয়েছে। সাধারণ্যে এগুলিরই প্রভাব। খুব বেশি দিনের কথা নয়, কীর্তনকে রাগসংগীতের আভিজাত্যে সমুন্নীত করার প্রয়াস কেউ কেউ করেছিলেন, সার্থক হয় নি। কারণ, এ পরিশ্রমের ব্যাপার নয়, এর জন্যে প্রয়োজন উন্নত স্বরস্রষ্টার, কলাবানের।

যাই হোক, বিশুদ্ধ সুর এবং উপরিউক্ত সুরে-কাব্যপাঠের রীতি ছাড়া আর একপ্রকার গীতরীতি এদেশে প্রচলিত। তা হ'ল কথার সঙ্গে সুরের মিশ্রণরীতি, সুরে-পাঠেরই আর একটা রীতি যাতে সুরের অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য এবং কথাকে এমন রূপ দিয়ে রচনা করতে হয়, ছন্দ এমন ভাবে গাঁথতে হয় যে অনায়াসে তা সুরধর্মী হয়ে পড়ে। গীতিকাব্যে এবং বিশেষ ভাবে ক্ষুদ্রাবয়ব গীতিকাব্যে অর্থাৎ গীতিতে সুরের সঙ্গে কথার নিত্যসম্বন্ধ। কীর্তন, ভাটিয়ালি, বাউল, রামপ্রসাদী সংগীতে কথা ও সুরের অভেদ মিলনের দৃষ্টান্ত মিলবে। রবীন্দ্রনাথ গীতিকাব্যের কবি ব'লে কথা এবং সুরের একত্রিত

জন্ম তাঁর রচনায় অনায়াসেই সম্ভব হয়েছে। তিনি যে রাগ-রাগিণীর বিচিত্র মিশ্রণ ঘটিয়েছেন সেও ঐ কথা বা ভাষার সঙ্গে সুরের একাত্মতা রক্ষার আগ্রহে, ক্বচিৎ শুধু সুরেরই প্রয়োজনে।

প্রসঙ্গতঃ গানের তাল অর্থাৎ সুরের ছন্দ এবং কবিতার ছন্দের যোগাযোগের কথাও তুলতে হয়। কবিতাকে সুরে গাঁথতে হ'লে সেইরকম রীতির তালই বাছতে হয় যার সঙ্গে কবিতার যতি-অর্ধযতির গরমিল না থাকে। কবিতার একটি পর্ব বা চরণ নিয়ে তালের একক সম্পূর্ণ হয়। তালারম্ভ এবং তালশেষ যেন যতি এবং অর্ধযতির বন্ধন অমান্য না করে। বস্তুতঃ তা করে না এবং শুধু সুরে-পাঠ্য বা গীতে-প্রযুক্ত কাব্যের ক্ষেত্রেই নয়, সুরের প্রাধান্যের ক্ষেত্রেও, কথা এবং সুরের সংগতি যেখানে সেখানেও। সুরের যেখানে চরম প্রাধান্য সেখানে বলছিনা, কারণ সেখানে কথা কিছু থাকলেও তার এবং তার ছন্দের কোনও মূল্যই নেই। সেইজন্য রাগপ্রধান সংগীতে ছন্দোহীন বাক্য-বাক্যাংশ যোজিত হ'লে সুরতালের সংগতির প্রশ্ন সেখানে ওঠে না। এ হচ্ছে কথা যেখানে অপ্রধান নয় এমনতর ক্ষেত্রে। অবশ্য, রাগসংগীতেও যেখানে ভাষা সুন্দর, ছন্দে সুষম পর্ববিভাগ আছে, সেখানে সুরের তাল কবিতার ছন্দের সঙ্গে মিলে যায়। আমাদের ধারণায়, কবিতার ছন্দ এবং সুরের ছন্দ পরস্পরের প্রভাবে বিস্তার লাভ করেছে। এ দুয়ের ছন্দ হয়ত মূলে এক ছিল, হয়ত বা সুরের ছন্দই কাব্যচ্ছন্দের পুরোবর্তী ছিল, ক্রমে একের দ্বারা অন্যে প্রভাবিত হতে থাকে। সংস্কৃত-প্রাকৃতের মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অর্থাৎ মাত্রাগণনাই ছন্দের ভিত্তি স্থানীয় এমন ক্ষেত্রে, সংগীতের সঙ্গে ঐক্য স্পষ্ট। বাঙ্‌লা মাত্রাবৃত্তেও তাই এবং এইজন্য মাত্রাবৃত্তের কবিতাকে সুরসংবলিত গানে রূপান্তরিত করলে যতি ও অর্ধযতির স্থানগুলিতে তালারম্ভ এবং তালশেষ ঘটেই থাকে। এ সকল বিষয় আমাদের "বাঙ্‌লা কাব্যের রূপ ও রীতি" গ্রন্থে বিবেচিত হয়েছে। 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতির আলোচনায় প্রয়োজনবশে পুনরুক্ত হ'ল এই পর্যন্ত।

গীতাঞ্জলি এবং কবির রচিত অন্য বহু সংগীত সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য করা যেতে পারে। কতকগুলি গান কবির চিত্তে এবং লেখনীতে কবিতারূপেই প্রকাশিত হয়েছিল, পরে তাতে সুর যোগ করা হয়েছে। গীতে সমর্পিত না হ'লেও পাঠে এগুলির কাব্যরসাস্বাদে কোন ব্যাঘাত হয় না। ছন্দ এবং ভাষাকে অতিক্রম ক'রে সুর যেখানে প্রাধান্য বিস্তার করেছে এমন

শ্রেণীর গানে শুধু পাঠেই কাব্যচমৎকারের স্বাদ সম্ভব নয়। কবি ভাষায় চিত্রগীত নির্মাণ ক'রে অভিপ্রেতকে পাচ্ছেন না বলেই যেন সুর দিয়ে চরণ ছুঁয়ে যাওয়ার প্রয়াস করছেন। এই শ্রেণীর গীতের ভাষায় কোনও অলংকরণ গ্রথিত করা হয়নি, অর্থের মধ্য দিয়েও বিশেষ কোনও চিত্রের সৌন্দর্য ফোটে নি। এগুলি কোনও মতেই সুরনিরপেক্ষ নয় এবং আমরাও কাব্যবিচারের ক্ষেত্র থেকে এগুলিকে দূরে রাখতে পারি। তৃতীয় শ্রেণীর গীত—কথার সৌন্দর্যও আছে সুরের রমণীয়তাও আছে এমন রচনাকেও পাঠ্য কাব্য হিসেবে গ্রহণ করা চলতে পারে স্বচ্ছন্দে। এখন প্রধানভাবে গীতাঞ্জলি এবং সাধারণভাবে অন্যান্য পর্যায়ের কিছু কিছু গান আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত হবে।

'গীতাঞ্জলি'র কোনও কোনও গানে অর্থগৌরব লক্ষিত হলেও অধিকাংশই কাব্যসৌন্দর্যে রমণীয়। 'গীতাঞ্জলি'তে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই ভগবৎপ্রেমিক হয়ে উঠেছেন কিনা, এবং তাঁর ঈশ্বর সবিশেষ অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্ম এ বিতর্কের মধ্যে এখন আমরা যেতে চাইছি না। আমরা শুধু দেখছি, তাঁর তত্ত্ব যা-ই থাক তাঁর রচনাগুলিতে কাব্যরস প্রচুর পরিমাণেই রয়েছে। এর কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ আর্টিস্ট বা কবিই। তিনি আমাদের মধ্যযুগ থেকে আগত দেশীয় আধ্যাত্মিক গীতের ঐশ্বর্যকে আত্মসাৎ ক'রে স্ব-ভাবে ও স্ব-রূপে নিয়মিত ক'রে তাকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর চিত্তের অধ্যাত্মপ্রবণতা তাঁর রোম্যান্টিক কবিস্বভাবের বিকাশের ধর্মের সঙ্গে অসমঞ্জস নয়। আর তিনি যদি যথার্থই সাধক হতেন তাহ'লে তাঁর অধ্যাত্মের মায়াসম্পন্ন এবং কাব্য-সৌন্দর্যময় কবিতা বা গানগুলি এত রমণীয় হতে পারত না। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই স্বীকৃতি যথেষ্ট। তাছাড়া অধ্যাত্মমায়াস্পর্শের প্রায় দশবৎসর পরের, অর্থাৎ গীতালি-বলাকা থেকে একেবারে শেষ লেখা পর্যন্ত রচনায় ঠিক এই অধ্যাত্মকথা নেই, মানুষের কথা আছে, আছে নিসর্গের, কিছু নিজ জীবনের এবং কিছু তত্ত্বচিন্তার। যদিও একথা ঠিক যে অধ্যাত্মের ভাবানুষঙ্গ নিয়ে তিনি মানুষ এবং জীবনের গভীর ও নূতন সৌন্দর্য প্রকাশে সমর্থ হয়েছেন। ফলতঃ এই দাঁড়ায় যে রবীন্দ্রের অধ্যাত্ম তাঁর কাব্যময় উপলব্ধির একটা প্রকার-বিশেষ মাত্র। নিজ জীবনে রবীন্দ্রনাথ ধর্মজগতের মহাপুরুষদের মত ব্রহ্ম উপলব্ধি করেছিলেন কিনা এ প্রশ্ন তাঁর কাব্য বিবেচনের ক্ষেত্রে অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তাঁর জীবনের কোন না-কোন ঘটনার সঙ্গে জড়িত

মাত্র কিছু কবিতার ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র তাঁর বহির্জীবনের প্রসঙ্গ উত্থাপনে কাব্য-সৌন্দর্যের উপলব্ধি বিষয়ে কোনও উপকার হয় না।

কবিতাকে গীতে রূপান্তরিত করা হয়নি রবীন্দ্রের এমন সহস্র যথার্থ গীতের অবয়ববিন্যাসে একপ্রকার সংক্ষিপ্ততা অথচ আদ্যন্ত-গ্রথিত নিটোল সম্পূর্ণতা দেখা যায়। এ সম্পূর্ণতা ভাবার্থের এবং ছন্দোবন্ধ ও সেই সঙ্গে সুরের। স্তবকশেষে ধুয়ার ব্যবহার, আবেগ সঞ্চারের জন্য একই বাক্যাংশের আবৃত্তি, রে হে প্রভৃতি শব্দাংশের ব্যবহার এবং ছন্দঃ-অতিরিক্ত শব্দের বিন্যাস প্রভৃতি দিক দিয়ে এই সব রচনার সংগীতধর্ম অভিব্যক্ত হয়েছে। সুরধর্ম ছাড়া ভাষা এবং অর্থে চিত্রময় ব্যঞ্জনা কতদূর বিস্তার লাভ করবে এক্ষেত্রে তা-ই আমাদের আলোচ্য।

'গীতাঞ্জলি'র প্রথমের কতকগুলি গান, যেমন—আমার মাথা নত ক'রে, আমি বহু বাসনায়, কত অজানারে—প্রভৃতি কবির উপলব্ধ ঈশ্বরসত্তার প্রতি শান্তিরসময় বৈরাগ্যভাবের দ্যোতক আত্মনিবেদন। এগুলি অর্থগৌরবপ্রধান, কিন্তু তত্ত্বের প্রকাশ নয়, আন্তরিক ভাবের রসায়নে সমুজ্জ্বল কাব্যকথা মাত্র। এগুলির মিলের বাহুল্য কোমলতার দ্যোতক। এর মধ্যে 'অন্তর মম বিকশিত করো' গীতের সার্থক বিশেষণ-বক্রতা এবং 'করো' ক্রিয়াপদের আদ্যন্ত প্রয়োগ এক চারুতার সঞ্চার করেছে। 'তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে'—কবির কল্পিত ঈশ্বরকে অনুভব করার বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, রূপের মধ্যে এবং গন্ধ, গান, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ানুভবের মধ্যে কবি তাঁকে ধরতে পারছেন। 'দুঃখে, সুখে, কর্মে' প্রভৃতি বর্ণনা থেকে ব্যঞ্জিত হচ্ছে যে এই ঈশ্বর সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির কর্মপ্রবাহের মধ্যেও বর্তমান। শুধু নিসর্গই নয়, মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যবস্থাদির মধ্যেও তিনি সঞ্চরণ করেন। "জগৎ জুড়ে উদার সুরে" "অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে" "ধনে জনে আছি জড়ায়ে" "এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে" প্রভৃতি ভাবাত্মক এবং কোথাও কোথাও নীতিমূলক গানগুলি এই পর্যায়ে পড়বে। এরই মধ্যে যেগুলি ভাব-লোক ত্যাগ ক'রে নীতির পাষাণে মূর্ছিত হয়েছে সেগুলি সুরের যোগেও কাব্য-মহিমা লাভ করতে পারে নি।

গীতাঞ্জলির শ্রেষ্ঠগানগুলির আত্মপ্রকাশে নিসর্গচিত্র তার মাধুর্য এবং অর্থ-সংগতির রমণীয়তা অর্পণ করেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে অরূপ কিভাবে ধীরে ধীরে কবির অনুভবের বিষয় হচ্ছেন তা খেয়া, উৎসর্গ এবং নৈবেদ্যের

মধ্যে আমরা দেখেছি। এর পর 'শারদোৎসব' ব'লে যে নাটক কবি লিখেছেন তার ভাবার্থে এবং গানগুলিতে (এর কয়েকটি গীতাঞ্জলিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে) প্রাকৃতিক রমণীয়তার মধ্যে অরূপের সঞ্চরণ স্পষ্ট হয়েছে। গীতাঞ্জলির এই শ্রেণীর গানগুলিব নিসর্গচিত্রে রয়েছে শরৎ এবং বর্ষা প্রধানভাবে। 'ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়' 'বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা' 'লেগেছে অমল ধবল পালে' 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' 'শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে' 'আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল' 'ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার'—এসব নিসর্গেরই কবিতা, অনুভব-বিশেষের দ্বারা বঞ্চিত। নিসর্গের বিস্তৃত বর্ণন ত্যাগ ক'রে কবি এমন বিশেষ বস্তু এবং রীতি অবলম্বন করেছেন যাতে উদ্দিষ্ট ভাব অনায়াসে সংকেতিত হতে পারে। সুরের সঙ্গে সহজেই যুক্ত হতে পারে ব'লে মাত্রাবৃত্ত এবং শ্বাসমাত্রিক ছন্দই গানগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা পূর্বের থেকেই লক্ষ্য করেছি যে যতি এবং অর্ধযতির সুষমাময় বিন্যাস একালের কবিতা পাঠে সহজ সৌন্দর্যের উদ্ভব অনায়াসেই ঘটিয়েছে। এই গানগুলি শুধু সুরের দিক থেকেই নয় ছন্দের দিক থেকেও সমঞ্জস এবং অনুপ্রাসের সংযোগে মধুর।

'বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ' দেখা যাক। এ গানটি নিঃশেষে শরৎসৌন্দর্য নিয়ে লেখা। ঈশ্বরের অনুভব এতে প্রকাশিত হয়নি, শরৎ-শ্রীকে সংবর্ধিত করা হয়েছে মাত্র। কয়েকটি নির্বাচিত নিসর্গচিত্র শরতের অপূর্বতা পরিস্ফুট করেছে এবং যতির সুষমা, মধ্যমিলের ব্যবহার এবং সর্বোপরি 'র' 'ল' ব্যঞ্জনের প্রয়োগের আধিক্য কাব্যাংশে একে সৌন্দর্য-প্রকাশের অনুকূল সুচারু কোমলতায় মণ্ডিত করেছে। নিসর্গের কল্পনা ও বাস্তব-মিশ্রিত চিত্রের শ্রেষ্ঠ স্থান হ'ল -

ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে।
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণ-মূলে !

আর এর সংকেতিত সৌন্দর্যের স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে শারদ-শ্রীর অলকের মণিদীপ্তির বর্ণনায়—'রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি ঝলকে অলককোণে'। নিশ্চিত এ-কল্পনা স্ফুরিত হয়েছে শরৎ-প্রাতের রবিকিরণস্পৃষ্ট মেঘগাত্র থেকে। এরকম আর একটি নিসর্গ-কবিতা হ'ল 'লেগেছে অমল ধবল পালে'। এর মধ্যে

ইহপার-পরপারের অর্থ-আবিষ্কার ভ্রমাত্মক। সম্ভবতঃ নীল আকাশে শুভ্র-মেঘের সঞ্চরণ কবিকে এই তরী-বাওয়ার কল্পনায় প্রবৃত্ত করেছে। এর কাণ্ডারী ঐ শরৎ-সৌন্দর্য, এখানে তার পুরুষ-রূপ। এর সদৃশ কল্পনা অন্যত্র হ'ল—'আজি শুক্লা একাদশী, হের নিদ্রাবিহীন শশী আকাশ-পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি'। 'কোন্ সাগরের পার হতে' ইত্যাদি অন্তরার কথায় কবির নিঃশেষ সৌন্দর্যলীন চিত্তের সর্বস্ব ত্যাগের সাধারণ মনোভাবই প্রকাশিত হয়েছে। এ-কাব্যের আদ্যন্ত বিস্ময়রস স্পন্দিত হচ্ছে। 'আমার নয়ন-ভুলানো' প্রভৃতির মধ্যেও শরৎ-শ্রীর রূপকল্পনা এবং কবির বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তের আনন্দের প্রকাশ। এই ধরনের সৌন্দর্যের রস-কল্পনাই কবিকে বিশ্বব্যাপী রসিকের কাছে আত্মনিবেদনে প্রবৃত্ত করেছে। এই ভাবের পরিচয় রয়েছে 'জগৎ জুড়ে উদার সুরে' ইত্যাদির মধ্যে। রবীন্দ্রের কল্পিত অরূপ তাঁর মনোবুদ্ধিনিহিত পূর্বতন আদর্শের প্রকারবিশেষ নয়। এ তাঁর কাব্যসৌন্দর্যের পথে প্রাপ্ত অনুভববিশেষ।

কবির বর্ষা-ভাবুকতার গানগুলি শরৎ-সৌন্দর্য-বিহ্বলতার গানগুলি থেকে গভীর কাব্য-সংকেতে নানা স্থানেই অধিকতর রমণীয় হয়েছে। একটি হ'ল **'মেঘের পরে মেঘ জমেছে'**। এটি মেঘদর্শনজাত বিরহবিধুরতার অপূর্ব সংগীত। কাতরতাময় প্রতীক্ষমাণ অবস্থার সংকেত এর কাব্যবীজ। 'শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে' এই কবি-প্রৌঢ়িতেই শ্রাবণের দিবসের ঘনীভূত বিরহ যেন মূর্তি ধরেছে। কল্পনায় প্রেমিকের অভিসার প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। 'নিলাজ-নীল আকাশ' ইত্যাদি অভিসারের অনুকূল পরিবেশ। শেষাংশে প্রতীক্ষমাণ হৃদয়ের কাতরতার ধ্বনি। এর পাঁচমাত্রার পর্বের অর্ধযতি-বিভাগ সর্বত্র ৩+২ (২+৩ নয়) এবং তাতেই এর কাটা-কাটা উচ্চারণে একটা সুষম ছন্দ-সংঘাত ফুটে উঠেছে—'একেলা কোন্ পথিক তুমি পথিকহীন পথের পরে'। **"আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল'** যদ্যপি সুরমাধুর্য-প্রধান এবং এর আকুলতার অভিব্যক্তি যদ্যপি গীতানুযায়ী সংক্ষিপ্ত, তবু এই ভাবসংহতির মধ্যে প্রাচীনতা-ধর্মী নিটোল পূর্ণাঙ্গ কাব্যশোভা ফুটে উঠেছে বলা যায়। অনির্দেশ্য বিরহ-কাতরতা-এর রমণীয় কাব্যার্থ। নিসর্গচিত্রকে মাত্র স্পর্শ ক'রে ঐ ব্যাকুলতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছেন কবি। লৌকিক শ্বাসমাত্রিক ছন্দে সহজ-অনুভবের ঋজুতা ফুটে উঠেছে। **"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভি"** এই শ্রেণীর মধ্যে কল্পচিত্রে সমৃদ্ধ একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা বললে চলে। 'সুদূর কোন্ নদীর

পাবে' ইত্যাদির মধ্যে নিসর্গ-সমাশ্রিত চিত্রের প্রকাশ। "আকাশ কাঁদে হতাশ সম" বর্ণনায় ঝটিকামুখর রাত্রির সামগ্রিক সৌন্দর্য উদ্দীপিত হয়েছে। কিন্তু "বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই" এই বিবৃতিতে হেতু-প্রদর্শনের অভিলাষ কল্পনাকে কিঞ্চিৎ দুর্বল করেছে ব'লেই মনে করি। নিসর্গরসবিহ্বল ভাবসংকেতের একটি শ্রেষ্ঠ গীতকথা হ'ল **'আর নাইরে বেলা'**। খেয়া কাব্যের 'ঘাটের পথ' কবিতার সঙ্গে প্রতীক্ষমাণ অবস্থা এবং পূর্বরাগসদৃশ ব্যাকুলতার দিক দিয়ে এটি একাত্ম, আর 'সেই অজানা বাজায় বীণা' ইত্যাদি কবির পূর্বেকার কল্পনাকুল চিত্তের প্রসারধর্মের সমসূত্রেই গ্রথিত। এই কাব্যবপুঃ অরূপের আগমনসংকেত কবি নানাভাবে আভাসিত করতে চেয়েছেন এবং এই অনুভব নিয়ে লেখা গানগুলিও কাব্যরসে অপূর্বতার স্বাদ দিয়েছে। কাব্যানন্দ বা অরূপের আবির্ভাবকে একটি বিশেষ রীতি সহকারেই কবি প্রকাশ করেছেন। নিঃসংশয়ে এই আনন্দসত্তা এই ধরনের গীতে ব্যক্তিরূপ লাভ করেছে এবং অনুরাগ-সম্পর্কের মধ্যগতও হয়েছে—

(১) দেখি নাই তার মুখ, আমি
শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার
পায়ের ধ্বনি খানি।

(২) সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগি নি

(৩) তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তার পায়ের ধ্বনি,
ঐ যে আসে, আসে, আসে।

(৪) ভোরের বেলায় কখন এসে
পরশ করে গেছ হেসে।
......জেগে দেখি আমার আঁখি
আঁখির জলে গেছে ভেসে।

কল্পিত অরূপসত্তার এই পদধ্বনি শোনা কবির নিবিড় উপলব্ধিগুলির মধ্যে একটি। 'পূরবী' কাব্যের 'পদধ্বনি, কার পদধ্বনি' প্রভৃতি কবিতায় এর সংকেত-রহস্য অধিকতর পরিস্ফুট।

কবির অনির্বচনীয় নিসর্গপ্রীতি-পর্যাকুলতার এই ধরনের গীতগুলি ছাড়া সাধারণ মানবজীবন এবং কবির ব্যক্তিজীবনের মর্ম নিয়ে লেখা গানও

গীতাঞ্জলির বিষয়। মানবজীবনের মধ্যেও কবি একের বিহারলীলার সংকেত উপলব্ধি করেছেন, আর ঐ একক সত্তাকে নিজ অনুভবের মধ্যে গ্রহণ ক'রে একটা হার্দ্য সম্পর্কও স্থাপন করেছেন। কিন্তু স্পষ্টতঃ, কাব্যের দিক থেকে, ব্যক্তিগত আবেদন-নিবেদন এবং সঙ্গানুভবের ঐ গীতগুলির রসবৈচিত্র্যের পার্থক্য ঘটে গেছে। এগুলির সঙ্গে ভক্ত এবং সাধকদের এদেশে বহুলদৃষ্ট গীতের সাজাত্য অনুভব করতেই হয়। নিসর্গাশ্রিত এবং রোম্যান্টিক কাব্য-উপলব্ধি থেকে সঞ্জাত গীতগুলি থেকে আত্মনিবেদনমূলক এবং কতকটা নীতি-মূলক এই গানগুলি কেবল ভাবেই নয় রূপেও কিছু পরিমাণে পৃথক্ হয়ে পড়েছে। এর অনেকগুলিই সংকেত অপেক্ষা বিবৃতির দিকে ঝুঁকেছে। অবশ্য স্বরসংযোগে এগুলিও রমণীয় হয়ে ওঠে, সেকথা বলাই বাহুল্য। এরকম অবস্থায়, রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার বহুলদৃষ্ট রোম্যান্টিক স্বরূপের কথা চিন্তা না ক'রে, এই গীতগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার ক'রে কেউ যদি এগুলির মধ্যে সাধকের ঈশ্বরোপলব্ধির পরিচয় পান এবং এগুলিকে যথার্থ ভক্তি-সংগীত বলেই মনে করেন, তাহ'লে তাঁকে আমরা প্রতিহত করতে চাই না। কোনও পাঠকের মর্ম যদি এগুলিকে সাধন-সংগীত রূপে গ্রহণ ক'রেই তৃপ্তি পায় তো তাঁর কাছে নিশ্চয়ই এগুলি ভারতীয় সাধকদের বিরচিত সংগীতের সজাতীয় এবং কোনও কোনও অংশে হয়ত বা উত্তমও। বস্তুতই 'ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়' অথবা 'এবার আমায় লহো হে নাথ, লহো' প্রভৃতি গীত নীতি-ময় এবং বিবৃতিপ্রধান হলেও "জীবন যখন শুকায়ে যায়" "যতবার আলো জ্বালাতে চাই" প্রভৃতির অধ্যাত্মের সগোত্র ভাব-সৌন্দর্য বিতর্কের অতীত। কিন্তু এ-প্রসঙ্গেও আমাদের বক্তব্য আছে। আমরা কবির শিল্পী-মনকেই এক্ষেত্রে প্রধান গীতরচয়িতা ব'লে মনে করছি। একালে তাঁর সঙ্গানুভবপ্রবণ চিত্ত ভারতীয় ভাবময়তার মধ্যে পরিভ্রমণ করেছে এবং শিল্পীসত্তা এই আহৃত ঐতিহ্যকে নিজ প্রকাশের মধ্যে রূপ দেওয়ার প্রয়াস করেছে। ক্ষণেকের জন্য আধুনিক কবি মধ্যযুগের সাধকদের সৃষ্ট ভাবপরিমণ্ডলকে আত্মস্থ করেছেন এবং এক একটি খণ্ড পরিচয়ে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে, আমরা যেসব প্রাচীন কবিকে সাধক ব'লে জানি তাঁদের বিষয়ও একবার ভেবে দেখতে পারি। চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, কবিশেখর, রায়শেখর প্রভৃতির যেসব পদ সাধারণের চিত্তে মুদ্রিত হয়ে আছে তার কারণ যে তাঁদের নিপুণ কবিকর্ম এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সন্দেহ থাকতে পারে না।

গোবিন্দদাস-জ্ঞানদাস অভিসার-রূপানুরাগের পদে তাঁদের সমস্ত ইন্দ্রিয় নিয়ে কি রূপসাগরে ডুব দেন নি? অভিসারের এত বিচিত্র পরিবেশ নির্মাণে কী প্রয়োজন থাকতে পারে সাধকদের? চণ্ডীদাস-নামধেয় কবিদলের বিরহ-ব্যাকুলতার মর্মস্পর্শী পদগুলি কি শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভগবদারাধনা-তত্ত্বের সূত্রগুলির বিশদ ব্যাখ্যা, না, কবির অন্তরে স্ফুরিত একটি কল্পলোকের আনন্দিত প্রকাশ? সাধন-ভজনে বিখ্যাত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর এরকম স্মরণীয় পদ লিখতে পারেননি কেন? বেশ বোঝা যায় কেন পরমানন্দ সেনকে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'কবিকর্ণপুর' আখ্যায় প্রকাশিত করেছিলেন। একজন অপ্রখ্যাত কবির—নরোত্তম-শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর কৃষ্ণরূপ-বিমুগ্ধতার অদ্ভুত প্রকাশ দেখা যাক—

> জড়িত-পীতবসন তড়িত জিনি ঝলমল,
> আন্দোলিত চরণাবধি হৃদিসরোজে বনমাল
> ... ...
> শ্যামগুণধাম পশি তাম-হৃদিমন্দিরে
> প্রাণমনজ্ঞান সখি, হরে নিল বাঁশিস্বরে,
> গঙ্গানারায়ণের যে দুখ সেকথা কহিব কারে,
> জানতে যদি যেতে গো সখি যমুনায় জল আনিবারে।

ছন্দে এবং মিলবিন্যাসে ইতস্তত: স্খলন দেখা গেলেও এ-পদ একজন রূপবিমুগ্ধ এবং নিরুদ্দেশ-ব্যাকুল কবির রচনা এ সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। সাধক হ'লে সেইসঙ্গে কবি হতে পারেন না, এমন কথা বিতর্কের বিষয় এবং বিতর্কশেষে অগ্রাহ্য হ'লেও একথা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত যে সেই সাধকেরা যখন রূপরসাদিময় বাক্য রচনা করছেন তখন তাঁরা এই দুঃখতাপদগ্ধ অথচ ইন্দ্রজাল-মোহ-সমাকীর্ণ মায়িক ভুবৃত্তেরই এক একজন পথিক, সেসময় তাঁরা আর নিদিধ্যাসন-পরায়ণ যোগী নন। বাউল কবিরাও যে-পরিমাণে শুষ্ক দেহতত্ত্বের পরিচয় ছন্দোবদ্ধ করছেন না সেই পরিমাণে কবিই। কবি রবীন্দ্রের ক্ষেত্রেও এ সম্পূর্ণ যথার্থ, তিনি আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক জগতের, পঞ্চস্থূল এবং পঞ্চসূক্ষ্মের ছন্দোময় বাণীর রূপকার। আর যদি একথা সত্য হয় যে আমাদেরও চিত্তে ক্ষণে-ক্ষণে কারণে-অকারণে অধ্যাত্ম-প্রবণতা জেগে ওঠে এবং রবীন্দ্রনাথও সেই স্বাভাবিক মনোভাবের অধিকারী হয়ে আমাদের সেই বাসনারই চরিতার্থতা সাধন করেছেন তাহলে কবির পার্থিবতাময় কবিত্ব-

স্বরূপের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটেনা। কবির অধ্যাত্মবিলাসের গ্রন্থন তাই নানা স্থানে আমাদের চিত্তাকর্ষকও হয়েছে।

কবির সাময়িক আত্ম-প্রতিক্ষেপ থেকে সঞ্জাত নিছক ভক্তিভাবানুকারিতার গানগুলির জন্য কিন্তু কবি স্মরণীয় নন। কারণ, অধ্যাত্মভাবুকতার পরিমাণ মধ্যযুগীয় ভারতে এত বেশি এবং সমুন্নত যে এর জন্যই রবীন্দ্রনাথ আমাদের শরণ্য হতে পারেন না। নিসর্গচিত্রের মধ্যে যেখানে অরূপ সংকেতিত হচ্ছে সেইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাঁর কালোচিত অভিনবতা। এক্ষেত্রে কবি-রবীন্দ্রই সমস্তকিছুর পুরোবর্তী।

পূর্বোক্ত অরূপের আগমনের বিশিষ্ট প্রকার ছাড়া অন্য কয়েকটি ভঙ্গির সাহায্যেও অরূপ-প্রসঙ্গ সংকেতিত হয়েছে। ঝটিকা ও বজ্রপাতময় দুর্যোগের চিত্র এবং তরী-বাওয়ার চিত্র এবিষয়ে প্রধান এবং আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। এছাড়া রাগিণী, বীণা এবং বংশীধ্বনিও রয়েছে। গীতিমাল্য এবং বিশেষভাবে গীতালির গানে এইসব চিত্রকল্পনা রবীন্দ্র-রীতিতে পরিণত হয়েছে। এরকম কোনও রচনা দেখলে আমরা নির্ভুলভাবে বলতে পারি যে এ রবীন্দ্রের অথবা তাঁর অনুসারী কোনও কবির। কয়েকটি উদ্ধৃত ক'রে দেখানো যেতে পারে:

(১) নিশীথ রাতের নিবিড় সুরে
বাঁশিতে তান দাও হে পুরে
একলা বসে শুনব বাঁশি
অকূল তিমিরে।

(২) বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, গগন অন্ধকার,
কে দেয় আমার বীণার তারে এমন ঝংকার।

(৩) এসেছিল নীরব রাতে
বীণাখানি ছিল হাতে

(৪) ঐ রে তরী দিল খুলে।

(৫) বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ গান।

(৬) এখনো যে সুর লাগেনি
বাজবে কি আর সেই রাগিণী

(৭) কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি

(৮) তরী কি তোর দিনের শেষে
ঠেকবে এবার ঘাটে এসে।

(৯) আমার অনাহত
তোমার বীণা-তারে বাজিছে তারা
(১০) মিলিয়ে নিয়ে তান
পুরবীতে শেষ করেছি যখন আমার গান

এগুলি খুব দ্রুতভাবে গীতাঞ্জলি থেকে আহৃত। এই সময়কার গীতোৎসারের মধ্যে কবির এমন রচনাও কম নয় যাতে সংগীতধর্মের চেয়ে কাব্যের ধর্মই বেশি পরিস্ফুট। কবির কাব্যই সংগীত এবং সংগীতই কাব্য হলেও আবৃত্তি-যোগ্য কবিতা হিসেবেই এগুলির সৌন্দর্য সমধিক। স্বরসংকেতের জন্য নয়, চিত্র হিসেবে যেগুলি অনন্য এবং কাব্যসুলভ ছন্দোময় বক্রোক্তির প্রকাশে যেগুলি উত্তম সেগুলিকে পাঠ্য কবিতারূপে গ্রহণ করাই শ্রেয়। মোটামুটি এরকম কবিতা হ'ল—হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে, হে মোর দুর্ভাগা দেশ, ভজন পূজন সাধন আরাধনা, আজি বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে, কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো, কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি, বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা, বিপদে মোরে রক্ষা করো, সীমার মধ্যে অসীম তুমি—ইত্যাদি গীতাঞ্জলি। 'রাগিণী এবং কাব্যরসের পরিণয়বন্ধনে' কাব্য-রস যে 'পতিত্বের অধিকার' পেয়েছে একথা তো সত্য।

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের এবং অনুরূপ অন্যস্থানের ভক্তিভাবের অনুকারী গানগুলি সম্পর্কে আমাদের উল্লিখিত ধারণার অর্থ এই নয় যে রবীন্দ্রনাথ ধর্ম-বিষয়ে আন্তরিকতাহীন ছিলেন। তার অর্থ এই যে যাকে আমরা এতদিন ধর্মভাবুকতা ব'লে জানি, কবি সে-পথের পথিক ছিলেন না। তাঁর যথার্থ ধর্ম নিসর্গ-আশ্রিত কাব্যাস্বাদময় অরূপস্পর্শের ব্যাকুলতার ধর্ম। গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যের স্মরণীয় গানগুলিতে তার মহিমাও আমরা দেখেছি। অথচ চিরাচরিত রীতির ভক্তি এবং নীতির গানগুলি থেকে এ কতই পৃথক্! এগুলির শব্দে ধ্বনির চারুতা, অর্থে চিত্রসমাবেশ এবং সংকেত-প্রাধান্য। কিন্তু নিসর্গ যেখানে প্রধানভাবে প্রতীত হচ্ছে না এমন অরূপ-প্রকাশের কিছু গান দেখা যাক, যেখানে কবির কল্পনা নিতান্ত অভিনব এবং অরূপ বাস্তব জীবন থেকে আহৃত একটি চিত্রগত ভাবস্পর্শ মাত্র। গীতবিতানের 'পূজা'-বিভাগ থেকে স্বচ্ছন্দে কয়েকটি গীতাংশ উদ্ধৃত করা গেল।

(১) এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ-ঢালা

(২) নমি নমি তোমারে হে অকস্মাৎ
গ্রন্থিচ্ছেদন-খরসংঘাত—
লুপ্তি, সুপ্তি, বিস্মৃতি হে, নমি নমি ॥

(৩) হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ।

(৪) তিমিররাত্রি, অন্ধযাত্রী,
সম্মুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে।

(৫) তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে।

(৬) এ ঘোর রাতে কিসের লাগি পরান মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি।

(৭) মরতে মরতে মরণটারে শেষ ক'রে দে একেবারে
তার পরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।

(৮) আকাশকোণে সর্বনেশে ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে,
প্রলয় আমার কেশে বেশে করছে মাতামাতি।

(৯) মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয় ॥

(১০) মরণেরই পথ দিয়ে ওই আসছে জীবন-মাঝে,
ও যে আসছে বীরের সাজে।

(১১) আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয়না কিছুই আলো।

(১২) মরণ-বীণায় কী সুর বাজে তপন-তারা-চন্দ্রে রে—

(১৩) আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে।

(১৪) প্রভাতসূর্য এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে—

(১৫) জয় তব ভীষণ সব-কলুষ-নাশন রুদ্রতা।
জয় অমৃত তব, জয় মৃত্যু তব,
জয় শোক তব, জয় সান্ত্বনা।

(১৬) পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়॥

—ইত্যাদি।

এই সব গানে বহু কবিতার মতই ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহ-সূর্য-তারকা, পৃথিবীর ঋতু-পরিবর্তন প্রভৃতির কল্পনা গ্রথিত হয়েছে। মৃত্যু, জীবন, মুক্তি সম্পর্কে উল্লেখও পুনঃ পুনঃ পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়া গগন, পবন, হৃদয়, চিৎ, দেহ প্রভৃতি বিষয়ের সাহায্যও অধ্যাত্মসংগীত রচয়িতাদের মত কবি পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, এই সব বস্তুর ব্যবহারে কবি স্বকীয় স্বার্থই সিদ্ধ করেছেন, যেমন, 'হৃদ্‌গগনে পবন হ'ল সৌরভেতে মন্থর' 'আমার এই দেহখানি তুলে ধরো, তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো' প্রভৃতি। অর্থাৎ আমাদের দেশের রবীন্দ্র-পূর্বেকার ভাবসাধকেরা ঐ সব বিষয়ের মুহুর্মুহু উল্লেখ করলেও তাঁরা এর দ্বারা যা প্রতিপন্ন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তা করেন নি। রবীন্দ্রের ব্যঞ্জিতার্থ ভিন্ন ব্যাপারকে নির্দেশ করেছে। খেয়া, তরী, মাঝি, নেয়ে প্রভৃতি বিষয়ের রূপক এবং সংকেতের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথ বাউলদের মতই যদ্যপি করেছেন, সবত্র তাঁদের অর্থে করেছেন কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া ঝটিকা, বজ্র, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিষয়ের ব্যবহার একমাত্র তাঁরই। অরূপ সম্পর্কে উপলব্ধির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে গিয়ে কবি আলোক, আনন্দ, সুন্দর এবং ভয়ংকর, সর্বনাশ প্রভৃতি দুই বিপরীত শ্রেণীর শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে আনন্দ, সুন্দর প্রভৃতি শব্দ তাঁর পিতার রচনা থেকে বা ব্রহ্মসংগীত থেকে গৃহীত হলেও এগুলির সংকেতিতার্থ সর্বত্র মহর্ষিকে অনুসরণ করেনি।

বিভিন্ন ঋতু এবং নিসর্গ-সম্পর্কিত গীতেই রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ। গানের মধ্যে এগুলিই তাঁর রমণীয় সৃষ্টি এবং সমধিক জনপ্রিয়ও বটে। ধারাবাহিকতা থেকে ভিন্ন ব'লেই লৌকিক, ক্লাসিক্যাল বিভিন্ন সুররীতির মিশ্রণ-বৈচিত্র্য এগুলিতেই সবচেয়ে বেশি। রবীন্দ্র-রচিত খাঁটি মার্গসংগীতগুলির পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসে আমাদের তেমন কোনও লাভ নেই, কারণ, কাব্যাংশে সেগুলি সর্বত্র লোকোত্তর হয় নি। রবীন্দ্রের সংগীত-সাধনার প্রকার জানতে যাঁরা উৎসুক এমন সংকীর্ণ গীতরসিক সমাজেই সেগুলি আবদ্ধ থাকা সম্ভব।

ভাষা এবং কল্পনা এবং তদনুযায়ী সুর গ্রথিত ক'রে প্রকৃতি বা ঋতু-

সংগীতগুলিতে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য কবিত্বের অমৃত বিতরণ করেছেন। এগুলি উদ্দেশ্যহীন, নেহাৎই কল্পলোকের, তাই আবেদনে এত রমণীয়। একটা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে পরিচিত গানই দেখা যাক না—**'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে'**। গীতবিতানে এটি প্রেম-পর্যায়ে স্থান পেয়েছে, হওয়া উচিত ছিল প্রকৃতি-পর্যায়ের। Personification বা চাঁদ, রজনীগন্ধা, বাতাসের উপর মানুষের ব্যবহার সমারোপের জন্যই আদিরসের আভাস এদের ঘিরে রয়েছে। এর দ্বিতীয়াংশের 'পারিজাতের কেশর নিয়ে' 'বাণীবনের হংসমিথুন' প্রভৃতি যাবতীয় শব্দবিন্যাস শুধু অব্যক্তকে ব্যক্ত করার জন্য। জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যা যে মায়ালোক রচনা করেছে তার বিস্ময় কবিকে সীমাহীন অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি প্রভৃতি দিয়েই গঠন করতে হয়েছে। নিসর্গ সম্বন্ধে কবিতাতেও যেমন গানেও তেমনি নিসর্গবস্তুর উপর বিরহী, মিলনোৎসুক, প্রতীক্ষমাণ, পথিক, পাগল প্রভৃতির ব্যবহার-সমারোপেই বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। কবি নিসর্গের মধ্য দিয়ে কোনও সত্তার আবির্ভাব যখন ব্যঞ্জিত করছেন তখন একটি সামাগ্রিক ব্যক্তিরূপের চিত্র তাঁর কল্পনায় ধরা পড়েছে এমন বলা যায়, যেমন, 'তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক, আমি দেখি নাই তোমারে' 'পুব-সাগরের পার হতে কোন্ এল পরবাসী' ইত্যাদি। অর্থচিত্রের বিভিন্ন রীতির মধ্যে এই সমাসোক্তিই প্রধান স্থান অধিকার ক'রে আছে, ক্বচিৎ রূপক, ক্বচিৎ উৎপ্রেক্ষা-অতিশয়োক্তি। কয়েকটি উত্তম সমাসোক্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—

(১) জটার গভীরে লুকালে রবিরে
ছায়াপটে আঁক এ কোন্ ছবি রে।

(২) ছায়া ঘনাইছে বনে বনে,
গগনে গগনে ডাকে দেয়া।
কবে নবঘন-বরিষণে
গোপনে গোপনে এলি কেয়া।

(৩) বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ়, তোমার মালা

(৪) কদমকেশর ঢেকেছে আজ বনতলের ধূলি,
মৌমাছিরা কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভুলি।

(৫) কাঁপিছে বনের হিয়া বরষণে মুখরিয়া,
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবঘনমন্দ্রে।

(৬) কেশরকীর্ণকদম্ববনে মর্মরমুখরিতমৃদুপবনে
বর্ষণহর্ষ-ভরা ধরণীর বিরহ-বিশঙ্কিত করুণ কথা।

(৭) মত্ত হাওয়ার ছন্দে,
মেঘে মেঘে তড়িৎশিখার ভুজঙ্গপ্রয়াতে।

(৮) ঝঞ্ঝন মঞ্জীর বাজায় ঝঞ্ঝা রুদ্র আনন্দে।
কল কল কলমন্দ্রে নির্ঝরিণী
ডাক দেয় প্রলয়াহ্বানে।

(৯) মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা,
পাথায় বাজায় তার ভিখারির বীণা,
মাধবী-বিতানে বায়ু গন্ধে বিভোল।

(১০) গন্ধে উদাস হাওয়ার মতো উড়ে তোমার উত্তরী,
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।

(১১) হে মাধবী দ্বিধা কেন, আসিবে কি, ফিরিবে কি—

(১২) আজ শুক্লা একাদশী, হেরো নিদ্রাহারা শশী
আকাশ-পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি।

—ইত্যাদি

কবির কতকগুলি নিসর্গ-সংগীতে ধ্বনি বা অনুপ্রাসই প্রধানভাবে ব্যঞ্জনার কারণ হয়েছে।

শরৎ-সম্পর্কিত গীতে ধ্বনিসমারোহ বিশেষ নেই বললেই চলে। বসন্ত-বিষয়ে কিছু আছে মাত্র, কিন্তু এই বর্ষা-গীতিকাতেই ধ্বনির প্লাবন নেমেছে। উপযুক্ত ধ্বনির সাহায্যে কবি তার কথা-সুর মিশ্রণের রম্যার্থ নিঃশেষে পরিস্ফুট করেছেন। বসন্ত এবং বর্ষার নিম্নলিখিত গানগুলি এবিষয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লিখিত হতে পারে। 'আজ বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' 'মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখি' 'গন্ধাবধুর সমারণে' 'ওগো বধূ সুন্দরী' 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে' 'আজ কমলমুকুলদল' 'ওরা অকারণে চঞ্চল' প্রভৃতি বসন্ত-বিষয়ে এবং 'নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায়' 'ঝরে ঝরঝর ভাদর বাদর' 'এস নীপবনে ছায়া-বীথিতলে' 'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা' 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু' 'তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে' 'আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু' 'মম মন-উপবনে চলে অভিসারে' 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' 'সঘন গহন রাত্রি' প্রভৃতি বর্ষা-বিষয়ে শতাধিক গান রয়েছে যেখানে বিশেষভাবে ধ্বনিসৌন্দর্যই চিত্রগীতের সমস্ত

মহিমা প্রায় এককভাবে বহন করেছে। অর্থগত অলংকারকেও ধ্বনিগুণ আত্মসাৎ করেছে এবং কবি এই সব গীতে সুরকে কিভাবে অনুপ্রাসের সঙ্গে যুক্ত ক'রে রমণীয়তা সৃষ্টি করেছেন তা শ্রোতামাত্রই জানেন।

রবীন্দ্রের কবিস্বরূপ অনুধাবনে তাঁর রূপলুব্ধ স্বভাব সম্পর্কে অনবহিত থাকা উচিত হবে না। কাব্য-নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবরস এবং তত্ত্ব তাঁর মৌলিক-কল্পনা-সম্ভূত হলেও রূপের দিক থেকে তিনি সমাহরণের উপরই অধিক আস্থাবান ছিলেন। বাল্মীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলার সুরশিল্প এবং গীতরীতি থেকে আরম্ভ ক'রে গদ্যচ্ছন্দ, নৃত্যনাট্য, মূকাভিনয়ের অধ্যায় পর্যন্ত রূপশিল্পে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমস্ত সাহিত্যস্রষ্টাকেই অতিক্রম করেছে। এক্ষেত্রে যেমন য়ুরোপ তেমনি ভারতীয় এবং বহির্ভারতীয় পূর্বদিগন্তও তাঁকে কাব্য-গীত-নাট্য-নৃত্যের বিচিত্র রূপানুশীলনে প্রলুব্ধ করেছে। কবিতায় চরণ-স্থাপন এবং মিলবিন্যাসের অসীম বৈচিত্র্য তাঁর প্রতিভা-সংলগ্ন প্রকাশশিল্পের অনায়াস অভিব্যক্তি, কিন্তু গীত ও নাট্যে এবং সম্ভবতঃ উপন্যাস ও ছোটগল্পে তাঁর সজ্ঞান শিল্পপ্রয়াস অল্পবিস্তর লক্ষ্যগোচর করা যায়। যাই হোক, উত্তম কবিমাত্রেই আর্টিস্ট এবং বড় জীবন-সমীক্ষক যিনি, তিনিও প্রকাশশিল্পে নগণ্য হতে পারেন না। আর রবীন্দ্রনাথের শিল্পের প্রতি প্রবল আগ্রহ যে তাঁকে নানান্ স্থানে কলাকৈবল্যবাদী ক'রে তুলেছে তার প্রমাণ আমরা পূর্বেই পেয়েছি।

এই প্রবল গীতোৎসারের অধ্যায় থেকে দীক্ষিত হয়ে কবি ভাবসংকেত-প্রধান নাট্য রচনায় অভ্যস্ত হয়েছেন এবং পরে নিতান্ত কাব্যরসময় ঋতুনাট্যের গ্রন্থন করেছেন। কিন্তু সংকেত-প্রধান নাটক, যেমন, ডাকঘর, রাজা, রক্তকরবী প্রভৃতির রচনায় তিনি প্রযুক্তি এবং গ্রন্থন-বিষয়ে পশ্চিমের নাটকের অনুসরণ করেছিলেন এমন কথা মনে করার কোনও কারণ নেই। ক্বচিৎ কোন পরিবেশ-নির্মাণ অথবা দৃশ্য-যোজনায় তাঁর দৃষ্ট কোনও পশ্চিমা নাট্যকৃতির কোনও প্রভাব যদিও বা থাকে, সামগ্রিক গঠনে তাঁর স্বকীয় উদ্‌ভাবন-শক্তি এবং রূপবিলাসী চিত্তের নির্মাণ-লীলাকেই অগ্রবর্তী ধরতে হয়। এই নাট্যসমূহে ভাবদ্বন্দ্ব এবং ভাবপরিণাম গীতের স্বরূপ রক্ষা করছে, আর চিত্রসম্পদ্ অক্ষুণ্ণ রেখেছে রূপসজ্জা, মঞ্চসজ্জা, বিভিন্ন চরিত্র এবং চারুতাময় সংলাপ-পদ্ধতি। সংকেত-ধর্মী নাট্যের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভিন্ন চিত্ররীতি হয় কোনও বস্তু, নয় কোনও ভাব ব্যঞ্জিত করে। যেমন 'রক্তকরবী' নাট্যে জালাবরণ সংকেতিত

করছে রাজার জটিল অন্ধ সংস্কার, রক্তকরবী সংকেতিত করছে একদিকে যৌবন ও প্রাণের প্রাচুর্য, অন্যদিকে ভয়ংকর সৌন্দর্য। 'রাজা' নাটকে রাজার অরূপত্ব রাজা-সম্পর্কে কবির স্থির ধারণাকে ব্যঞ্জিত করছে। রক্তকরবীতে রঞ্জন ভাবময় ঐ অরূপ ব'লেই অমূর্ত। 'নন্দিনী' ঐ অরূপের অর্থাৎ সৌন্দর্য-সত্য এবং যৌবন-সত্যের সেবিকা, তারই দৌত্য করছে অবরুদ্ধ মানুষের কাছে। আর যাবতীয় গীত বিশেষ-বিশেষ ভাবসংকেতের দিকে দর্শকদের মন ও বুদ্ধি চালিত করছে। এইভাবে কবি স্বকীয় উপলব্ধি অনুসারেই নাট্যে রূপ ও অরূপের সামঞ্জস্য গ্রন্থন করেছেন। ভাবসংকেতের নানান্ উপাদান প্রাচ্যেই এত বেশি পরিমাণে ছড়িয়ে আছে যে এর জন্যে পাশ্চাত্যের ঋণের কল্পনা অকর্তব্য।

নাট্য সংকেত-ধর্মী বা রূপকাশ্রয়ী হলেও তাতে বাস্তব উপাদানের মিশ্রণ অস্বাভাবিক নয়। বরং চিত্ররীতির জন্য বাস্তবের নির্মাণ অপরিহার্য। এইভাবে রক্তকরবীতে খনির শ্রমিকদের জীবনচিত্র, সর্দার, গোঁসাই প্রভৃতির ভূমিকা কতকটা যথাযথভাবেই নির্দিষ্ট হয়েছে। রক্তকরবীর বাস্তব উপাদান মানুষের প্রাণের উপর নিপীড়ন এবং সংস্কার-অন্ধতাকে চমৎকার পরিস্ফুট করেছে। 'মুক্তধারা'য় একাজ করেছে অম্বা এবং উত্তরকূট ও শিবতরাইয়ের জনতা; অচলায়তন, রাজা প্রভৃতিতেও জনতা-দৃশ্য। কিন্তু রক্তকরবীর বাস্তবানুকৃতিই বোধ হয় সবচেয়ে প্রবল। এত প্রবল যে একে স্বচ্ছন্দে ধনতান্ত্রিকতার বিনাশ এবং সমাজতন্ত্রের অনিবার্য বিজয়-পদক্ষেপের ভাবময় বাস্তব নাটক হিসেবে গ্রহণ ও নাট্যে সমারোপ করা চলতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে একটা প্রবল প্রতিবন্ধক রয়েছে। তা হ'ল খনির মালিকের অন্তরঙ্গভাবে ধনতন্ত্র-বিরোধিতা ও পরিণামে স্বহস্তে বিনাশের উল্লাস। এ পরিস্থিতি বাস্তব হতে পারে না। পাগল না হ'লে, কোনও পুঁজিবাদী সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে ধনতন্ত্র ধ্বংস করছে এ সম্ভব হতে পারে না। যদিও ইতিহাসে এবিষয়ে একটিমাত্র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে, তা হ'ল Robert Owen-এর, এবং সম্ভবতঃ এই দৃষ্টান্তই কবিকে রাজার আত্ম-বিদ্রোহের অবিশ্বাস্য চিত্র-নির্মাণে প্রেরণা দিয়েছে। রক্তকরবী ঠিক Class-struggle-এর পরিণামকে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হয়নি, তবু দুই বিভিন্ন ভাবসংঘাতের দ্বন্দ্বকে এতে স্পষ্টভাবেই দেখানো হয়েছে। এর অর্ধেক কাব্য-কল্পনা, অর্ধেক বাস্তব এবং দুয়ে মিলে এর মধ্যে মহৎ নাট্য-সম্ভাবনাই সুপ্ত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের

এই শ্রেণীর নাটকের বিচারে বিভিন্ন উপাদানের স্বকীয় গ্রন্থনের কথাই চিন্তা করতে হবে। প্রয়োগে-পরিণত নাট্যের সাফল্য-অসাফল্যের বিচারের ভার অবশ্যই বিদগ্ধ দ্রষ্টার উপর।

আমাদের ধারণায় বাঙলায় বহুল প্রচলিত যাত্রাগানের রীতি কবিকে আকৃষ্ট ক'রে গীতসংবলিত নাট্যের বিন্যাসে প্রবৃত্ত করেছে। এই রচনাগুলির সংলাপে, চরিত্রে এবং ঘটনা-গ্রন্থনে নিতান্ত সারল্য পাঠক ও দর্শকমাত্রকেই আকৃষ্ট করে। কাল্পনিক চরিত্র-নির্মাণ, ঘটনা-বিরলতা, দ্বন্দ্বসংঘাতের ভাব-নিলীনতা প্রভৃতির দিক থেকেও প্রসিদ্ধ প্রাচ্য নাটকীয়তার সঙ্গে এগুলি অভিন্ন। তাঁর মঞ্চের গতানুগতিক সজ্জাহীনতা, কুশীলবের বেশভূষায় ব্যঞ্জনা-প্রাধান্য প্রভৃতিও এদেশীয় যাত্রা, সঙ, চিত্রনৃত্য প্রভৃতির সদৃশ। আমাদের ভাবপ্রধান পৌরাণিক নাটকেও রূপক এবং সংকেতের বিস্তৃত প্রয়োগ লক্ষণীয়। অতিপ্রাকৃত চরিত্রের রূপ, নিয়তির ভূমিকা, সখী বা বালকদলের গীত প্রভৃতি যাত্রাগানের বিচিত্র কৌশলকেই কবি নূতন ভঙ্গি দিয়ে প্রকাশ করেছেন। ফলতঃ রূপের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ অপরিচিত এবং দুরূহ বস্তু পরিবেশন করেছেন এমন ধারণাও ভ্রমাত্মক। কাব্যে, নাট্যে, এমন কি গদ্যেও (এক-মাত্র প্রৌঢ়োত্তর জীবনের কিছু আলংকারিক রচনা ছাড়া) ভাষায় এবং রূপে রবীন্দ্রনাথ আয়াসবোধ্য কুত্রাপি নন। প্রকাশগত সারল্যই তাঁর কবিস্বরূপের মহিমা। দেখতে হবে যে, একমাত্র কল্পনাভঙ্গিতে তাঁর বিশিষ্ট মানসিকতার বর্ণসম্পাত ঘটেছে ব'লে এবং সেক্ষেত্রে মুখ্যভাবে আমাদের সহৃদয়তার অভাবের এবং তাঁর সমুচ্চ বিদগ্ধতার জন্য তিনি দুরূহ বলে প্রতিভাত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নানান্ লোক-সংস্কৃতিকে যদ্যপি বরণ করেছেন তাকে নিজ কবিস্বভাবে বা শিল্পী-স্বভাবে মিলিত করেই নিয়েছেন। ফলে নানা বিষয়ে সারল্য থাকলেও তিনি রামায়ণকার বা পাঁচালিকার বা বাউলদের মত লোকসাহিত্যের কবিও হতে পারেন নি।

কাব্যে রবীন্দ্রনাথ মিলবিন্যাস, চরণ-স্থাপন, বিভিন্ন মাপের পর্বের ব্যবহার নিয়ে বৈচিত্র্যসাধন সব সময়েই ক'রে এসেছেন, কিন্তু এই গীতরসের অধ্যায়ের শেষের দিকে এমন একটি বলিষ্ঠ প্রকাশরীতির সন্ধান পেয়েছেন যা তাঁর একালের কল্পিত তত্ত্বময়তা বা পরিণত ভাবুকতাকে স্বপ্রকাশ করতে বিশেষ সাহায্য করেছে। তাত্ত্বিকতার মায়ার সঙ্গে একাত্ম এই প্রকাশলীলাকে আমরা এখন পরবর্তী অধ্যায়ে দেখব।

সংকেতময় অর্থচিত্রের এবং প্রত্যয়নিষ্ঠ কল্পনার প্রাধান্য

বলাকা-মহুয়ার যুগ

অরূপ-সংকেতের পর কবি পুনশ্চ জীবন-সৌন্দর্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন। বলাকায় মুখ্যভাবে আত্মেতর বিশ্বজীবন, 'পুরবী'তে মুখ্যভাবে আত্মজীবন। 'পলাতকা'য় 'মুক্তধারা'য় 'রক্তকরবী'তে অবরুদ্ধ মানুষের জীবন, 'মহুয়া'য় কর্মী নরনারীর প্রণয়াশ্রিত জীবন। পূর্বেকার পদ্মাতীরভূমি-সংসর্গ থেকে স্ফুরিত, মধুর এবং কোমল অথবা সুকরুণ প্রশান্ত জীবন-সৌন্দর্য এ নয়। এ বাস্তব, কঠিন, রুক্ষ, ধূলিধূসর—সংস্কারে জীর্ণ এবং আঘাতে উদ্বোধিত গতিশীল জীবনের ছবি। এর মধ্যে স্নেহ-প্রেম-বেদনার পূর্বকল্পিত সুধাস্পর্শ নেই; আহতের আর্তনাদ, বিজয়ীর শঙ্খধ্বনি, চলমান পথিকদলের অবিশ্রান্ত পদক্ষেপে এর জীবন তীব্র-সুন্দর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে গীত সংযত, সুর স্তম্ভিত, শব্দধ্বনি অর্থধ্বনির বশীভূত। এর প্রতিপদে অর্থগত চিত্র ও সংকেতের সমারোহ এবং কল্পিত দৃঢ় প্রত্যয়ের যোগে তা দার্শনিকতায় আভাসিত। 'বলাকা'য় মাত্রাবৃত্তছন্দের লীলায়িত স্থৈর্যের বন্ধন নেই, 'পলাতকা'য় কেবল শ্বাসমাত্রিকের দ্রুতপ্রবাহ, 'পূরবী'তেও মাত্রাবৃত্তের প্রয়োগ অতিসীমিত। কবির প্রিয় অমিতাক্ষর-মিত্রাক্ষর ছন্দোরীতিই বলাকায় অর্থসংকেতের প্রয়োজনে কখনও বিস্তৃত কখনও সংকুচিত, তা ছাড়া শ্বাসমাত্রিকের নির্মাণও এতে রয়েছে।

মধুসূদন ভাবার্থকে প্রবাহিত করার জন্য চরণান্ত ছেদবিধি অস্বীকার করেছিলেন এবং মিলের মাধুর্য খর্ব করেছিলেন। কিন্তু পয়ারের পরিমিত আট-ছয়ের যতিবন্ধন তিনি রক্ষাই করেছিলেন। তাঁর ছন্দের মুক্তি এরই আশ্রয়ে সম্পাদিত, এ নিঃশেষ মুক্তি নয়। রবীন্দ্রেরও নয়। তাঁর 'বলাকা'র অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতির কবিতাগুলিতে আট, ছয়, দশের যতি অবলম্বিত হয়েছে, আট এবং দশে যুক্ত হয়ে কখনও চরণ আঠারো মাত্রার পর্যন্ত হয়েছে। যেখানে চরণবিন্যাস ছয়েরও কম মাত্রার সেখানে বুঝতে হবে কবি অর্ধযতিতেই চরণ সীমিত রাখছেন এবং হয়ত দু চারটি ক্ষেত্রে অতিমাত্রিক

শব্দ দিয়েও (যেমন—তবে, তাই) চরণ গ্রন্থন করছেন। শ্বাসমাত্রিকের বেলায় চারের নিচে চরণই নেই। দেখতে হবে, ঐরকম ছয়ের নিম্নে চরণ-বিভাগের বেলায় কিন্তু বিজোড় মাত্রার ব্যবহার কুত্রাপি নেই। মিলে গ্রথিত হয়ে অতিমাত্রিক পর্বাংশও ছন্দের বশবর্তী হয়েছে সর্বত্র।

সুতরাং বলাকায় ছন্দ আছে, আবার স্থান বিশেষে অনুপ্রাস বা শব্দধ্বনি-মাধুর্যও আছে। কিন্তু বিশেষ এই যে, অর্থবৈচিত্র্য বলাকায় প্রধান হয়ে ছন্দ এবং শব্দের ধ্বনিসংকেতকে অর্থাৎ এর গীতের দিকটিকে অতিক্রম করেছে। বাস্তব জীবনের নূতন প্রতিঘাতে কবি যে কল্পিত সুদূরের দিকে পাখা বিস্তার করেছেন তা-ই হয়ত এই ধরনের অর্থশক্তিযুক্ত প্রৌঢ় বাণীচিত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছে। রবীন্দ্র-কবিস্বভাবের চঞ্চলতা এবং শিল্পানুগত্যও নূতন ছন্দ ও ভাষাবিন্যাসের কতকটা কারণ হতে পারে। অথচ পূর্বে রচিত সদৃশ-মনোভাবের কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে' এখানকার মত নিপুণ অর্থনির্মাণের নিদর্শন বহন করে না, তীব্র ও অসংযত আবেগের আন্দোলনে ওর বাক্-পরিমিতি বিস্রস্ত হয়েছে। ঐ কবিতার বর্ণনাপ্রিয়তা চিত্রগত আর্টকে নিঃশেষে অবহেলা করেছে। বলাকায় ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস প্রকাশের অবসর যথেষ্ট থাকলেও উত্তম কবিতাগুলিতে প্রায়শই উচ্ছ্বাস অবনমিত। কিন্তু নীতি বা তত্ত্বভাবনা-প্রধান কয়েকটি কবিতাও এতে স্থান পেয়েছে, যার মধ্যে বাক্যের চিত্ররীতির প্রকাশ নেই বললেও চলে। সেগুলি কবিতা হয় নি, তত্ত্বের বিবৃতি হয়েছে মাত্র। আমরা পুর্বেই দেখেছি, অরূপ-সংকেত-পর্যায়ের মধ্যেকার কতকগুলি নীতিমূলক গানে কবির লেখনী অত্যন্ত গতানুগতিক ভক্তি প্রকাশের পথ আশ্রয় করেছে।

এখন 'বলাকা'র কয়েকটি কবিতা লক্ষ্য করে সেগুলির শব্দার্থনির্ভর উৎকর্ষাপকর্ষ পরীক্ষা করা যাক।

প্রথম কবিতা—**'সবুজের অভিযান'**। কবিতাটির সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল ভাষাভঙ্গির অতি-সাধারণত্ব। ছড়ার ছন্দে লেখা 'ক্ষণিকা'র কবিতাগুলিতেও এরকম নিতান্ত কথ্য শব্দ এবং ইডিয়মের প্রয়োগ নেই। গীতালির গানে মৌখিক ভাষার দৃষ্টান্ত মিললেও 'বাঁশের মাচা' 'দেদার' প্রভৃতির মত কবিতায় সচরাচর পরিত্যাজ্য-শব্দাবলীর ব্যবহার নেই। তবু 'বলাকা'র এই ছড়ার ছন্দের কবিতাগুলির সঙ্গে অর্থে ও প্রকাশে গীতালিরই সাজাত্য বেশি। 'ক্ষণিকা'র লৌকিক বাঙলাতেও অলংকরণের অভাব নেই। কিন্তু এখানে ভাষা

সমস্ত অলংকরণ ত্যাগ করতেই চেয়েছে। ছন্দোবদ্ধ বাক্যের ভাষায় বাইরের দিক থেকে কবির নিতান্ত সহজ হবার প্রয়াস প্রবল হয়েছে তাঁর একালের ভাব-সংকেতময় নাট্যগুলির রচনা-সময় থেকে। ঠাকুরদা-চরিত্র এবং তাঁর মুখে স্থাপিত গানগুলির কথা স্মরণ করুন। জনগণের খেলার সঙ্গী ঠাকুরদার উপস্থাপনে কবি সর্বাঙ্গীন সহজরীতি অবলম্বন করেছিলেন। তারপর লৌকিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের বিষয় প্রবল হয়ে তাঁর যেসব গানের জন্ম দিয়েছে (অর্থাৎ গীতালির বহু গান), সেখানেও ঐ সূত্র অনুসরণ ক'রে তিনি যতদূর সম্ভব সহজ হয়েই উঠেছেন। 'সবুজের অভিযান' বা 'সর্বনেশে'র মত দুচারটি বলাকার কবিতায় তাই এই নিরলংকার প্রকাশের প্রয়াস। তবু ঐ 'পুঁথি-পোড়ো' এবং 'বাঁশের মাচা' এবং 'অফুরান ছড়িয়ে দেদার' প্রভৃতির সঙ্গে 'প্রমুক্ত' 'প্রমত্ত' 'পূজাবেদী' 'বকুল-মাল্য' প্রভৃতির একত্রীকরণও লক্ষ্য করবার বিষয়। পরবর্তী কবিতা দুটিতে প্রকাশরীতির এই অতিসামান্যতা তেমন লক্ষণীয় না হলেও অবিদ্যমান নয়, যেমন, 'চাহিস্‌নে আর আগুপিছু' 'এবার যে তোর ভিত নড়েছে' 'আছে ওরা গণ্ডি পেতে' 'কেবলি ফাঁদ ফাঁদবে' ইত্যাদি। কিন্তু এ দুটি কবিতার কয়েক পঙ্‌ক্তিতে চিত্রসংকেত যোজিত হয়ে কবিতার মধ্যে স্থানিক রমণীয়তারও সৃষ্টি করেছে, যেমন—

রক্ত-মেঘে ঝিলিক মারে,
বজ্র বাজে গহন-পারে,

* *

কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি
ফুটবে না।
চরণে তোর রুদ্রতালে
নূপুর বেজে উঠবে না ?

'সবুজের আহ্বান' এই ধরনের সম্পদ থেকেও বঞ্চিত। এ শুধু অতিসামান্য ভাষারই নয়, ভাব-বিবৃতির কবিতা মাত্র। এর উৎসাহ সাম্প্রতিক আমাদের যতই কাম্য হোক না কেন, তার অতিস্পষ্ট প্রকাশ মাত্রেই কবিতায় রম্যতা ফুটে না। তাই এ কবিতাটি ছন্দোবদ্ধ ভাবোদ্দীপক মৌখিক বাক্যসমষ্টি হয়েছে।

'গীতালি' থেকে দুঃখবরণের উৎসাহের সঙ্গে বাস্তব পরিবেশের যেসব সাংকেতিক চিত্র কবিভাষায় বারবার স্ফুরিত হয়েছে বলাকার এই ধরনের

উৎসাহ-কল্পনার কবিতায় তার অনুবৃত্তি ঘটেছে। কিন্তু এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কবিতা 'শঙ্খ'-ই এরূপ সংকেতচিত্র যোজনার রম্যতায় উল্লেখযোগ্য এবং সেই সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ পরিমিত বাক্‌শিল্পেও বিশেষ স্মরণীয়। 'শঙ্খ' শব্দে মানুষের বাধা-বিপদ উত্তরণের এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসিক সংগ্রামের উন্নত শক্তির বিষয় সংকেতিত হয়েছে। 'বাতাস আলো গেল মরে'—ইত্যাদিতে সংস্কৃতি, ন্যায়নীতি, বিচার-বিবেক প্রভৃতির কথা ব্যঞ্জিত। দ্বিতীয় স্তবক 'চলেছিলেম পুজার ঘরে' প্রভৃতি বাক্যে কেবল নিশ্চিন্ত মনে ঈশ্বরের উপাসনাকেই দ্যোতিত করছে না, কর্তব্যকে উপেক্ষা ক'রে বিজনতায় আরাম অন্বেষণকেও বোঝাচ্ছে। পরবর্তী স্তবকে নির্জনে পুজারতিকে সংশয়িত করা হয়েছে 'আরতি-দীপ এই কি জ্বালা' প্রভৃতি বাক্যে। 'সন্ধ্যা' শব্দে কর্মবিরতি এবং শ্রান্তি ধ্বনিত। রক্তজবা এবং রজনীগন্ধা শব্দে যথাক্রমে সংগ্রামক্ষুব্ধ জীবন এবং স্নিগ্ধ শান্তির জীবন আভাসিত হয়েছে এবং বাক্যদ্বয়ে বিতর্ক ও বিলাপ অনুরণিত হয়েছে। পরবর্তী স্তবকগুলিতে সংগ্রামের জীবন বরণ করার প্রবল আগ্রহ চিত্রসমন্বিত এবং শব্দধ্বনি-মিশ্রিত হয়ে প্রকাশময় হয়ে উঠেছে। এই চিত্র বাস্তবে-ব্যঞ্জনায় একত্র হয়ে কাব্য-চমৎকারের আশ্চর্য স্বাদ দিয়েছে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিসমূহে—

জানি শ্রাবণধারা-সম
বাণ বাজিবে বক্ষে।
কেউ বা ছুটে আসবে পাশে
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে
দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে
সুপ্তির পর্যঙ্ক।

কেউ সংগ্রামে এগিয়ে এসেছে, কারও বা চৈতন্যের মুক্তি ঘটেছে, অথচ সংস্কারের বন্ধন কাটেনি। আবার কেউ আরাম ও শান্তির জীবনকে সবলে আঁকড়ে ধরে রয়েছে, তারা নূতনের আগমনে সন্ত্রস্ত—এই সব ছবি ফুটেছে উল্লিখিত স্থানগুলিতে। কবিতাটির শেষ স্তবকে প্রায়-নিরলংকার 'এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা' প্রভৃতিতে বীররসের আনন্দ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

'শঙ্খ' কবিতায় স্বাভাবিকভাবেই মন্দমধুর অনুপ্রাসের তরলতা নিস্পন্দিত হয় নি। চরণান্ত মিলের বিন্যাসে এর কাব্যমহিমা রক্ষিত হয়েছে মাত্র। দ,ধ,গ,

ঘ, জ, হ প্রভৃতি ঘোষবৎ ব্যঞ্জনের আধিক্য, স-ধ্বনি ও ক ট এর সঙ্গে ঐগুলির সংঘাত পঙ্‌ক্তিগুলির অর্থসংকেত এবং উদ্দিষ্ট ভাবস্পন্দের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়েছে। শ্বাসাঘাতের তীব্র উচ্চারণ এবং বাক্‌রীতির সহজ লৌকিকতা বীররসের ব্যাপ্তির সহায়ক হয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, নির্দিষ্ট ভাবার্থের প্রারম্ভ, উত্থান এবং পরিণাম না-হ্রস্ব নাতিদীর্ঘ একটি অবয়বের মধ্যে পর্যাপ্ত সুষমা লাভ করেছে। ভাবের প্রাবল্যের অবকাশ থাকলেও ব্যক্তিগত আবেগ উচ্ছ্বাসকে কবি যে অত্যন্ত ব্যাপ্ত ক'রে তোলেন নি এতে তাঁর শিল্পমহিমার প্রকাশ ঘটেছে এবং এইভাবে সমস্ত গুণের সমবায়ে এটি উত্তম গীতিকবিতা-গুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কবির বীররসের উদ্দীপক কবিতা ও গীতগুলির মধ্যে বোধ হয় এটির স্থান সর্বোচ্চে।

এই শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে পাঁচ সংখ্যক **'নেয়ে'** কবিতাটিই অর্থসংকেতের দিক থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হয়েছে। কবির পূর্ব-কল্পিত অরূপসত্তা যিনি দুঃখ-দুর্যোগের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছেন এবং যিনি নূতনের স্রষ্টা তাঁকেই নাবিকরূপে কল্পনা করা হয়েছে। বাস্তব জীবনের গ্লানিতে এবং মানুষের অবমাননায় প্রতিহত কবির দুঃখবরণ, মরণপণ এবং সর্বনাশকে আহ্বান করার প্রবণতা গীতালি এমনকি তার বহুপূর্ব থেকেই স্পষ্ট। এখানে অরূপ-নাবিকের আগমনের প্রকার এবং লাঞ্ছিত মানুষের জীবন-পরিবেশ-বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। সংকেতময় অর্থচিত্রের মধ্যস্থতায় কবি এই বর্ণন-বৈচিত্র্যের সমাধান করেছেন। প্রথম স্তবকে দুর্দিনের চিত্র ; সংকেতে, ক্ষুব্ধ নিপীড়িত মানুষের বিমূঢ় সন্ত্রস্ত জীবনের ছবি এবং পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের আভাস—

কালো রাতের কালি-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে
আকাশ যেন মূছি পড়ে সাগরসাথে মিশে,
উতল ঢেউয়ের দল খেপেছে, না পায় তারা দিশে,
উধাও চলে ধেয়ে।

দ্বিতীয় স্তবকে নাবিকের বা বৈপ্লবিক নূতনের আগমনের প্রকার নির্দিষ্ট হচ্ছে। দুর্যোগের অন্ধকারে আগমন ঘটলেও তা যে দুর্লক্ষ্য নয় তা বোঝাবার জন্যে 'সাদা পালের চমকে'র চিত্র দেওয়া হয়েছে। 'কোন্ ঘাটে' কোন্ পথ দিয়ে', 'কোন্ অচেনা আঙিনাতে' প্রভৃতির মধ্যে এঁর আবির্ভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞতা ও অনিশ্চয়তা জ্ঞাপিত হয়েছে (খেয়ার 'আগমন' কবিতা

এবং 'অচলায়তন' ও 'ডাকঘর' নাটকে চিত্রিত অরূপের আবির্ভাবের প্রকার দ্রষ্টব্য)। এই স্তবকের 'অগৌরবার বাড়িয়ে গরব' এবং চতুর্থ স্তবকের 'সে থাকে এক পথের পাশে' বর্ণনায় অবহেলিত উৎপীড়িত মানুষের কথা বলা হয়েছে। এদেরই জন্য ভাঙনের মুখে নবীনের আবির্ভাব কল্পিত হয়েছে। 'আমার নেয়ে' 'মোর নেয়ে' প্রভৃতির মধ্যে এর সঙ্গে কবি-সৌহার্দ্য মাত্র সূচিত হয়েছে। নবীন আসছে না কেবল কোনও বৈষয়িক সম্পদ দেওয়ার জন্য, নিঃশেষ মুক্তি দেওয়াই তার অভিপ্রায়—এই ব্যাপারটি সংকেতিত হয়েছে নিম্নলিখিত ভাষায়—

নহে, নহে, নাইকো মাণিক, নাই রতনের ভার,
একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার,......

এই চতুর্থ স্তবকে রিক্ত অবরুদ্ধ মানুষের আশ্চর্য সংকেতময় চিত্র কবি নিচের পঙ্‌ক্তিগুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন—

রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্ত-পলক আঁখি,
ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাঁকি,
দীপের আলো বাদল-বায়ে কাঁপছে থাকি থাকি
ছায়াতে ঘর ছেয়ে।

সাধারণ লোকায়ত ভাষ্যভঙ্গিতে বাস্তবজীবনচিত্র দ্যোতনার এই দৃষ্টান্ত রবীন্দ্র-নির্মিতিতেও খুব বেশি নেই।

এই শ্রেণীর কবিতানিচয়ের পর জীবন-সম্বন্ধে নব-অর্থ-নির্মাণের কয়েকটি কবিতা লক্ষণীয়। এই কবিতাগুলি সাধারণ্যে গতিতত্ত্বের কবিতা ব'লে পরিচিত। কিন্তু লক্ষ্য করলে সহজেই দেখা যায়—সমস্ত সৃষ্টি গতির প্রেরণায় উধাও হয়ে অজানার অভিমুখে ছুটে চলেছে এবং তার সঙ্গে গতিশীল হয়েছে দুরাকাঙ্ক্ষ মানুষ—এমন অর্থের কবিতা দুচারটি মাত্র রয়েছে। অধিকাংশ কবিতাই কবির অতিপ্রিয় সংস্কারের-বন্ধন-ত্যাগ এবং নূতন মুক্তজীবনকে গ্রহণ করার আবেগময় কল্পনা থেকে সঞ্জাত হয়েছে। আর বিশ্বের গতি যেখানে কবি দেখছেন সেখানেও জীবন সম্পর্কে ঐ কল্পনাই নিগূঢ়ভাবে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে। ফলে বলাকার উত্তম কবিতাগুলি ঠিক কোনও তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করছে না, কল্পিত অর্থকে দৃঢ় প্রত্যয় সহযোগে বিন্যস্ত করছে। দার্শনিকতা পাওয়া যাচ্ছে না, দার্শনিকতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে মাত্র। আবেগের তীব্রতা এবং রমণীয় অর্থের বিন্যাস বলাকায় উত্তম কবিতাগুলির তত্ত্ব-

সন্দেহকে পরাভূত করেছে। বলা বাহুল্য, কল্পনাবৃত্তিই এই নব অর্থনির্মাণের মূল শক্তি রূপে কাজ করেছে। যেখানে এই শক্তির স্পর্শ নেই, সেখানে অবশ্য কয়েকটি তত্ত্বসংসর্গের রচনা ছন্দোবদ্ধ হয়েছে বলা যেতে পারে। যেমন, পাখিরে দিয়েছ গান, যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা। এছাড়া কল্পনার রোমাঞ্চহীন আত্মভাব-বিবৃতির কিছু কবিতাও বলাকায় গ্রথিত হয়েছে, যেগুলি কাব্যের উদারতা তেমন লাভ করে নি। অথবা, কবির বয়ঃপ্রযুক্ত মননশীলতা নিজ অধিকার বিস্তৃত করতে চেয়েছে ব'লে কাব্যের স্থানে আইডিয়ার বিবৃতি বা তাত্ত্বিকতা এগুলির মধ্যেও প্রবল হয়ে উঠেছে। এই সব দিক থেকে দেখলে বলাকায় সমুন্নত কবিতার সংখ্যা খুব বেশি নয়।

ছয় সংখ্যক কবিতা **'ছবি'** কবির উত্তম সৃষ্টিসমূহের মধ্যে একটি। কবির নিতান্ত অন্তরঙ্গ পরলোকগত আত্মীয় সম্পর্কে কবির সকৃতজ্ঞ স্মৃতি নিবেদনের কবিতা এটি। কিন্তু এর মধ্যে জীবন বা মৃত্যু সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণার আভাসও নেই। তার স্থানে রয়েছে মৃতের দেহহীন অস্তিত্ব অনুভবের কথা এবং কবিজীবনের মধ্যে তার জীবনময় হয়ে থাকার অভিনব উপলব্ধি। কবির ভাষণের এবং বিষয়-বিন্যাসের চারুতায় কবিতাটি রমণীয় হয়ে উঠেছে। কবির নিতান্ত ব্যক্তিক ভাবপরিমণ্ডলে কবিতাটি আবদ্ধ হয় নি ব'লে এর থেকে পাঠক-সাধারণের আনন্দ-অনুভব নির্বাধ হতে পেরেছে।

'শাজাহান' কবিতার মত মূল গঠনে এ কবিতাটির দুটি অংশ। প্রথমে রেখায় চিত্রিত ব্যক্তির জীবনহীনতা, নিঃসম্পর্কত্ব প্রভৃতি দ্যোতিত হয়েছে। দ্বিতীয়ে ঐ বহিরঙ্গ ধারণাকে অপ্রতিপন্ন ক'রে অন্তরঙ্গ কথা বিবৃত করা হয়েছে। এবং এর ফলে বর্ণনীয় বিষয়টি একটি যুক্তির মায়ারূপ ধারণ করেছে। বাস্তব জীবন থেকে চিত্রিত মানুষটি স'রে গেছে অর্থাৎ বর্ণিত ব্যক্তিটি মৃত—এই ব্যাপারটি নানান্ কৌশলে রমণীয়ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। চঞ্চল নিসর্গবস্তু, যেমন, তৃণ ধূলি গ্রহ তারা রবি, এদের সঙ্গে তুলনায় ছবিকে অসত্য ব'লে দেখানো হয়েছে। রম্যতার উদ্ভব ঘটিয়েছে ঐ নিসর্গবস্তুগুলির কার্যের বর্ণনা, যেমন—'ওই যারা দিনরাত্রি আলো-হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' অথবা 'তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে, অঙ্গে তার পত্রলেখা দেয় লিখে।' প্রারম্ভে সাধারণ উপমান ত্যাগ ক'রে একেবারে নীহারিকার এবং 'গ্রহতারারবি'র অবতারণা, তাদের চলমান অবস্থা ও ঐ অবস্থার সত্যতা কল্পনা—কবিমনের উপর আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রভাব থেকে জাত।

কিন্তু আর একটু বিশেষত্বও বোধ হয় আছে। প্রিয়ের মৃত্যুর পর তার অস্তিত্ব আকাশের নীহারিকায় এবং তারার মধ্যে কল্পিত হয়ে থাকে। সেই সাধারণ অনুভব নিয়ে পরে বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রভাবে সেই অনুভব থেকে দূরে গেছেন কবি। মানুষকে পথিক এবং ছবিকে পথহীন কল্পনা করার ভাবটি স্পষ্টতই একালের, গীতালি-ফাল্গুনীর। দুই স্তবকে কবি চিত্রিতার জীবন-সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন—'একদিন এই পথে চলেছিলে' ইত্যাদি। 'মোর চক্ষে এ নিখিলে…রসের মূরতি' প্রভৃতির ব্যঞ্জিতার্থ হ'ল—পৃথিবী এবং মানুষকে রমণীয় ব'লে মনে হওয়ায় কাব্য স্ফুরিত হয়েছিল তোমারই শিক্ষায় এবং আদর্শে। পরের স্তবকে প্রিয়হীন কবির জীবন এবং কবির দৃষ্ট পৃথিবীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—'চলেছে জোয়ার-ভাটা আলোকে আঁধারে আকাশ-পাথারে' ইত্যাদি। কেবল এই অংশটিতেই শুধু বর্ণনা-ভঙ্গিতে, জীবনের চলার কথা ব্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কারুণ্যের প্রসার ঘটেছে। কিন্তু দ্বিতীয়াংশে কারুণ্যের অবসর স্বাভাবিক ভাবেই ঘটেনি। এই অংশের সৌন্দর্য নির্ভর করছে কবির নিসর্গ-সৌন্দর্য-সম্পর্ক বর্ণনে। 'এই নদী হারাত তরঙ্গবেগ' প্রভৃতি কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে কবির বক্তব্য এই যে তাঁর চিত্তে ঐ প্রিয়জনের আসন শূন্য হয়ে পড়লে তিনি নিসর্গের এই অপরূপতার উপলব্ধি প্রকাশ করতে পারতেন না। কিন্তু ঐ প্রিয়জনের অভাবে 'নিসর্গ স্বয়ং তার রমণীয়তা অবলুপ্ত করত' এরকম বক্র বর্ণনায় অতিশয়োক্তির. দ্বিতীয় চমৎকারিতা এই অংশে ঘটেছে। বর্ণনগত রমণীয়তা সমধিক স্ফুরিত হয়েছে 'চঞ্চল পবনে লীলায়িত মর্মর-মুখর ছায়া মাধবীবনের' পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে। এছাড়া বিরোধ, অতিশয়োক্তি এবং এপিগ্রামের চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে—'তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে, তাই ভুল' 'ভুলে থাকা সে তো নয় ভোলা; বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা' 'নয়নসম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই' 'কবির অন্তরে তুমি কবি' প্রভৃতি বাক্যগঠনে। সমগ্রভাবে দেখলে কবিতাটি একজন কবির নিতান্ত ব্যক্তিগত আত্ম-অনুভবের পরিচয় বহন করলেও সর্বজনরমণীয় আহ্লাদেরই কারক হয়েছে।

তবু বর্ণনরীতিতে কবির অনবধানপ্রযুক্ত অসংগতিও লক্ষণীয়। প্রারম্ভে নীহারিকাদির সঙ্গে বিগত প্রিয়জনের বিপরীতভাবে তুলনার উদ্দেশ্য যদিও অনুমেয় এবং ধূলি তৃণের প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ যদিও স্পষ্ট (এরা তুচ্ছ

হলেও গতিশীল ব'লেই সত্য) তবু ধূলির কার্যকারিতা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে কবির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে কিনা সন্দেহ। "তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে, অঙ্গে তার পত্রলিখা দেয় লিখে" ইত্যাদি ধূলির গৌরবেরই কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তুচ্ছতার নয়। "বিশ্বের চরণতলে লীন" এই বিশেষণ তৃণের তুচ্ছতা দ্যোতনার জন্য প্রয়োজনীয় হলেও, ঠিক পরের "এরা যে অস্থির" এই চারিত্র্য বর্ণনার সঙ্গে ঐ অংশ অপ্রাসঙ্গিক। তা ছাড়া নীহারিকা এবং ধূলি প্রভৃতির সঙ্গে ঐ চিত্রিত বিষয়ের তুলনার মাঝখানে "পথিকের সঙ্গ লও ওগো পথহীন, কেন রাত্রিদিন সকলের মাঝে থেকে" ইত্যাদি ভাবময় ভাষণ ক্রমভঙ্গ দোষ ঘটিয়েছে। নীহারিকাদির ঠিক পরেই ধূলি এবং তৃণের প্রসঙ্গ উত্থাপন ন্যায্য হয়েছে কিনা সন্দেহ।

'ছবি' এবং **'শাজাহান'** কবিতা দুটির নির্মাণমূলে সাদৃশ্য অনুধাবনযোগ্য। সাদৃশ্য এই যে দুটিরই বিষয় বা বিভাবমূল হ'ল শিল্পকৃতি এবং দুটিরই প্রথমাংশে যে লৌকিক অর্থ বিন্যস্ত করা হচ্ছে দ্বিতীয়াংশে তাকে অপ্রতিপন্ন ক'রে নবতর ভিন্নার্থ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আবার শিল্পকৃতির পশ্চাদ্‌বর্তী মানুষের গৌরব প্রতিষ্ঠা দুটি কবিতারই লক্ষ্যস্থানীয়। বিশেষ এই যে 'ছবি' কবিতায় উদ্দিষ্ট মানুষটির রমণীয় সম্পর্ক অনুভব পার্থিবতার মধ্যেই নিষ্পন্ন হয়েছে, কিন্তু তাজমহলের স্বপ্নদ্রষ্টা মর্ত-সম্পর্ক অতিক্রম করার গৌরব নিয়েই কবির কাছে বিস্ময়কর নূতন রূপে দেখা দিয়েছেন। অর্থাৎ 'শাজাহান' কবিতার প্রথমাংশের গঠিত অর্থের মধ্যেই 'ছবি' কবিতার দ্বিতীয়াংশের অর্থ সমাপ্ত। শাজাহানের শেষাংশ অর্থবৈচিত্র্যে সম্পূর্ণ নূতন।

কবির উদ্দিষ্ট এই দ্বিতীয়ার্থের জন্য 'শাজাহান' বা 'ছবি' কবিতার অর্থগত অখণ্ডতা ক্ষুব্ধ হয়েছে ব'লে মনে করা যায় না। এ হল কবির প্রকাশভঙ্গিমার বৈশিষ্ট্য মাত্র। গীতিকবিতার ভাবগত ঐক্য তখনই বিনষ্ট হতে পারে যখন উদ্দিষ্ট অর্থ কবিচিত্তে স্পষ্টভাবে দীপ্তিলাভ করে না, অথবা নির্মাণে নৈপুণ্যের অধিকারী কবি হন না। তখন শোকের সঙ্গে হাস্য অথবা প্রেমের সঙ্গে ক্রোধ একত্র স্থান পেতে পারে। এখানে শাজাহানের জীবন-মহিমাকে অতিশয়িত ক'রে প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে প্রণয়বিলাসকে দীর্ঘ এবং রমণীয়ভাবে গ্রথিত করেও অস্বীকার করা হয়েছে। এ স্বাভাবিক, এবং বহু কবির চিত্তেই এইভাবে একটি প্রথম অনুভব এবং একটি দ্বিতীয় অনুভব একসূত্রে গ্রথিত হয়ে প্রকাশে অখণ্ডতা লাভ করেছে।

প্রথম অনুভবে শাজাহানকে ভাবুক ও কবিরূপে দেখা হয়েছে। এইভাবে দেখায় তার অতিপ্রবল প্রেমিক সত্তার পরিচয়-গ্রন্থনও স্বাভাবিক হয়েছে। "হে সম্রাট কবি" ইত্যাদি উক্তিতে কবি ও প্রেমিকের সমন্বয়। সমস্ত প্রথম অংশটি ব্যাপ্ত করে রয়েছে শাজাহানের পার্থিব জীবনের উপযুক্ত পরিপূর্ণ প্রকাশের ছবি। আর দ্বিতীয় অংশে পরিস্ফুট হয়েছে পার্থিব জীবনের অতিরিক্ত কল্পিত অন্তরসত্তার পরিচয়। প্রথমাংশের অর্থ রমণীয়, কিন্তু দ্বিতীয় অংশের অর্থ অভিনব চমৎকারের বিষয়। কবির শব্দসংকেত ও চিত্রনির্মাণ-রীতি দেখা যাক। রাজশক্তি এবং রাজ-ঐশ্বর্যকে উপেক্ষা ক'রে হৃদয়-অনুভবকে শাজাহানের প্রাধান্য দেওয়ার বিষয় দুটি ক্ষেত্রেই ক্রমানুসারে উপস্থাপিত হওয়ায় করুণের সঞ্চারকে প্রথম থেকেই ঘনীভূত হওয়ার অবকাশ দেওয়া হয়েছে। 'কালের কপোলতলে' ইত্যাদিতে যে personification তাতে উদাসীন কালকে অশ্রুময় চিত্রিত ক'রে তাজমহলের গৌরব ব্যঞ্জনা করা হয়েছে। এর পর কয়েক পঙ্‌ক্তিতে মানব-জীবনে অদৃষ্টের কার্যকারিতা এবং জীবনের নশ্বরতা প্রভৃতি ট্র্যাজেডির বহুশ্রুত বিষয়কেই সুচারুরূপে এবং নূতনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শব্দে যাবতীয় ব্যঞ্জনের অনুপ্রাস এবং রসানুকূল প্রয়োগ, স্বরবর্ণের উপরেও অর্থ ধ্বনিত করার শক্তি অর্পণ—'হায় ওরে মানবহৃদয়······দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়'—কাব্যাংশকে নিঃশেষ রমণীয়তায় সমুত্তীর্ণ করে দিয়েছে। মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ার অথবা পশ্চিমের উন্নত রোম্যান্‌টিক কবিদের কোনও কোনও রচনাতেই এহেন নির্মাণ দ্রষ্টব্য। ফলতঃ 'এক হাটে লও বোঝা······' 'হায়রে হৃদয়, তোমার সঞ্চয়···' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি আধুনিক বাঙালির চিত্তে পুনঃ পুনঃ স্মৃত এবং কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। পরবর্তী কয়েক পঙ্‌ক্তিতে আলংকারিক চমৎকারিতার সঙ্গে অর্থগৌরব নির্মাণ করা হয়েছে। 'রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে' 'চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে' 'সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে' প্রভৃতি নির্মাণে oxymoron, periphrasis, personification, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি আলংকারিকতার প্রসার লক্ষণীয়। 'তাই তব শঙ্কিত হৃদয়··· মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে' অংশে অবশ্য 'সময়ে'র কণ্ঠে মালা দিয়ে 'মরণ'কে বরণ করার বর্ণনায় অনবধান ত্রুটি একটু অবশ্যই ঘটেছে। এই অংশের শেষের দিকে যেখানে সম্রাট-কবির বিরহ-স্বপ্ন কল্পনা করা হয়েছে, যেমন,—'যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া রয়েছে মিশিয়া প্রভাতের অরুণ-আভাসে'

প্রভৃতি—এখানকার বর্ণন রোম্যান্টিক-কবি-সাধারণ অনুভবপ্রসূত হ'লেও এবং এর বহু পূর্বেকার 'মানস-সুন্দরী' প্রভৃতি কবিতায় এবং অব্যবহিত পূর্বেকার 'ছবি' কবিতায় 'আজি তাই শ্যামলে শ্যামল তুমি' প্রভৃতিতে ব্যক্ত হলেও, নির্মাণ হিসাবে অধিক রমণীয়তার দাবী করতে পারে।

এর পরের স্তবকে স্মৃতিমাত্রসম্বল মোগলরাজ-ঐশ্বর্যের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যঞ্জনাময় অপূর্ব-সুন্দর বর্ণনা গ্রথিত হয়েছে। দিল্লীর রাজপথে বায়ুবিক্ষিপ্ত ধূলির দৃশ্য অতীতের চলমান সৈন্যদলের স্মৃতি জাগিয়ে তুলছে। তেমনি ঝিল্লী-ঝংকার আভাসিত করছে নূপুর-ঝংকার। এই অংশের নির্মাণও রবীন্দ্রের উন্নত চিত্রনির্মাণের উদাহরণ হয়েছে। 'পুরসুন্দরীর নূপুর' শব্দদ্বয়ে অনায়াস যমক এবং উৎপ্রেক্ষাদি অলংকারের সমাবেশ ঘটেছে। এই স্তবকের বক্তব্য হ'ল—শাজাহান এবং তাঁর রাজ্য বিলুপ্ত হলেও তাজমহল তাঁর প্রেমের বিষয় আজও প্রতিধ্বনিত করছে। অথচ এরকম সংবাদমাত্রকে অবলম্বন ক'রে কল্পনায় নব-অর্থনির্মাণ কতদূর রমণীয় হতে পারে তা যেমন এই অংশ তেমনি ঐ কবিতার বিভিন্ন স্থান নির্দেশ করছে। এরকম রমণীয় শব্দার্থ নির্মাণের দৃষ্টান্ত 'শাজাহান' কবিতায় মুহুর্মুহু ঘটেছে বলেই এর উপর আমাদের প্রবল অনুরাগ জন্মেছে।

এই কবিতার দ্বিতীয় অংশে কবি জীবনের যে অর্থ নির্দেশ করতে চেয়েছেন—সব কিছু ছেড়ে মানুষকে চলে যেতেই হয়—তা কবির কল্পনাময় আবিষ্কার নয়। এ আমাদের চির-পরিচিত লৌকিক ধারণাই। কিন্তু এই ধারণাকে অতিশয়িত ক'রে কবি যখন বলছেন—মানুষের কীর্তি তার ব্যক্তিত্বের কাছে নগণ্য, কারণ, সে পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে পূর্ণতার পথের যাত্রী—তখন পরিচিতের মধ্যেও অপরিচিত অভিনবের স্বাদ পাওয়া গেল। এই অংশের অর্থগৌরব সম্পূর্ণ করতে গিয়ে কবিকে প্রায় প্রতি পঙ্‌ক্তিতেই অর্থগত আলংকারিক বাগ্‌ভঙ্গিমার শরণাপন্ন হতে হয়েছে। কয়েকটির উল্লেখ করলে বলা যায়—'আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া' প্রভৃতিতে 'জীবনেরে কে রাখিতে পারে' প্রভৃতিতে প্রশ্ন-বক্রোক্তি, সমাধি-মন্দির থেকে জীবনের পার্থক্য ও উৎকর্ষ দেখিয়ে বিষম, 'কোনো মহারাজ্য কোনো দিন…' প্রভৃতির বর্ণনায় Hyperbole এবং অধিক, 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ…' প্রভৃতিতে বিরোধ এবং কাব্যলিঙ্গ, 'উড়ে পড়েছিল বীজ' প্রভৃতিতে রূপক, 'প্রিয়া তারে রাখিল না' প্রভৃতির মধ্যে ক্রিয়ার বক্রবিন্যাস প্রভৃতি

চমৎকারিতা লক্ষণীয়। এ ছাড়া বিশিষ্ট শব্দ-প্রয়োগ ও ধ্বনি বা সংকেত অভিপ্রেত রম্যার্থ প্রকাশ করেছে নানা স্থানেই, যেমন, ধয়ার ধুলায়, মৃৎপাত্রের মত, পূর্বাচলে, নিমন্ত্রণ, সমুদ্রস্তনিত, পথিক, রাত্রির আহ্বান, প্রভৃতি। মৃত্যুকে আনন্দের সঙ্গে অতিক্রম ক'রে নবজীবনে উত্তরণের যে কল্পনা ও ভাবনা একালে কবিচিত্তকে অধিকার করেছিল শাজাহানের ব্যক্তিসত্তার জয় ঘোষণার মূলে তা কাজ করেছে। কবিতাটিতে প্রসাদ, মাধুর্য এবং ওজোগুণের প্রয়োজনমত রমণীয় সন্নিবেশ ঘটেছে, আর প্রায় দোষরহিত হয়ে এটি যে রবীন্দ্রের একটি প্রথম শ্রেণীর কলাসৃষ্টি হয়েছে এবিষয়ে রসিকেরা পূর্ব থেকেই অকুণ্ঠভাবে একমত হয়েছেন।

আট সংখ্যক **'চঞ্চলা'** কবিতায় অরূপকে ব্যক্ত করার জন্য কবিকে চিত্রময় সংকেতবাক্য আহরণ করতে হয়েছে। যদিও কয়েক জায়গাতেই এর চিত্র-সম্পদ Bergson-এর Creative Evolution-এর ব্যাখ্যান থেকে উদ্দীপিত হয়েছে। বলাকার যে দু চারটি কবিতায় Bergson-এর বিশ্বগতিপ্রবাহ-চিন্তন বা মানব-শ্রেষ্ঠতাবাদ-এর ছায়া পড়েছে তার মধ্যে এই কবিতাটি সবচেয়ে অধিক উল্লেখ্য। প্রারম্ভে রূপহীন সৃষ্টিপ্রবাহকে নিরবধি প্রবহমান নদীর সঙ্গে অভেদ-কল্পনায় উপলব্ধি করার প্রয়াস ব্যক্ত হয়েছে। 'অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল' প্রভৃতি রূপ বর্ণনে এই বিষয়টি প্রকট যে এ নদী হয়েও নদী থেকে পৃথক এবং বিশেষণ যোগেও তার রূপ অগম্য থেকে যাচ্ছে। 'স্পন্দনে শিহরে' ইত্যাদি গ্রহ-তারকা-নীহারিকার চলমান অবস্থা থেকে কল্পিত। শূন্যে প্রবহমান বেগের কল্পনা এবং পরবর্তী 'বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত' প্রভৃতি Creative Evolution থেকে আহৃত আইডিয়ার প্রকাশ মাত্র। 'ক্রন্দসী কাঁদিয়া ওঠে বহ্নিভরা মেঘে' কবির নিজ কল্পনা। তবে 'বহ্নি'র কল্পনা Bergson-এর 'firework' বর্ণনা থেকে গৃহীত হতে পারে। পরবর্তী 'আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে' ঐ আতসবাজির উপমা থেকেই বিস্তৃত। এই অংশে কল্পিত গতিশক্তির ভয়াবহতা ব্যঞ্জিত হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তবকে 'হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী' প্রভৃতি বর্ণনে দার্শনিকের আইডিয়ার বশ্যতা থেকে মুক্ত স্বপ্রতিষ্ঠ কবির চিত্রময়ী কল্পনার স্ফুরণ ঘটেছে। রুদ্র ভয়ানক এবং অস্পষ্ট অন্তর্হিত হয়ে বিশিষ্ট অভিসারিকার প্রগল্‌ভ চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। অস্পষ্টকে কবি এখন স্পষ্টরূপে দেখছেন। অনির্বচনীয়কে রূপের সাহায্যে বচনীয় করছেন। উল্কাপাত, ঝঞ্ঝা, অশনি, বায়ুপ্রবাহ,

ঋতু পরিবর্তন প্রভৃতির মধ্যে অবিরাম চলমান একটি সত্তার কল্পনা চমৎকৃতি-জনক, আর ঐ সত্তাকে উন্মত্ত অভিসারিকার বেশে চিত্রিত করায় কাব্য-সৌন্দর্যও উত্তম হয়েছে। 'শুধু ধাও, শুধু ধাও' প্রভৃতি কয়েক পঙ্‌ক্তিতে একই স্বরের পর্ব-মধ্য এবং পর্বান্তিক আবৃত্তিতে নিরুদ্দেশ ধাবমান হওয়ার দৃশ্য ফুটেছে। "পথের আনন্দবেগে অবাধে" পাথেয় ক্ষয় করার চিত্রের মধ্যে ঋতুর আবির্ভাব ও বিলয়, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের পর্যায়ের ধারণা ব্যঞ্জিত হয়েছে এবং পঙ্‌ক্তিটি অর্থগৌরবের দিক থেকে স্মরণীয় হয়েছে। "যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি" প্রভৃতি শেষ-পূর্ব স্তবকে মৃত্যু এবং জীবন, ধ্বংস এবং সৃষ্টি সম্পর্কে কবির পূর্বতন ধারণাসমূহকেই খুব প্রবলভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই প্রবলতাসূচক দৃঢ় প্রত্যয়ের মূলে Creative Evolution গ্রন্থের নানান্ স্থান অবশ্য প্রেরণা দিয়েছে। "যদি তুমি মুহূর্তের তরে···পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে" প্রভৃতি দশ-বারো পঙ্‌ক্তির মধ্যে Bergson-এর গতি এবং অপ্রাণের স্বরূপ বর্ণন প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছে। এ সকল বিষয় আমাদের পূর্বেকার গ্রন্থাদিতে প্রদর্শিত হয়েছে। এখানে আলোচ্য হ'ল, গতিসম্বন্ধীয় নূতন ধারণা কবির স্বকীয় ধারণাসমূহের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে অর্থগত চমৎকারের সঞ্চার করেছে কি না। অভিসারিকা নারীর চিত্র-কল্পনা এ স্তবকেও অনুসৃত হয়েছে, ফলে, বিশ্বের মালিন্যমুক্তি, মৃত্যুর উপর নির্ভর ক'রে প্রাণের ও সৌন্দর্যের প্রকাশ প্রভৃতি ধারণার মধ্যে রম্যতা যুক্ত হয়েছে। গতির ব্যাঘাতই বস্তুর স্তূপ, মানুষের পার্থিবসম্পদের সঞ্চয়ও এই ব্যাঘাতের এক রূপ মাত্র—এই বিষয়টি আনন্দময় মুক্তির প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের চিত্তে অনায়াসেই সংযুক্ত হয়েছে। উদ্দীপন নূতন হওয়ার জন্য পার্থিব সঞ্চয়ের উপর কবির বিতৃষ্ণা প্রবলভাবেই দেখা দিয়েছে। কবি-মনস্তত্ত্বে ক্রিয়াশীল আমাদের জাতীয় চরিত্রের যাবতীয় গ্লানিও এই বিতৃষ্ণার কারণ হয়েছে। নটীরূপে চিত্রিত গতিশীলতার উপর কবির আসক্তি এবং এর ব্যাঘাতের প্রতি কবির বিতৃষ্ণা ভাষাভঙ্গিতে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা' প্রভৃতি গতিহীন অবস্থার সাতটি বিশেষণ এবং ভার, বিকার, বেদনার শূল প্রভৃতি বস্তুসঞ্চয়ের স্বরূপ-প্রদর্শক বিষয় বর্ণন এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়।

শেষ স্তবকে কবির আত্মজীবনে গতির অনুভব-প্রকাশ কবিতাটিকে উচ্চকোটির গীতিকাব্যের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। নিরপেক্ষভাবে গতিকে নিরীক্ষণের পর্যায়ের পর এর আবশ্যকতা ছিল। উন্নত কাব্য জীবন-সমীক্ষণ

থেকেই সম্ভূত হয়। সমুদ্রের কলধ্বনির মধ্যে কবি ‘অলক্ষিত চরণের’ অবিরাম চলার শব্দ শুনেছেন। এ চলা অকারণ, কারণ এর স্বরূপ কবির অজানা, অথচ এই অজানার আহ্বানেই মানুষকে জন্ম থেকে জন্মান্তরে রূপ থেকে রূপান্তরে পাড়ি দিতে হয়। জীবনের মধ্যে অনুভূত এই বিষয়টি অতিশয়োক্তির চিত্রে রম্যার্থময় সংকেত জ্ঞাপন করেছে—

রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা।

শেষাংশে তরণীতে পাড়ি দেওয়ার ভীষণ-মধুর ব্যঞ্জনাময় চিত্র। এই অংশের সমস্ত বর্ণনটি বাহ্যতঃ কবির ব্যক্তিগত আবেগে পুর্ণ, অভ্যন্তরে আমাদের সার্বজনীন অনুভবেরই প্রকাশ। কবির ভাষার সৌন্দর্য ও সংযম এবং চিত্রময় প্রকাশরীতিই এর কারণ। বহমান এবং দীর্ঘহ্রস্ব গ্রন্থনক্রমে তরঙ্গায়িত ছন্দঃপদ্ধতিও এই ভাবসৌন্দর্যের সহায়ক হয়েছে।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক আবেগ-উচ্ছ্বাসের আতিশয্য যেমন কাব্যকে খর্ব করে, তেমনি করে কবির ব্যক্তিগত প্রত্যয়ের দৃঢ়তার ফলে উদ্ভূত তত্ত্বের প্রাধান্য। চিত্র এবং ধ্বনি কোনোটিরই রমণীয়তা সে সব ক্ষেত্রে থাকে না। কল্পনার চেয়ে মননের মায়াই তখন কবিচিত্তকে অধিকার করে। এরকম ঘটে থাকে ধর্ম, দেশাত্মবোধ, সমাজহিতৈষণা অথবা নিসর্গ বা জীবন সম্বন্ধে কোনও পুর্বসংস্কার (dogma) উদয় হওয়ার ফলে। নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি প্রভৃতির কিছু রচনা যে এরকম দৃঢ়মূল আইডিয়ার বাহ্যপ্রকাশ এ আমরা দেখেছি। বলাকায় এই শ্রেণীর ছন্দোবদ্ধ গূঢ়ার্থময় বাক্যসমষ্টির কবিতা বেশ কয়েকটি রয়েছে, যেমন, দশ সংখ্যক ‘উপহার’ ১১ সংখ্যক ‘বিচার’ ১২ সংখ্যক ‘দেওয়া-নেওয়া’ ১৫ সংখ্যক ‘মোর গান এরা সব’ ১৬ সংখ্যক গতিতত্ত্বের ‘বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি’ ১৭ সংখ্যক ‘হে ভুবন আমি যতক্ষণ’ ১৮ সংখ্যক ‘যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি’ ২২ সংখ্যক ‘যখন আমায় হাতে ধরে’ ২৩ সংখ্যক দুই নারী-প্রত্যয় বিষয়ক ‘কোন্ ক্ষণে সৃজনের সমুদ্রমন্থনে’ ২৭ সংখ্যক ‘আমার কাছে রাজা আমার’ ২৮ সংখ্যক ‘পাখিরে দিয়েছ গান’ প্রভৃতি। এগুলির ভাষাভঙ্গিতে যে চিত্রধর্মিতা এবং অন্যবিধ রমণীয়তা নাই তা সাধারণ পাঠকও নিজের অনুভব ও কল্পনার আশ্রয়ে বুঝতে পারবেন। এক একটি কবিতার ভাষাভঙ্গিতে শুধু রম্যতা নেই বললেই নয়, রসবিরোধিতাও স্পষ্ট। বাউল সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিক গানগুলিতে আমরা এরকম বক্রোক্তিহীন অতিসাধারণ

ছন্দোবদ্ধ শব্দসমষ্টি পেয়ে থাকি। প্রয়োজনবশে বলাকার উল্লিখিত কবিতা-গুলির মধ্য থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

(১) যত পাই তত পেয়ে পেয়ে
তত চেয়ে চেয়ে
পাওয়া মোর চাওয়া মোর শুধু বেড়ে যায়;
অনন্ত সে দায়
সহিতে না পারি হায়
জীবনে প্রভাত-সন্ধ্যা ভরিতে ভিক্ষায়।

(২) যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি
ততক্ষণ জমাইয়া রাখি
যতকিছু বস্তুভার।
ততক্ষণ নয়নে আমার
নিদ্রা নাই;
ততক্ষণ এ বিশ্বেরে কেটে কেটে খাই
কীটের মতন;
ততক্ষণ
চারিদিকে নেমে নেমে আসে আবরণ;

(৩) আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে;

(৪) গর্ভ ছেড়ে মাটির পরে—
যখন পড়ে
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।

(৫) আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা।
তাই সে যখন তলব করে খাজানা
মনে করি—পালিয়ে গিয়ে দেব তারে ফাঁকি।
রাখব দেনা বাকি।

কোনও যুক্তিনিষ্ঠ দার্শনিক তত্ত্ব নয়, কবির একটা বিশেষরীতির ধারণাই এসব কবিতার রচনামূলে। রবীন্দ্রের বিশুদ্ধ কবিসত্তার চেয়ে তত্ত্ব ও আদর্শ-ভাবুকতার দিকে যেসব পাঠকের আগ্রহ অধিক তাঁরা অবশ্য এসব কবিতার অসমাদর করবেন না। এই ভাবার্থ-প্রধান কবিতাগুলির শুধু ভাব-ব্যাখ্যা চলতে পারে, সৌন্দর্য-বিচার চলে না। তবে এরই মধ্যে যেখানে তত্ত্ব অতিক্রম ক'রে ঐন্দ্রিয়ক অনুভব প্রধান হয়েছে, অথবা মানব-জীবনের সাধারণ সত্যকে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন কবি, সেখানে কাব্যরস উচ্ছলিত হয়েছে, যেমন, ১৩ সংখ্যক **'পউষের পাতাঝরা তপোবনে'**। বার্ধক্যের প্রারম্ভে যৌবন এবং বসন্তের স্মৃতি জেগেছে কবির চিত্তে। কবি তাকেই সত্য ব'লে অনুভব করেছেন এবং জন্ম-জন্মান্তরে ফিরে পাওয়ার আশ্বাস পেয়েছেন। একদিকে বসন্তের বর্ণনা, অন্যদিকে বর্ণরিক্ত জীর্ণ জীবনের বর্ণনা কবিতাটির কাব্য-সৌন্দর্যের কারণ হয়েছে। ফিরে ফিরে যৌবনকে পাওয়ার বর্ণনা থেকে এই হারানোর বর্ণনাই কিন্তু অধিকতর রমণীয় ব'লে পাঠকের কাছে প্রতীত হবে—

ঝরে পড়ে ফোটা ফুল, খসে পড়ে জীর্ণ পত্রভার,
স্বপ্ন যায় টুটে।
ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে লুটে।

তিরিশ সংখ্যক অজানা সম্বন্ধে লেখা **"এই দেহটির ভেলা নিয়ে"** প্রভৃতি কবির অনুভবের আন্তরিকতাকে স্বচ্ছন্দ প্রকাশ দিতে পেরেছে। কবির 'অজানা' যে-আইডিয়ারই প্রকাশ হোক, কবির সঙ্গে নিগূঢ় জীবন-সম্পর্কে স্থাপিত হওয়াতেই কাব্যচমৎকার ঘটিয়েছে। কবিতাটির যাত্রা ও চলার সুর বৈরাগ্যের আনন্দে মিশ্রিত, বাউলদের মনোভাবের কিছুটা সগোত্র। বাক্‌রীতিও বাউলদের সংকেতময় সহজ অভিব্যক্তির দিক চিহ্নিত করছে। এরই নিঃশেষ পরিচয়—

মানে না সে বুদ্ধিসুদ্ধি বৃদ্ধজনার যুক্তি,
মুক্তারে সে মুক্ত করে ভেঙে তাহার শুক্তি।

অবশ্য এইসব কবিতার অজানার কল্পনা এবং যৌবন ও পথে-চলার বিজয়-সংগীত কবির স্বকীয় কল্পনারই অঙ্গীভূত। যাত্রা, যাত্রী, হাল, মাঝি, কূল, তরী, জোয়ার প্রভৃতির সংকেতে প্রয়োগ লক্ষণীয়। ভাবার্থে কবিতাটিতে উৎসাহ ব্যঞ্জিত হলেও এর সঙ্গে কূল-ছাড়ার বা মর্ত্যত্যাগের কারুণ্য যুক্ত হয়ে কবিতাটিকে মিশ্ররসের ক'রে তুলেছে। বস্তুতঃ করুণ অথবা শান্ত অথবা

বিস্ময়ের মিশ্রণ কবির উৎসাহ-উদ্দীপনামূলক বহু কবিতায় এবং গানে প্রযুক্ত দেখা যায়। এই করুণের সঞ্চারীর পরিচয় এখানে—

ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না,
সেই কূলে আর ভিড়বে না।

প্রভৃতির বিষাদ-বিতর্ক বোধে। সাংকেতিক অর্থের প্রতি আগ্রহ যেখানে কবির কল্পনার নবীনতাকে অতিক্রম করেছে সেখানে কাব্য প্রহেলিকার পথে পদক্ষেপ করেছে। যেমন—

জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস-সরোবরে—
সূর্যতারা ভিড় করে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে
—ইত্যাদি।

সংকেতিত নিগূঢ় অর্থ এই যে, কবির (বা মানুষের) জীবনের বিকাশ কৌতূহল-সহ লক্ষ্য করছে সমস্ত সৃষ্টি। বিকাশে সহায়তা দানের মধ্যেই যেন তাদের অস্তিত্ব সার্থক। অর্থের যে গভীরতাই এর মধ্যে থাকুক, তা চিত্রে ও ধ্বনিতে অপরূপ হয়ে মূর্তিলাভ করে নি।

কল্পচিত্রের সঙ্গে শব্দের সংগীত বরং রমণীয়ভাবে গ্রথিত হয়েছে 'চক্রবাকের নিদ্রানীরব বিজন পদ্মাতীরে'র সন্ধ্যার সঙ্গে কবির অনুরাগের বর্ণনায় (৩২)। এসব কবিতা (অনুরূপ 'যে কথা বলিতে চাই, বলা হয় নাই' প্রভৃতি) 'চলা' বা 'গতি' বিষয়ে অভিনব সংকেত থেকে মুক্ত, কবির পূর্বেকার পৃথিবী-প্রীতির রমণীয়তার সঙ্গে যুক্ত, স্বভাবোক্তি এবং সমাসোক্তির খণ্ডচিত্রে মনোহারী। এ পর্যায়ে চিত্ররীতিতে যেসব অভিনবতা ঘটেছে তা পাঠকের নূতনতর আনন্দের সহচর হয়েছে বলা যায়, যেমন—

তরঙ্গহীন স্রোতের পরে ভাসিয়ে দিল তারার ছায়াতরী ;

…ঐ যে শেষে সপ্তঋষির ছায়াপথে
কালো ঘোড়ার রথে
উড়িয়ে দিয়ে আগুন-ধূলি নিল সে বিদায় ; (৩২ সং)

এ রীতির চিত্রকল্পনা সোনারতরী-চিত্রা-ছিন্নপত্র কালের নিসর্গ-বর্ণনের ঐশ্বর্যের মধ্যেও নেই। সেখানকার সন্ধ্যা মোটামুটি বধূবেশিনী, এখানে কেবল বধূ নয়, তরীর মাঝি, দ্রুতগামী কালো ঘোড়ার সওয়ার। সুতরাং "এমন সন্ধ্যা

হয়নি কোনো কালে” এ উক্তি উল্লিখিত অ-গতানুগতিক কল্পচ্ছবির জন্যই সার্থক।

কবির যে ক'টি কবিতায় নিবিড় উপলব্ধির রম্য প্রকাশ ঘটেছে “সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি” বা **‘বলাকা’** তার মধ্যে অন্যতম। বিস্ময়জাত আনন্দরস কবিতাটির কাব্যামৃতফল। কল্পনাসমৃদ্ধ অভিনব চিত্রগুলি এর আবেগ উচ্ছ্বাসের প্রসারকে রুদ্ধ করেছে, বিগলিত ব্যক্তিত্বের আবিলতা থেকেও একে রক্ষা করেছে। কবিতাটিতে কবির কল্পনাময় উপলব্ধিসমূহ পারম্পর্য অনুসারে প্রকাশ পেয়েছে এবং পরিণামে কবির আত্মভাষণে সমাহিত হয়ে উত্তম গীতি-কাব্যের মহিমা লাভ করেছে। প্রতিষ্ঠিত কোনও তত্ত্বকে পুরোবর্তী রেখে যে উত্তম কবিতা রচনা করা যায় না এটি তারও দৃষ্টান্ত। এর মধ্যে এমন কোনও বাক্য নেই যা অর্থের দিক থেকে বের্‌গ্‌স্‌-এর কোনও বক্তব্য অনিবার্যভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। ‘চঞ্চলা’ কবিতায় Creative Evolution এর বর্ণনার কিছু কিছু প্রভাব পড়েছে বলেই ওর উপসংহারের আত্মভাষণ অংশ ছাড়া অন্যত্র একটা অস্বচ্ছন্দ আড়ষ্টতা অনুভব না করেই পারা যায় না। ‘বলাকা’ আদ্যন্ত স্বতস্ফূর্ত প্রকাশের কবিতা। এর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল, আকাশ থেকে মৃত্তিকা এমনকি তারও অভ্যন্তর পর্যন্ত কবির কল্পনায় গৃহীত হয়েছে এবং বিশেষ একটি অনুভবের আলোকে পরীক্ষিত হয়েছে। বলা যায়, কবি সমগ্র সৃষ্টিকেই কল্পনায় আত্মস্থ করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রের পক্ষে তা অস্বাভাবিকও হয়নি, কারণ, পূর্বেই তিনি ইন্দ্রিয়লব্ধ যাবতীয় বিষয়ের সঙ্গে রহস্যময় অনুরাগ সম্পর্ক তাঁর কাব্যে পুনঃপুনঃ বিকীর্ণ করেছেন। এখানেও কবির বিস্ময়-অনুভবের সঙ্গে সৃষ্টির বিশাল দিগন্ত সংযুক্ত হয়ে পড়েছে ব'লে কবিতাটি অসামান্য হয়েছে। নিম্নলিখিতের মত পঙ্‌ক্তিসমূহে কবির কল্পনার বিশালতা স্পষ্ট—

> পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
> তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
> মাটির বন্ধন ফেলি
> ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
> আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

এর দ্বিতীয় বিস্ময় নিশ্চল নিসর্গকে চলার আগ্রহে পূর্ণ করে দেখার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু এ দেখা যদি চিত্রময় না হ'ত, এর কাব্যগত আকর্ষণ

এক চতুর্থাংশও থাকত কিনা সন্দেহ। চিত্র-সমারোহ নিয়ে এর আরম্ভ এবং "এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে" ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে চিত্র-সংসক্ত ব্যঞ্জনা দিয়েই এর শেষ।

প্রারম্ভিক ঝিলম-তীরের সন্ধ্যার বর্ণনা কয়েকটি উত্তম চিত্রের সাহায্যে সিদ্ধ হয়েছে। 'খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ারে'র উপমান পূর্বেকার পদ্মানদীর বহু বর্ণনের মধ্যেও দেখা যায় না। যদিও আবর্তযুক্ত খরস্রোতের জন্য বুনো ঘোড়ার উপমান ('ছিন্নপত্র') তখনকার কালে অভিনবই হয়েছে। মনে হয়, ভারতের এ অঞ্চলের অধিবাসীদের কটিদেশের তরবারি কবিকে এই উপমান প্রয়োগে উদ্দীপিত করেছে। দিনের উপর ভাটা এবং রাত্রির উপর জোয়ারের আরোপ নদীর দৃশ্য থেকেই সংক্রামিত। সৃষ্টির বা নিসর্গের উপর স্বপ্নভাষী শিশুর ব্যবহার সমারোপে পরবর্তী সুদূর-ব্যাকুলতার যোগ্য ভূমিকা যোজিত হয়েছে। শব্দ দ্রুত গতিশীল, তীব্র এবং ক্রমবিলীয়মান ব'লে বিদ্যুৎ-ছটার উপমান দেওয়া হয়েছে। 'দূর হতে দূরে দূরান্তরে' বর্ণনার মধ্যে ছন্দে ও অর্থে সুদূরের আভাস দেওয়া হয়েছে। 'ঝঞ্ঝামদরসে' প্রভৃতি তিন পঙ্‌ক্তিতে গতিশীল ধ্বনিময় বলাকার বর্ণনা। নিশ্চল নিসর্গের মধ্যে আকস্মিক চলমানতার আবির্ভাবে বিস্ময়। এই ব্যাপারকেই আরও যথাযথ-ভাবে উপস্থাপিত করার অভিপ্রায়ে অপ্সর এবং তপোভঙ্গের রূপক ব্যবহার করা হয়েছে। 'মনে হল' ইত্যাদি ভাষা কবির কল্পিত অর্থের জন্য প্রযুক্ত। পর্বত এবং তরুশ্রেণী, নক্ষত্র, তৃণ, জলস্থল—একাধারে সমস্ত সৃষ্টিকেই অজানা সুদূরের জন্য চঞ্চল ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। এ কল্পনার এবং তদনুযায়ী বর্ণনার চমৎকারিতা অবিসংবাদিত।

কল্পনার এই আশ্চর্য শক্তিই কবিতাটির অর্থগত চিত্র এবং ভাষা ও ছন্দোগত রমণীয়তাকে একত্র বহন করেছে। কবিতাটিতে আট মাত্রার পর্বই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে এবং চারমাত্রার অর্ধযতিবিন্যাসের আধিক্যও বিস্ময়-জাগরণের এবং গতিশীলতার শক্তির সহায়ক হয়েছে, যেমন, 'বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া' 'শিহরিল দেওদার বন' 'দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে' 'চমকিছে অন্ধকার' 'হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোথা, অন্য কোন্ খানে'। শব্দে অনুপ্রাস বা ধ্বনিচিত্র স্বাভাবিকভাবেই এতে মৃদুমন্দ রয়েছে। পরিণামের আত্মভাষণ এবং উত্তম গীতিকবিতায় পরিদৃষ্ট আর্তধ্বনি কবিতাটিকে ভাবসৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে। 'শঙ্খ' কবিতার মত এ কবিতাটিও আদ্যন্ত রুদ্ধশ্বাসে পড়ার

অপেক্ষা রাখে। এর সংক্ষিপ্ততা এবং বলা থেকে না-বলা বাণীর আবেদনও সৌন্দর্যের কারণ হয়েছে। কবিতাটিতে একটিমাত্র দুর্বল স্থান রয়েছে মনে হয়। তা হ'ল বিষয় হিসাবে আকাশ-পৃথিবী-সঞ্চারী নিসর্গ থেকে সহসা 'মানবের বাণী'র উল্লেখ এবং "এই বাসা ছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে" পঙ্‌ক্তিতে ছন্দোগত দুর্বলতা।

সাঁইত্রিশ সংখ্যক **'দূর হতে কী শুনিস্ মৃত্যুর গর্জন'** ভাব-প্রধান ও আবেগপূর্ণ কবিতা। কল্পনার চেয়ে "Emotion" এতে প্রাধান্য পেয়েছে। কবিতাটির রচনামূলে জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতা প্রেরণারূপে কাজ করেছে ব'লে আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রবল হয়েছে। একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ উদ্দীপনে এবং অতি-বর্ণনে কবিতাটির সামঞ্জস্যময় সৌন্দর্য বিঘ্নিত হয়েছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের বাস্তব জীবনকে অবহেলা ক'রে কেবল আকাশ-সমুদ্রে তরী ভাসান নি এ-কবিতাটি তারও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। প্রত্যক্ষ অবস্থা কবির চিত্তকে তীব্র আন্দোলিত করেছিল ব'লে এবং ভাববিমূঢ়তা থেকে নিষ্ক্রান্ত অবস্থায় কবিতাটি রচিত হয় নি ব'লেই বোধ হয় ভাবের বিচিত্র উদ্দীপন এতে স্থান পেয়েছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু কবিতাটি কবির একটি শক্তিশালী রচনা, 'এবার ফিরাও মোরে'র সগোত্র। স্থানবিশেষে সংকেতের দ্বারাও কবিতাটি সমৃদ্ধ হয়েছে, আর বীররস বা উৎসাহ-দুঃখ-বিপদ-মৃত্যুর প্রবল পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বাণিজ্য এবং তরীতে যাত্রার রূপকে নূতন জীবনের জন্য বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। দুঃখ বিপদ এবং হতাশার ছবি ফুটেছে—

ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে
কালোয় ঢেকেছে আলো—জানে না তো কেউ
রাত্রি আছে কি না আছে ; দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ—

প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে। ঝড়, রাত্রি, ফেনায়িত সমুদ্র—এ সমস্ত সংকেতিত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অগ্রসর হওয়ার বাস্তব ছবি ফুটেছে নিম্নলিখিতরূপ বাক্যসমূহে—

বাহিরিয়া এল কারা। মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।

এ চিত্র তৎকালীন বিপ্লবীদের সংগ্রামী জীবন থেকে সংগৃহীত হতে পারে। এর পর থেকে সমস্ত অংশে নানাভাবে বীররসের উদ্দীপনা প্রকাশ পেয়েছে—

'যাত্রা করো যাত্রা করো যাত্রীদল, বন্দরের কাল হল শেষ' 'ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান' 'ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান, নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ'—প্রভৃতি স্মরণীয় পঙ্‌ক্তিগুলিতে। উপসংহারের পঙ্‌ক্তিগুলি কবির আশ্বাসময় বলিষ্ঠ ভাষণের পরিচায়ক। এর মধ্যে মানুষের শক্তি ও মহিমার জয় গীত হয়েছে। বলাকায় কবি মানুষের রূঢ় বাস্তবজীবনেরও চিত্রকর হতে চেয়েছেন এবং তাঁর মানবমহিমার শ্রেষ্ঠতাবোধ কয়েকটি কবিতাকেই ভাবার্থে চমকপ্রদ করে তুলেছে।

যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সেই সব শাণিত বাক্যকে বহুমান করেন, যা দিয়ে কবি আমাদের দুর্দিনগ্রস্ত জীবনে আশার সঞ্চার করেছেন এবং জড়তাময় সুপ্তি থেকে আমাদের উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন, তাঁদের কাছে **'পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি'** একটি স্মরণীয় কবিতা। এই কবিতাটিতে পূর্ব-আলোচিত কবিতার মত ভাবকে নিয়ে অতিবিস্তার ঘটানো হয় নি, বরং ভাবকে সংযতই করা হয়েছে, অথচ, পূর্বেকার কবিতার দুঃখবিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাহসিকতা, নূতনের জন্য আগ্রহ, মানুষের মহিমা প্রভৃতি সব কিছুই এতে রয়েছে। কবিতাটির নানা বাক্য সংকেতে মনোহারী হয়েছে। পূর্বেকার কবিতায় তরঙ্গবন্ধুর সমুদ্রে তরণীতে যাত্রা, এখানে ধূলিময় রুক্ষপথে পদযাত্রা—এই পার্থক্য। বৈশাখের কবিতা ব'লেই 'পথের পরে তপ্ত রৌদ্র' 'ধূসর পথের ধুলা' 'ঘূর্ণীপাক' প্রভৃতি সংকেতচিত্র এসেছে। পথের উপর বাদ্যযন্ত্রের আরোপ ('বাজে পথ') কল্পিত বৈরাগ্যভাবোদ্রেকের ধর্মের জন্যই সম্ভব হয়েছে। গূঢ়ার্থময় বাক্‌কুশলতা নিম্নলিখিতরূপ পঙ্‌ক্তিতে সৌন্দর্য বিস্তার করেছে—

পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ,
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।

অলংকারের আতিশয্য না থাকলেও কবির সংকেতময় বাগ্‌ধারার প্রবলতা একালের ব্যঞ্জনাধর্মী নাট্যগুলির সংলাপেই বিশেষ অনুভব করা যায়। 'রক্তকরবী' নাটকের একটা অংশ দেখা যাক—

বিশু। তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের দূতী। যেদিন এলে যক্ষপুরীতে, আমার হৃদয়ে লোনা জলের হাওয়ায় এসে ধাক্কা দিলে।

······নন্দিনী। না, দুই হাতে দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের

নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়; লাফ দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ ক'রে সে হারজিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে।

......বিশু। তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয় মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়। তারপরে দিকহারা নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। একদিন পশ্চিমের জানালা দিয়ে আমি দেখছিলুম মেঘের স্বর্ণপুরী, সে দেখছিল সর্দারের সোনার চূড়া।

ফাল্গুনী রক্তকরবী সংকেতপ্রধান নাট্য ব'লেই এরকম নয়, কবির একালের প্রবণতা অনুসারেই গূঢ়ার্থময় শব্দ ও বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, সংকেতিত অর্থের প্রাধান্য থাকার ফলে একালের কবিতা সাধারণের কাছে কিছু দুরূহ মনে হয়েছে। পূরবীর **'যাত্রা'** কবিতা দেখা যাক। মরণের বা সর্বনাশের পথে, অজানার জন্য আনন্দিত যাত্রা। দুঃখ, বাধা, বিপদ, মৃত্যু ও ভয়ংকরতাকে কবি কীভাবে সংকেতিত করতে চেয়েছেন দেখুন—

> রিক্তবৃষ্টি মেঘসাথে, সৃষ্টিছাড়া ঝড়ের বাতাসে,
> যাব, যেথা শংকরের টলমল চরণ-পাতনে
> জাহ্নবী-তরঙ্গমন্দ্র-মুখরিত তাণ্ডব-মাতনে
> গেছে উড়ে জটাভ্রষ্ট ধুতুরার ছিন্নভিন্ন দল,
> কক্ষচ্যুত ধূমকেতু লক্ষ্যহারা প্রলয়-উজ্জ্বল
> আত্মঘাত-মদমত্ত আপনারে দীর্ণকীর্ণ করে,
> নির্মম উল্লাসবেগে, খণ্ড খণ্ড উল্কাপিণ্ড ঝরে,
> কণ্টকিয়া তোলে ছায়াপথ।

এ হ'ল প্রলয়বেশী রুদ্র এবং তার পরিবেশের বর্ণনা। এর থেকে মানুষের জীবনের সবচেয়ে দুর্বিপাকের মুহূর্তকেই সূচিত করা হয়েছে। অথচ এই সংকেতময় চিত্রের যোজনাতেই তা অপূর্ব সুন্দর হয়েছে। রূপকাদি অলংকারের সঙ্গে এরকম শব্দবাক্যগত সংকেত-প্রবণতা যুক্ত হয়ে একালের কবিতাগুলিকে স্বল্প ভিন্ন স্বাদের পথে পরিচালিত করেছে।

পূরবীর কয়েকটি কবিতা সংকেতিত বাক্যে কোনও নিবিড় উপলব্ধি অথবা কবি-মনের রহস্য জানাতে চেয়েছে। গূঢ়ার্থ-পূর্ণ প্রকাশভঙ্গিমা যেখানে বিশেষ নেই এমন স্পষ্ট ও সরল-উক্তির কবিতা 'পূরবী'তে অবশ্য কিছু রয়েছে। এই অবসরে সেগুলির সৌন্দর্য সম্পর্কেও আলোচনা করা যাবে। **'তপোভঙ্গ'** এই সময়ের লেখা ভালো কবিতাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উপাদেয়। এর মূল কাব্যার্থে এই কথাটি রয়েছে যে জরা এবং মৃত্যু, দুঃখ এবং নৈরাশ্য সৃষ্টির একটা প্রত্যক্ষ দিক, কিন্তু সত্য নয়। সত্য হ'ল যৌবন, প্রেম, সৌন্দর্য, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নূতন জীবন। 'ফাল্গুনী'র নাট্যে গানে এবং কাহিনীতে এই অর্থ আভাসিত হয়েছে; এখানে মহেশ্বরের তপস্যা ও প্রেমলীলার সাহায্যে। কিন্তু একে রূপক কবিতা বলা যায় না, কারণ, কুমারসম্ভবে যে-তপস্যা ও প্রেমের চিত্র দেখা যায় তাকে কবি স্বকীয় কল্পিত অর্থে প্রয়োগ করেছেন, তাকে অবলম্বন ক'রে স্বার্থসিদ্ধি করেছেন। ফলে মহেশ্বরের এই চারিত্র্য, হোক তা কুমারসম্ভবে দৃষ্ট, এখানে কবিকল্পনার সম্পূর্ণ অধীন হয়ে পড়েছে এবং কবির অভিলষিত ঐ নূতন চমৎকারজনক অর্থের দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করছে। কুমারসম্ভবের শিবের তপস্যা এবং প্রেমকে বিচ্ছিন্নতা থেকে উদ্ধার ক'রে সমগ্র একটি লীলারূপে কবি দেখেছেন অর্থাৎ কালিদাসের কবিকৃতির উপর বক্রতা-বৈচিত্র্য আরোপ করেছেন। সেইজন্য কবিতাটি নূতন কাব্যরসের জাগরণ সম্ভব করেছে, কবির এই চাতুর্য রসিকের কাছে একান্ত প্রশংসনীয় হয়েছে। 'মরণ-মিলন' কবিতার হরপার্বতীর চিত্রের মতই এ-চিত্র বিস্ময়কর, অদ্যাপি-অদৃষ্ট কল্পনার আশ্রয়ে উপাদেয়। তবে লক্ষণীয় এই যে, যে-ভাবসত্যের কল্পনাময় উপলব্ধি কবিতাটির রচনার বীজ, তার সঙ্গে নিবিড় যোগ-সূত্রেই শিবের তপস্যা এবং অনুরাগ-বন্ধনের চিত্রগুলি গ্রথিত হয়েছে। চিত্রগুলির সঙ্গে ঐ সংকেত অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। কলারসিকের কাছে কবির এই গ্রন্থনের চাতুর্যই পরম আনন্দদায়ী; অবশ্য দুই-রূপের পৃথিবীর বিচিত্র বর্ণনাগুলির মধ্যে যে শব্দার্থগত প্রৌঢ় রমণীয়তা রয়েছে তা-ও কম বিস্ময়কর নয়।

কবির একান্ত স্বকীয় বা ব্যক্তিক অনুভবের সূত্র দিয়ে কবিতাটি প্রারব্ধ হ'লেও এবং কবিতাটির শেষ পর্যন্ত সে-সূত্র পরিত্যক্ত না হ'লেও—'যৌবন-বেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি' 'তপোভঙ্গ-দূত আমি মহেন্দ্রের' 'দেখি আমি যুগে যুগে বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী, আমি সেই কবি' প্রভৃতি পঙ্ক্তির

মধ্যে কবি-স্বরূপের মূল্যবান পরিচয় চিহ্নিত হলেও—সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংকেতময় চিত্রগুলির সর্বজনীনত্বেই রসিকেরা এখানে সমধিক আকৃষ্ট হয়েছেন। শিবের তপস্যা এবং উমার সঙ্গে প্রণয় যে এই ভাবে বক্রভঙ্গিতে চিত্রিত হতে পারে তা 'তপোভঙ্গ' পাঠের পূর্বে উন্নত রসিকেরও ধারণার বাইরে ছিল। বস্তুতঃ কাব্য-নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টা প্রজাপতির মতো শক্তিমান এবং সেই হিসেবেই স্মরণীয়, তত্ত্বকথার উচ্চারণে নয়।

'তপোভঙ্গ' কবিতাটির প্রারম্ভে একটা বিষাদের সুর বেজেছে। কবির পূর্বজীবনের যৌবনস্বপ্নময় আনন্দের দিনগুলি ফুরিয়ে গেছে এই উপলব্ধির বিষাদ—কতকটা Wordsworth-এর Immortality Ode-এর প্রারম্ভের মত—

"Turn wheresoever I may,
By night or day,
The things which I have seen I now can see no more.
···But yet I know, whre'er I go,
That there hath past away a glory from the earth."

—যদিও এ-দুই কবির বিষাদের ভাবাত্মক কারণ ভিন্ন। রবীন্দ্রপক্ষে অহেতুক রসাবেশ এবং যৌবনের নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যস্বপ্ন তাঁর কর্মগ্রস্ত জীবনে বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু তিনি শীঘ্র এই বিষাদ থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁর সৃষ্টি ও ও জীবনের নবতম ব্যাখ্যাকে আশ্রয় করে। নিঃসন্দেহে কবির জীবন ও সৃষ্টির সত্যের এই ব্যাখ্যা কাল্পনিক; কাব্যিক দার্শনিক নয়, আর উপনিষদের আনন্দ-সত্য থেকেও গৃহীত নয়।

কবিতাটিতে কবির সংকেতময় কল্পনার তিনটি বিভাগ স্পষ্ট। প্রথম বিভাগে বসন্ত ও সৃষ্টির উপর বসন্তের প্রভাব, দ্বিতীয় বিভাগে দুঃখরূপের অর্থাৎ কবিসৃষ্ট সৌন্দর্যশূন্যতার সৌন্দর্য এবং তৃতীয়ে এ দুই বিপরীত সৌন্দর্যের সমাধানরূপে কবির রমণীয় ব্যাখ্যা সন্নিবেশ। প্রথম দুটিতে নিসর্গ এবং তৃতীয়টিতে অভিনব জীবন-ব্যাখ্যা—শুধু অনুভবে নয়, বুদ্ধির সঙ্গে অনুভবের সমন্বয়ে। স্বভাবতই তৃতীয় অংশে চিত্রগত সৌন্দর্য গৌণ হয়ে পড়েছে। এইভাবে চিত্র, সংকেত-চিত্র এবং বুদ্ধিগত অভিনবতার মিলনে এ কবিতাটি মহাকবির যোগ্য এবং শাশ্বত আস্বাদের বিষয় হয়েছে। এর সৌন্দর্যের বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি পরীক্ষা ক'রে দেখা যেতে পারে।

প্রারম্ভের 'একদা সে দিনগুলি' প্রভৃতির সংকেতগত অর্থ হ'ল রমণীয় এবং বিচিত্র মধুর স্বপ্নাবেশের প্রত্যক্ষ স্পর্শ সত্য ব'লে অনুভূত হয়েছিল। দিনগুলিকে দস্যু ব'লে অভিহিত করায় যৌবনের স্বপ্নমাধুর্যের প্রবলতা ব্যঞ্জিত হয়েছে। মহাদেবকে তপস্বী না ব'লে ভিক্ষুক শব্দে অভিহিত ক'রে সৃষ্টির তত্ত্বগত শূন্যতাকে কটাক্ষ করা হয়েছে। কবি যেন বলতে চান, ঐ তত্ত্ব সত্য, না, যা অনুভব করছি তা-ই সত্য। এর পরের দুটি পঙ্‌ক্তিতে, 'গন্ধভাবে আমন্থব' ইত্যাদিতে, বসন্তের যে কার্যকারিতা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে শব্দগত ব্যঞ্জনাই প্রধান হয়েছে। 'আলসে' 'রভসে' প্রভৃতি শব্দ অর্থকে লঙ্ঘন ক'রে সৌন্দর্যের প্রকাশক হয়েছে। পরবর্তী পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে তপোভঙ্গের চিত্রগত সৌন্দর্য। শীতকে বিনির্জিত ক'রে বসন্তের প্রারম্ভের অবস্থা ('অকস্মাৎ শূন্যে গেল ভেসে। শুষ্ক-পত্রে ঘূর্ণবেগে গীতরিক্ত হিমমরুদেশে উত্তরের মুখে') মহাকবি কালিদাসের 'দিগ্‌দক্ষিণা গন্ধবহং মুখেন ব্যলীকনিশ্বাসমিবোৎসসর্জ' প্রভৃতির সমাসোক্তিগত চারুত্বের চেয়ে অধিক মনোহারী ব'লেই আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে। উত্তরের বাতাসের সঙ্গে, সুতরাং উত্তরের সঙ্গে শীতের সম্পর্ক, শীত জড়তার কারক এবং আমাদের বিরাগভাজন ব'লে 'হিম-মরুদেশে' তার স্থান। চৈত্রের দক্ষিণের বাতাস ঘূর্ণির প্রবল বেগে শুষ্ক পত্রেব সঙ্গে শীতকে ঠেলে নিয়ে দূরে তার হিমময় স্বস্থানে রেখে এল এ-কল্পনা সুন্দর বলতে হবে। পরবর্তী একটি পঙ্‌ক্তির 'পুষ্পগন্ধে লক্ষ্যহারা দক্ষিণের বায়ু'র কৌতুকও বসন্তকে এক নিশ্বাসে ব্যক্ত করতে পেরেছে। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, কবির অনবধানে কাছাকাছি অথচ পৃথক্ দুটি স্থানে দক্ষিণ বাতাসের কার্যকারিতা বর্ণিত হওয়াতে একই প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন-দোষ ঘটেছে। 'গন্ধভারে আমন্থর' এবং 'পুষ্পগন্ধে লক্ষ্যহারা'ও ক্ষীণভাবে ঐ দোষে দুষ্ট। কিন্তু তপোভঙ্গের সংকেতচিত্রের প্রয়োজনে বসন্তকে যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্রকাশ করতে গিয়েই এইটুকু ত্রুটি সম্ভব হয়েছে। এরকম সংক্ষেপ-প্রয়াসের আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল—

> সে-মন্ত্রে উঠিল মাতি সেঁউতি-কাঞ্চন-করবিকা,
> সে-মন্ত্রে নবীনপত্রে জ্বালি দিল অরণ্যবীথিকা
> শ্যামবহ্নিশিখা।

নব-উদ্‌গত পত্ররাজির শ্যামলিমাকে বহ্নিশিখার সঙ্গে তুলনায় নায়িকা

অরণ্য-বীথিকার যৌবনবাসনার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বসন্তের প্রকাশে 'বহ্নি'র Metaphor-নির্মাণ কবির অন্যত্রও লক্ষণীয়—

মিলনমাঙ্গল্যহোম-প্রজ্বলিত পলাশে পলাশে
রক্তিম আগুনে।

'তপোভঙ্গ' কবিতার এই পর্যন্ত তপোবিরুদ্ধ বসন্তের বর্ণনা। এর পর কবি, কাব্য, ছন্দ, সংগীতের আধিপত্য এবং সৃষ্টি সম্পর্কে কবির উপলব্ধি ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই অংশে 'তপোভঙ্গদূত আমি মহেন্দ্রের' এবং 'বারে বারে পঞ্চশরে অগ্নিতেজে দগ্ধ ক'রে' প্রভৃতি বর্ণনায় আমাদের চিত্তের পুরাণাশ্রয়ী প্রাচীন কাব্যসংস্কার প্রথম জাগ্রত হয়েছে। পরে নবীন কল্পনার দ্বারা অধিবাসিত হয়ে এক অপূর্ব আহ্লাদের জন্ম দিয়েছে। পরিচিত হর-পার্বতীর জীবনচিত্রের বক্রতা সাধনই কবির সৌন্দর্যময় জীবন-সংকেতের সহায়ক হয়েছে এবং এইভাবে চিত্রগত সৌন্দর্য এবং সংকেতগত রমণীয়তা একত্র আস্বাদ্য হয়েছে। কুমারসম্ভবে বর্ণিত মহাদেবের তপস্যা, অকাল-বসন্ত, মদনভস্ম, উমার তপস্যা, প্রমথগণের উল্লাস, বিবাহ-যাত্রা, মিলন প্রভৃতি সবই কবিকল্পনার বিশেষ সূত্রে গৃহীত এবং নবীন অর্থে মণ্ডিত হয়েছে। 'তপোভঙ্গ'-এর ঐ সব চিত্রপরম্পরার মধ্যে উজ্জ্বলতম হয়েছে রূপক অলংকারের আশ্রয়ে গঠিত তপস্যাকালের নিসর্গপরিবেশ—

কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিন-ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহমাঝে
উৎকণ্ঠিত বেগে।

নির্জন প্রান্তরতলে আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।

এ হ'ল নিসর্গে প্রলয়কালের আভাস। রুদ্রকে রাখালের সঙ্গে এবং দিনকে ধেনুর সঙ্গে অভেদে কল্পনা অভিনব চমৎকার সৃষ্টি করেছে। নির্জন প্রান্তরে আলেয়ার আলো এবং যুগান্তকালের ভয়ংকর মেঘে বিদ্যুৎ-দীপ্তির বর্ণনা এ-প্রসংগে অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে। সমস্ত মিলে কবির অভিপ্রেত 'সৃষ্টির দুঃখরূপ' প্রাসঙ্গিকভাবে অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে। এই ধরনের সংকেতচিত্র-নির্মাণ রবীন্দ্র-রচনাতেও স্বল্প দেখা যায়। 'তপোভঙ্গ' কবিতাটি কবির নটরাজ-কল্পনার অন্তর্গত। অর্থসংকেতের দিক থেকে ফাল্গুনী-বলাকার সঙ্গেও এর যোগ রয়েছে।

'পূরবী'র অর্থ-গৌরব এবং সংকেতময় চিত্রে রমণীয় অধিকাংশ কবিতাই অক্ষরমাত্রিক ছন্দের, দীর্ঘ চরণের ও দীর্ঘ পর্বের, যেমন—সাবিত্রী, আহ্বান, তপোভঙ্গ, ক্ষণিকা, লিপি, পদধ্বনি, মুক্তি, কৃতজ্ঞ, অন্ধকার, শেষ বসন্ত এবং আরও অনেক। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা গীতপ্রাধান্যের একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা এরই মধ্যে জেগে উঠেছে—বোধ হয় গূঢ় চিত্র-সংকেতের আধিক্যের প্রতিঘাতরূপেই জেগেছে—সেটি হ'ল 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতা। ছড়ার ছন্দে লেখা কয়েকটি কবিতাও এতে স্থান পেয়েছে, যদিও অক্ষরমাত্রিক রীতিরই এতে প্রবলতা।

পূরবীর লক্ষণীয় কবিতাগুলিতে ভাবসংকেতের দিক থেকে রয়েছে বিষাদময় বেদনা। আমরা বলি, হারানো মানুষের ও আনন্দক্ষণের স্মৃতি এবং কল্পনাময় অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি। এই স্মৃতি-চর্বণা ও বিষাদময় সন্ধানের একেবারে বাস্তবমূলে—কবি পুজা করেন এমন কোনও নারী—ধরা যাক কাদম্বরী দেবী—বর্তমান থাকলেও, কবি যে বাস্তব সম্পর্ককে কল্পনায় নূতন ক'রে গড়ে তুলেছেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট। **'লীলাসঙ্গিনী'** কবিতাতেই দেখা যায়, এই নারীমূর্তি নিসর্গ-সৌন্দর্য-প্রেরণার সঙ্গে একেবারে একাত্ম—

নদী-কূলে-কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।

এই সব বর্ণনার সঙ্গে 'মানস-সুন্দরী' ('সোনার তরী' কাব্য) কবিতার মানসিকতার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই ধরনের কবিতায় অর্থগৌরবের কোনও সমারোহ নেই, চিত্রও নগণ্য, আকর্ষণের বস্তু শুধু বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গাররসের মায়ামিশ্রিত কল্পনার কুহক। 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতায় শব্দধ্বনির অসামান্য বক্রতাগুণ অর্থসংকেতকে প্রতিহত ক'রে বিরহগত কল্পলোক বিস্তারে সাহায্য করেছে কিনা তা প্রশ্নের বিষয় হলেও আর্টের মায়া যে বিস্তৃত হয়েছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই—

দেখো না কি হায়, বেলা চলে যায়—
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীণ।

'লীলাসঙ্গিনী'র একেবারে কাছাকাছি কবিতা হ'ল **'খেলা,'** সেই জীবন-সন্ধ্যার অনুভব, সেই স্মৃতি-বিস্মৃতির মানস-চিত্রের সম্মিলন, ছড়ার ছন্দে গাঁথা। এগুলির মধ্যে কবির বাস্তব অনুরাগের কল্পনাগত রূপান্তরের ইতিবৃত্তেরও পরিচয় পাওয়া যাবে। সে ইতিবৃত্ত মনস্তাত্ত্বিক, কাব্যিক। সেখানে করুণ ফুল এবং কোমল পল্লবের বিকাশ। মাটির নিম্নে যে মূল আছে, কোন্ অরসিক তার সন্ধানে ছুটবে। এই ইতিবৃত্তের একটা স্পষ্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

যে-তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যুষবেলায়
প্রথম শুনাল মোরে নিশান্তের বাণী,
শান্তমুখে নিখিলের আনন্দমেলায়
স্নিগ্ধকণ্ঠে ডেকে নিয়ে এল; দিল আনি
ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
প্রাণের প্রাঙ্গণে; যে সুন্দরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি, কম্পিত পরশে
চম্পক-অঙ্গুলিপাতে তন্দ্রা-যবনিকা
সহাস্যে সরায়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়াল পরশমণি জ্যোতির কণিকা;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলায়ে দিল রূপের মণিকা;
এ-সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে,
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পুজিতে।

'পূরবী'র বহু কবিতার অর্থগত বৈচিত্র্যে এই কাব্য-কল্পনা-সঙ্গিনীর রহস্যময় আকর্ষণ প্রতিভাত হয়েছে। ফলে 'পূরবী' কেবল বয়ঃশেষের বিদায়ী মনোভঙ্গির কারুণ্যেই পূর্ণ হয় নি, দৈন্য, নির্বেদ, বিষাদ, শঙ্কা, স্মৃতি, তর্ক, সন্ধান প্রভৃতি সঞ্চারীর বর্ণসম্পাতে মনোহারীও হয়েছে।

এই শ্রেণীর অন্ততঃ দুটি কবিতায় কবির কল্পনার প্রৌঢ়তা এবং গভীর অর্থসংকেতের মিলিত রমণীয়তা উপভোগ্য হয়েছে। একটি হ'ল **'আহ্বান'**—

আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারংবার
ফিরেছি ডাকিয়া।

এ-কবিতাটির সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হলে এর অর্থসংকেত সম্বন্ধে প্রথম অবহিত হতে হবে। প্রথম স্তবকে এ-কবিতাটির বিরহ-ভাবুকতার আধার অর্থাৎ আলম্বন-বিভাবের সঙ্গে কবি-সম্পর্কের সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

কবি স্পষ্টতই তাকে বিচিত্ররূপা নারী ব'লে উপলব্ধি ক'রে তার প্রণয়ের আভাস দিয়েছেন এবং ঐ প্রণয়ের প্রভাবে কবির নিজ আত্মার জাগরণ ('তার সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি চিনি আপনারে') বিবৃত করেছেন। দ্বিতীয় স্তবকে প্রয়োজনের জগতের নানা জঞ্জালে পরিকীর্ণ কবিচিত্তের নিরানন্দ বিমূঢ়তার কথা উপস্থাপিত ক'রে ঐ বিচিত্ররূপা নারীর করুণায় অবলুপ্তি থেকে উদ্ধারের বিষয় জানানো হয়েছে। তৃতীয় স্তবকে সৌন্দর্য ও আনন্দ-অনুভবের মধ্যে ঐ কবি-আত্মার জাগরণের স্বরূপ বিস্তৃতি সহকারে বলা হয়েছে—

তুমি মোরে চাও যবে, অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জ্বলে,
অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গলে আসে
নৃত্য-কলরোলে।

অসাড়তা, নিশ্চল তুষারত্ব, 'অব্যক্তের অখ্যাত আবাস' প্রভৃতি হ'ল কবির আত্মচৈতন্যের সংকোচ, রজস্তমোগুণের মালিন্যে আবৃত আনন্দময় সংবিতের অপ্রকাশের অবস্থা। কবির প্রত্যয় হল—এই আনন্দলোকে মুক্তি ঐ নারীর প্রণয়-করুণাতেই সম্ভব হয়েছে। চতুর্থ স্তবকে পৃথিবীর সঙ্গে কবির সৌন্দর্য-সম্পর্ক এবং আনন্দের স্বরূপ বিবৃত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবকে ঐ বিচিত্র সৌন্দর্যের স্বর্গীয়তা ব্যক্ত করা হয়েছে। অজানা কোনও পরিপূর্ণ সৌন্দযলোক থেকে প্রেরণা আসে ব'লেই মাটির বুকে চাঞ্চল্য জাগে, তৃণতরু পত্রে পুষ্পে বিকশিত হতে থাকে, রহস্যময় অপরিচিত এই ধুলা-মাটির মধ্যে নিজেকে ধরা দেয়। সপ্তম-অষ্টম স্তবকে ঐ বিচিত্ররূপা নারীকে এই স্বর্গের দূতী ব'লে ('আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক') অভিহিত ক'রে কবি এঁর কার্যকারিতা বর্ণনা করেছেন : 'নশ্বর পৃথিবীতে মাটির ভাণ্ডে যে স্বর্গীয় সুধা সঞ্চিত রয়েছে, দেবতার হয়ে এখানে এসে তুমি স্বয়ং সে সুধার জন্য কাতর হয়েছ এবং কবির চিত্তেও কাতরতা জাগিয়ে তুলেছ। কল্পনায় যে বেদনার অনুভব, বিমূঢ়তা থেকে চিত্তের যে জাগরণ তা তোমার করুণাতেই সম্ভব হয়েছে। বস্তুতঃ পৃথিবীর স্বর্গীয়তা এবং কবিমানসের মধ্যে ঐ স্বর্গের যোগসূত্র রচনা তোমারই'। ঐ অষ্টম স্তবকের শেষে কল্পনায় জাগরিত মুক্ত কবিসত্তার স্বরূপ একটি অভিনব চিত্রের সংকেতে পরিস্ফুট করা হয়েছে—

সুপ্তির্ তিমিরবক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস

দীপ্তির কৃপাণে ;
বীরের দক্ষিণ হস্ত মুক্তিমন্ত্রে বজ্র করে বশ,
অসত্যেরে হানে ॥

এখানে 'সুপ্তির তিমির' এবং 'অসত্য' অভিধায় লৌকিক প্রয়োজন-সীমার অবরুদ্ধতার কথা বলা হয়েছে। 'তেজস্বী তাপস' এবং 'বীর' অর্থে নিরাসক্ত নির্মম কঠোর কবিস্বভাবের বিষয় ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'মুক্তিমন্ত্রে' 'দীপ্তির কৃপাণে' প্রভৃতি বর্ণনায় বন্ধনমুক্ত চিৎস্বরূপে উদ্বোধিত কবি-আত্মার কার্যকারিতা লক্ষিত হয়েছে। নবম-দশম স্তবকে নানা কারণে অবরুদ্ধ কবিচিত্ত নারীরূপা সৌন্দর্যে-মুক্তির কারয়িত্রী শক্তিকে ব্যাকুলতা সহকারে আহ্বান করছে, 'তারায় তারায়' তার অনুসন্ধান করছে—

দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী-বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি-পরশ।
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গসুধারস ॥

এই চাওয়ার ব্যাকুলতার মুহূর্তে কবি অনুভব করছেন, এখনও সৌন্দর্যলোকে তাঁর অন্তরের চরম মুক্তি সম্ভব হয় নি। ঐ নারীর স্পর্শমণির স্পর্শেই তা ঘটবে ব'লে কবি মনে করছেন—

কোথা তুমি, শেষবার যে ছোঁয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সংগীতে ?

এর সঙ্গে তুলনীয় 'শেষের পেয়ালা ভরে দাও হে আমার, সুরের সুরার সাকী' ('বকুল বনের পাখি')। একাদশ-দ্বাদশ স্তবকে ঐ সৌন্দর্য-প্রেরণার অভাবে শুষ্ক কবিচিত্তের ব্যগ্রতা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম কাব্যজীবনে যা উপলব্ধি করেছিলেন সেইরকম রসের প্লাবন কবির কাম্য হয়েছে। পূর্বেকার মতই সাংকেতিক চিত্রে এই মনোভাব বিবৃত হয়েছে—

মহেন্দ্রের বজ্র হতে কালো চক্ষে বিদ্যুতের আলো
আনো, আনো ডাকি,
বর্ষণ-কাঙাল মোর মেঘের অন্তরে বহ্নি জ্বালো,
হে কালবৈশাখী।

আলংকারিকদের ভাষা দিয়ে এর মর্ম ব্যাখ্যা করলে বলা যেত, আমার যে চিৎ ও আনন্দময় স্বরূপ, তার বহিরঙ্গে প্রয়োজনের জগতের স্থূলতার প্রলেপ

পড়েছে, সেই আবরণকে সবলে ভাঙতে হবে। তুলনীয় নৈবেদ্যের কবিতা—'দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল, হে ইন্দ্র, হৃদয়ে মম'। শেষ তিন স্তবকে অপ্রাপ্তিজনিত হতাশা ব্যক্ত হয়েছে। এর মধ্যে নিশ্চিতভাবে সৌন্দর্যসত্তার, সৌন্দর্যের দূতীতে অথবা লীলাসঙ্গিনীতে রূপান্তরিত পরলোকগত মানবীর জন্য বিরহ ব্যঞ্জিত হয়েছে—

কাহারে ডাকিস্ তুই, গেছে চলে তার স্বর্ণরথ
কোন সিন্ধুপারে ॥

সৌন্দর্যের তথা ঐ বিচিত্ররূপা সৌন্দর্যময়ীর সঙ্গে নিঃশেষ পরিচয়ের অভাব বোধে, হতাশায় কবিতাটি শেষ হয়েছে—'অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি, নিতে হল তুলে।' এরকম হতাশা এই ধরনের কবিতায় সর্বত্র।

এ কবিতাটি নিঃসন্দেহে কবির গভীর আত্মভাবুকতা থেকে সমুৎপন্ন, যেমন সমুৎপন্ন 'মানস-সুন্দরী' 'বসুন্ধরা' 'এবার ফিরাও মোরে' 'পঁচিশে বৈশাখ' 'বিপ্লব' প্রভৃতি আত্মভাবজীবনমূলক কবিতানিচয়। কবিতাটির মধ্যে কবির ব্যক্তিগত আবেগ-উচ্ছ্বাসের প্রবলতা এবং চিত্রসম্পদের বিরলতা লক্ষণীয়। কবিতাটির একশ'-কুড়ি চরণের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে মাত্র পরিস্ফুট চিত্র যোজিত হয়েছে, তাও বহুলাংশে সংকেতমণ্ডিত হয়ে। এর মধ্যে নারীরূপ-মণ্ডনের আভাস যদি মিশ্রিত না থাকত, কবিতাটি শুধু সাংকেতিক হয়ে নিতান্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর হ'ত—

(১) দীপখানি তুলে ধরে, মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি,
চিনেছে আমারে।

(২) অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গ'লে আসে
নৃত্যকলরোলে।

(৩) মানসতরঙ্গতলে বাণীর সংগীত-শতদল
নেচে ওঠে জেগে।

(৪) 'সুপ্তির তিমির বক্ষ' —ইত্যাদি পূর্বে উদ্ধৃত।

(৫) 'মহেন্দ্রের বজ্র হতে' —ইত্যাদি পূর্বে উদ্ধৃত।

(৬) ....দক্ষিণ পবন
বহুক্ষণ চলে গেছে অরণ্যের পল্লব মর্মরি

(৭) সন্ধ্যারতি-লগ্নে কেন আসিলে না নিভৃত মন্দিরে
শেষ পুজারিনী ?
কেন সাজালে না দীপ......

উল্লিখিত অর্থচিত্রসমূহ এবং অনুরূপ চিত্রের কিছু কিছু আভাস কবির নৈষ্ঠিক ব্যক্তিভাবনাকে অনুরঞ্জিত ক'রে—কাব্যপদবীতে নিয়ে গেছে। দীর্ঘপর্বে অনতিরিক্ত মিলে বাহিত এবং প্রায়শঃ বিরুদ্ধ-ব্যঞ্জন-সংঘাতে পুষ্ট এর পঙ্‌ক্তিগুলি কবির আন্তরিকতা প্রকাশের যোগ্য হয়েছে। কবি-আত্মার জাগরণ এবং কবির সৌন্দর্য-বিরহ এ দুটি প্রসঙ্গ কবিতাটির স্থায়ী ভাবনার অন্তর্গত, আর দুটিই নারীস্মৃতিসংসর্গে সুতরাং শৃঙ্গাররসবৈচিত্র্যে বিমণ্ডিত হয়েছে। সম্ভবতঃ কবির নিতান্ত আত্মভাবনিষ্ঠার জন্য কবিতাটিতে প্রকাশ পর্যায়ে একটু অনবধানতা ঘটেছে। যে 'আহ্বান' কবি বিচিত্রবেশা, আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, সৌন্দর্যের দূতী সম্পর্কে অনুভব করেছেন সেই আহ্বান দুটি ভিন্ন আধারেও অনুভূত হওয়ায় অর্থ-অনুধাবনে বিভ্রাটের সৃষ্টি করেছে, যেমন—

(১) কোন্ জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে; নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।

(২) নিঃশব্দ চরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
দাঁড়ায় একাকী,
রক্ত-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি কারে
চলে যায় ডাকি।

অমরাবতীর কল্পচিত্রের জ্যোতির্ময়ী এবং চিত্রিত উষা কবির অভীপ্সিত নারী-মূর্তি থেকে পৃথক নিশ্চয়ই।

'ক্ষণিকা' কবিতাও এই নারীমূর্তির বিরহ থেকে বাণীময় হয়েছে। 'আহ্বানের' সঙ্গে পার্থক্য এই যে ঐ পরিচিত অথচ বিলুপ্ত, কেবল একান্ত অনুরাগের দ্বারা আকৃষ্ট মূর্তির লৌকিকতা প্রবল, সৌন্দর্য-সত্তায় রূপান্তর সামান্য অংশে মাত্র বর্ণিত। ফলে কবিতাটিতে প্রণয়ের সঙ্গে রহস্যময়তার বিমিশ্রণ ঘটেছে, বিরহ-কবিতায় যা হওয়া স্বাভাবিক। 'ছবি' কবিতার "আজি তাই শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল" প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়ে 'ক্ষণিকা' কবিতার শেষ স্তবক পাঠ করতে হবে—

খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হতে আসে ক্ষণতরে

আশ্বিনে—গোধূলি আলো, যেথা হতে নামে পৃথ্বী 'পরে
শ্রাবণের সায়াহ্ন-যূথিকা ;
যেথা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টীকা ॥

এ কবিতায় প্রিয়তমাকে শেষে নিসর্গ-সৌন্দর্যের রহস্যের মধ্যবর্তী ক'রে দেখা হয়েছে। বহু পূর্বেকার 'মানস-সুন্দরী' এবং এখনকার 'ছবি' অথবা 'লীলাসঙ্গিনী' অথবা 'আহ্বান' কবিতাতেও তাই। এই হল কবির বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এই কবিতাটিতে লৌকিক প্রণয়াসক্তির পরিচয় অনেকটা স্থানই অধিকার করে রয়েছে। এমন কি বাস্তব বাসনার রক্তচ্ছটাও কবিতাটিতে দুর্লভ নয়। নিম্নলিখিত অংশে একটি বাস্তব ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে*—

অপূর্ণের লেখাগুলি তুলে দেখি বুঝিতে না পারি ;
চিহ্ন কোনো রেখে যাবে, মনে তাই ছিল কি তোমারি ?
ছিন্ন ফুল, একি মিছে ভান ?
কথা ছিল শুধাবার, সময় হল যে অবসান।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বাস্তব বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারকে অতিক্রম ক'রে কবি নিসর্গ-চিত্রের রম্যস্পর্শের অনুভব জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ক্ষণিকার শেষ স্তবকের এই চিত্রগুলিতে ঐ 'মায়াচ্ছন্ন লোকে'র সংকেত বেজেছে।

পুরবীর অনেকগুলি কবিতার উপাদানরূপে প্রণয়ভাবুকতা রয়েছে। এক সঙ্গে এত প্রণয়-কবিতার গ্রন্থন অন্য কোনও কাব্যগ্রন্থেই নেই। কিন্তু এগুলির মধ্যে আবেগ-রিক্ততা এবং শান্ত স্মৃতিচারণার ছবিই প্রধান। নিসর্গচিত্রও এই স্মৃতি এবং বিরহভাবের রমণীয়তার বিশেষ কারণ হয়েছে। এরকম একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হল **'শেষ বসন্ত'**। অনুরাগময় বাস্তব আকর্ষণ থেকে কবিতাটির উদ্ভব কিন্তু কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ প্রেমের ব্যঞ্জনায় এটি রবীন্দ্র-প্রেম-কবিতার মধ্যে অনন্যসদৃশ। 'শেষ বসন্ত'কে কয়েক দিনের মধ্যে লেখা বিদেশি ফুল, অতিথি, অন্তর্হিতা প্রভৃতি কবিতার রচনা-পরিণাম এবং শীর্ষপুষ্প বলা যেতে পারে। যাই হোক, এ কবিতাটিতে কবি প্রণয়পাত্রীকে ঠিক দেহীরূপে দেখেন নি, আনন্দময় নিসর্গ সৌন্দর্যের

*বন্ধুবর জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য 'কবিমানসী' নামে চরিত গ্রন্থে 'ক্ষণিকা' কবিতাটির উপাদান হিসাবে আনা তড়খড়কে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু সংশয় ভিন্নপাত্রেও অর্পিত হতে পারে স্বচ্ছন্দে। চরিতকারেরা যা-ই লিখুন, প্রণয় অথবা প্রণয়াভাস অবলম্বন ক'রে কবি যে-রমণীয় কল্পলোক নির্মাণ করছেন তার বৈশিষ্ট্যই অনুধাবনযোগ্য।

লীলা-সঙ্গিনীরূপে অনুভব করেছেন। বাস্তবের রমণীর এই কল্পমূর্তিগঠন কবিতাটির অভিনবতা উৎপন্ন করেছে প্রণয়-কবিতার দিক থেকে। প্রথম স্তবকে পুষ্পবিকীর্ণ বসন্ত-বীথিকায় ইনি কবির খেলার সঙ্গিনীরূপে প্রার্থিতা। জীবনের দিনশেষ অনুভবের কারুণ্যে বিজড়িত হয়ে সহচরীর ক্ষণিক সঙ্গলাভের বাসনা দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি স্তবকে প্রকাশিত। চতুর্থ স্তবকে নিসর্গ-মধ্যবর্তিনী এই নারীর রূপানুরাগ কথঞ্চিৎ অভিলষিত হয়েছে—

পাতার আড়াল হতে বিকালের আলোটুকু এসে
আরো কিছুক্ষণ ধরে ঝলুক তোমার কালো কেশে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি নিসর্গলীলার সঙ্গে এক হয়ে অনুভূত হয়েছেন এবং প্রায় মায়ামূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছেন--

হাসিয়ো মধুর উচ্চ হাসে
অকারণ নির্মম উল্লাসে,
বনসরসীর তীরে
ভীরু কাঠবিড়ালিরে
সহসা চকিত করো ত্রাসে।

এই লীলাময়ীর কাছে প্রণয়-কথা নিবেদন করতে কবি দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন—

ভুলে যাওয়া কথাগুলি কানে কানে করায়ে স্মরণ
দিব না মন্থর করি ওই তব চঞ্চল চরণ।

সন্ধ্যার একটি সকরুণ নিসর্গচিত্রের মধ্যে প্রণয়িনীর প্রয়াণ কল্পিত হয়েছে এবং তাঁর কাছে যে বিদায়ের শেষ প্রাপ্য কবি কামনা করেছেন তা নিঃশেষে দেহসীমাকে অতিক্রম করেছে এবং বিচ্ছেদের মায়ালোক রচনা করেছে। দুটি বিষয় প্রণয়-কবিতাটিকে আবেদনপূর্ণ করে তুলেছে,—বিচ্ছেদ-কাতর মিনতি এবং সন্ধ্যা ও গোধূলির নিসর্গ। দিনশেষের অনুভবের আন্তরিকতা বেলা-যাওয়া, দিন-গণা, ফিরে-পাওয়া প্রভৃতি পরিচিত শব্দার্থে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে কয়েকটি শব্দ বা বাক্য সাধারণ অর্থ ত্যাগ না ক'রেও সংকেতিত অর্থে নিয়ে যাচ্ছে, যেমন, 'তোমার কাননতলে ফাল্গুন আসিবে বারংবার'—এতে শুধু নিসর্গেরই বর্ণনা নয়, প্রণয়পাত্রীর বয়ঃ-স্বল্পতাও কথিত হয়েছে; 'দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে' ব্যঞ্জনায় কবির দিন-শেষকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে; 'তোমার বিকচ ফুলবনে' প্রভৃতিতে ঐ রমণীর যৌবন ও রূপ নিজ বৈপরীত্যে আভাসিত হয়েছে এবং 'সূর্য অস্ত যায়নি

এখনো' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে কবিজীবনের গোধূলি লক্ষিত হয়েছে, সন্ধ্যা নয়,—অতএব এখনও নিসর্গ-সৌন্দর্যরসিক এবং প্রেমিক কবি আনন্দরসে নিমজ্জিত হতে পারবেন এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কবির দেশান্তরে যাওয়ার কয়েকদিন এখনও বাকি আছে, এ ইঙ্গিতও ফুটে উঠেছে। এইভাবে কবিতাটি অত্যন্ত সহজ ভাষাভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়েও ব্যঞ্জনা-প্রধান হয়ে পাঠকের স্থায়ী বিষাদ-ব্যাকুলতার কারণ হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের কথা হলেও ব্যক্তিগত বিশেষ কোনও ঘটনা বা আবেগের বাহুল্য থেকে মুক্ত হয়ে নৈর্ব্যক্তিক আনন্দরস বিতরণের চারুতার অধিকারী কবিতাটি হতে পেরেছে। প্রতিটি স্তবকে কবির ব্যাকুলতার এবং ঐ ক্ষণিকার বিভিন্ন বিলাসের চিত্র কবিতাটির আকর্ষণের অন্যতম কারণ হয়েছে। 'লীলাসঙ্গিনী'র মত অনুপ্রাস-ঝংকার এর বিষাদ-মহিমা ক্ষুব্ধ করতে পারে নি।

প্রেমে বাস্তব-বাসনার তীব্রতা রবীন্দ্রচিত্তে কত ক্ষীণ এবং বাস্তবকে অজানায় উত্তীর্ণ ক'রে দেখার আগ্রহ কত প্রবল তার পরিচয় পাওয়া যাবে **কিশোর প্রেম** কবিতায়। কবিতাটি জীবনের প্রথম প্রণয়-চুম্বন প্রাপ্তি সম্পর্কে; অথচ তার জ্বালাময় উত্তাপ এবং বেদনাময় জাগরণের পরিচয় কুত্রাপি নেই। হোক বার্ধক্যের স্মৃতিচারণ, তবু বিষয় যদি বাস্তব হয় তাহ'লে তার অনুষঙ্গেও তো বাস্তবতার পরিচয় গ্রথিত হবে। কিন্তু একথাই বা বলি কেন, কবিরা সব সময় সত্য ঘটনা নিয়ে লিখবেন এমন কোনও কথা নেই। কবিতাটি রচনার দিক থেকেও বর্ণহীন, চিত্রগীতের প্রসাদ থেকে বঞ্চিত।

কবির নিতান্ত আত্মলীনতা তাঁর প্রৌঢ় কল্পনা এবং রমণীয় অর্থে পুষ্ট হয়ে কাব্যবৈচিত্রীর সৃষ্টি করেছে **'সাবিত্রী'** কবিতায়। কবিতাটি কবির আত্ম-পরিচয় বলা যেতে পারে। অন্তরগত আনন্দ-চৈতন্যের প্রকাশ সম্পর্কে বিস্ময় কবিতাটির রচনামূলে, আর নিসর্গসৌন্দর্যের চিত্রপরম্পরা কবির আত্ম-অনুভবের ব্যাপারটিকে আস্বাদনীয় করে তুলেছে। এ না থাকলে কবির আন্তর রহস্য সহৃদয় সামাজিকের অনুভবের অগোচরে থাকত বলেই মনে করি। কবি তাঁর অনুভবের বিস্ময় থেকে ঐ অনুভবের মূল কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং সূর্যের মধ্যে কেবল তাঁর প্রাণেরই নয়, তাঁর সমগ্র কবিসত্তার প্রেরণা নিহিত ব'লে কল্পনা করেছেন। সম্ভবতঃ সুপ্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ ভারতীয় ধারণা তাঁকে এই বিষয়ে সূর্যাভিমুখী করেছে। গায়ত্রী মন্ত্রের

প্রেরণায় তিনি এই কবিতাটি লিখেছেন এমন মনে করলে ভুল করা হবে। কবির প্রকাশময় নিজসত্তার উপলব্ধি প্রথম, এর কারণের অনুসন্ধান পরের। এই সূত্রে সহজেই প্রসবিত্রী সাবিত্রী তাঁব অনুসন্ধানবৃত্তির সংলগ্ন হয়ে পড়েছে। অসুস্থ অবস্থায়, শীতের কুহেলিকায় সূর্যের প্রতি অনুরাগ বাস্তব হতে পারে। কবিতাটির অর্থসংকেত-নির্মাণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাক।

প্রথম স্তবকে, আকাশের মেঘাবরণে এবং সূর্যের অদর্শনে বিরক্ত কবি সূর্যের মুখ দেখতে চাইছেন। ব্যঞ্জনায়, অন্তরের বিলুপ্তচৈতন্য বিমূঢ় অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে সৌন্দর্যের মধ্যে আত্মজাগরণ চাইছেন। এই উদ্বোধন, তাঁর ধারণায় সূর্যের অভ্যন্তর থেকেই সম্ভব, কারণ, সূর্যের মধ্যেই তিনি তাঁর কবি-আত্মার জাগরণের প্রেরণা পেয়ে থাকেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 'তৎসবিতুর্বরেণ্যং' ইত্যাদি গায়ত্রী মন্ত্রের সঙ্গে নিজ কল্পনাকে মিলিয়ে নিয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছেন, তাই বলছেন—'জানি তারে জানি'। 'প্রথম প্রত্যুষে' ইত্যাদি বাক্যে কবিশক্তির স্বাক্ষর লাভের কথা বলা হয়েছে। চুম্বনদানের সংকেতে ঐ বিষয় ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তবকে 'কবি'র আত্মচরিত এবং কাব্যপ্রেরণা ও কাব্যরচনার কথা বলা হয়েছে। 'জ্বালার তরঙ্গ' 'অগ্নির প্রবাহ' 'রক্ত নাচে' ইত্যাদি ভাষায় কবিমানসের অসাধারণত্ব এবং বৈশিষ্ট্যকে আতিশয্য সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপ বর্ণনা 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায়—"অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাহারে দেয় তার বক্ষে বেদনা অপার—তার নিত্য জাগরণ" ইত্যাদি। সূর্যের মধ্যে এই শক্তিকে কবি অনুভবে সত্য বলে মনে করেছেন, 'আদি কবি' বলে অভিহিত করেছেন এবং তার প্রেরণাতেই ব্যক্তি রবীন্দ্রের চিত্তে কবি-কল্পনা এবং নিসর্গাশ্রিত সৌন্দর্যবোধ উদ্ভূত হয়েছে এরকম ধারণা করেছেন। কবির প্রাণসত্তার সম্যক পরিচয় যেহেতু কাব্যানুভবেই, সেইহেতু জীবনস্পন্দনের কারণরূপেও কবি সূর্যকে দেখেছেন। অবশ্য এ কবির জীবন। সেই কথা চতুর্থ স্তবকে—'এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী'। 'আশ্বিনের রৌদ্রে' প্রভৃতি কয়েক চরণে সৌন্দর্যপিপাসু কবিমানস বর্ণিত। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ স্তবকে কবিচিত্তের স্বপ্নরহস্যময়তা, নিসর্গানুরক্তি এবং নিরাসক্তির বিষয় কবি জ্ঞাপন করেছেন। 'ঝঞ্ঝার মদিরামত্ত বৈশাখের তাণ্ডবলীলায়' ইত্যাদিতে কেবল নিসর্গের রুদ্রসুন্দরই নয়, জীবনের শোক দুঃখের আঘাতও ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'তারপরে যেন তারা সর্বহারা দিগন্তে মিলায়' প্রভৃতি বাক্যার্থের মূলে কবির বার্ধক্যজনিত মনোভাব ব্যক্ত করেছে।

সপ্তমে শরৎ-স্পর্শে আলোকের ও বর্ণের জন্য আগ্রহশীল কবির বাণীর উৎসার বর্ণিত হয়েছে। 'শূন্য পথে' ইত্যাদির মধ্যে, উদ্দেশ্য যেন কবির অজ্ঞাত, এই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। ফলে এখানে কবি কল্পনা করছেন—কাব্য-প্রেরণার ঐ যে উৎস, তার উদ্দেশ্যেই তাঁর রাগিণীর যাত্রা। 'স্বপ্নাবেশে চলে একাকিনী' উক্তিতে তাঁর কাব্যের মধ্যে ধ্বনিত বিরহভাবুকতার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। অন্তিম স্তবকে অনুসন্ধানমূলক কাতরোক্তি। গোধূলি, সন্ধ্যা, প্রদোষ, দিনান্ত প্রভৃতি সমার্থক শব্দের পুনঃপুনঃ ব্যবহারে 'দিনশেষের যাত্রী' মনোভাবের পরিচয় স্পষ্ট।

প্রারম্ভের স্তবকগুলিতে কবি-আত্মার রহস্যের পরিচয়। কবি তাঁর কাব্য-কল্পনাকেই একান্ত সত্য বস্তু ব'লে মনে করেন এবং আত্মমগ্ন অনুভবের নিবিড়তার মধ্যে অনন্ত বা চরমের স্পর্শ পান। এই অনুভবকে পাঠকের গোচরে আনতে গিয়ে সৃষ্টির প্রত্যক্ষ যাবতীয় বস্তুর অন্তরাত্মা সূর্যের মধ্যে প্রেরণার উৎসের পরিচয় দিয়েছেন। এই হল তাঁর বক্তব্যের মধ্যেকার প্রাথমিক অতিশয়োক্তি। কবির অন্তরের কল্পনাময় রহস্যানুভবের সত্যতা-সম্পর্কে-নিশ্চয় একদা তাঁর 'অন্তর্যামী' কবিতায় উপলব্ধ হয়েছিল। ঐ সময়েই ছিন্নপত্রাবলীর কয়েকটি চিঠিতে এবং পরে আত্মজীবনী লেখার সময় গদ্যে কবি তাঁর এই প্রবল আন্তরিকতাকে সুস্পষ্ট করেছিলেন। 'পূরবী'র কয়েকটি কবিতায় পরিণত বয়সে তিনি আত্ম-অনুভবের অবস্থাকে পুনরায় পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং এরই কাছাকাছি সময়ে লেখা 'সাহিত্যের পথে'র প্রবন্ধাবলীতেও কবির মানস-বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করেছেন। এই কবিতার ছন্দে-গ্রথিত অতিশয়মূলক বর্ণনার মূলে যে সত্যভাষণ বা ইতিবৃত্তের দিক রয়েছে তা লক্ষ্য করা যেতে পারে—

(১) এই ভরা নদীর ধারে, বর্ষার জলে প্রফুল্ল নবীন পৃথিবীর উপর শরতের সোনালি আলো দেখে মনে হয় যেন আমাদের এই নবযৌবনা ধরণীসুন্দরীর সঙ্গে কোন্-এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসা-বাসি চলছে—তাই এই আলো এবং এই বাতাস, এই অর্ধ-উদাস অর্ধ-সুখের ভাব, গাছের পাতা এবং ধানের ক্ষেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম স্পন্দন—জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্মল নীলিমা। স্বর্গে মর্তে একটা বৃহৎ গভীর অসীম প্রেমাভিনয়। (পত্রসংখ্যা ৬৯)

(২) এখানকার রৌদ্রে আমার সেই ছবি দেখার বাল্যস্মৃতি ভারি জেগে ওঠে। এর যে কী মানে আমি ঠিক ধরতে পারিনে, এর সঙ্গে যে কী একটা আকাঙ্ক্ষা জড়িত আছে আমি ঠিক বুঝতে পারিনে……আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। (পত্রসংখ্যা ৭০)

(৩) ……কিন্তু এই পর্যন্ত বেশ বলতে পারি কল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালাবদল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ও মেয়েটি পয়মন্ত নয় তা স্বীকার করতে হয়—আর যাই হোক, সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না। সুখ দেন না বলতে পারিনে, কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আনন্দ দেন, কিন্তু এক এক সময়ে কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎপিণ্ডটি নিংড়ে রক্ত বের করে নেন। যে লোককে তিনি নির্বাচন করেন, সংসারের মাঝখানে ভিত্তি স্থাপন ক'রে গৃহস্থ হয়ে স্থির হয়ে আয়েস করে বসা সে লক্ষ্মীছাড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।…জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনো মিথ্যা বলি নে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীব সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান। (পত্রসংখ্যা ৯৪)

(৪) ……মানুষের মনখানাও ঠিক ঐ প্রকৃতির মতো রহস্যময়। চতুর্দিকে শিরা উপশিরা স্নায়ু মস্তিষ্ক মজ্জার ভিতর কী এক অবিশ্রাম ইন্দ্রজাল চলছে —হু হু শব্দে রক্তস্রোত ছুটেছে, স্নায়ুগুলো কাঁপছে, হৃৎপিণ্ড উঠছে পড়ছে, আর এই রহস্যময়ী মানবপ্রকৃতির মধ্যে ঋতুপরিবর্তন হচ্ছে।……নিজের ভিতরকার এই অপার রহস্যের কথা মনে করলে ভারি ভয় হয়—কী করতে পারব না পারব কিছুই জোর করে বলতে পারিনে—মনে হয়, কিছুই না জেনে আমি এ কী একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড সর্বদাই স্কন্ধে বহন করে নিয়ে বেড়াই, আয়ত্তও করতে পারি নে, অথচ এর হাতও কিছুতেই এড়াতে পারি নে— জানি নে এ আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, আমিই বা একে কোথায় নিয়ে যাব—আমার স্কন্ধে এই ভয়ংকর রহস্যভারটা যোজনা করে দেবার কী আবশ্যক ছিল! বুকের ভিতর কী হয়, শিরার মধ্যে কী চলছে, মস্তিষ্কের মধ্যে কী নড়ছে, কত কী অসংখ্য কাণ্ড আমাকে অবিশ্রাম আচ্ছন্ন করে ঘটছে, আমি দেখতেও পাচ্ছি নে, আমার সঙ্গে পরামর্শও করছে না……আমি একটা সজীব পিয়ানো যন্ত্রের মতো—ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে অনেকগুলো তার এবং কলবল আছে; কখন কে এসে বাজায় কিছুই জানি নে, কেন

বাজে তাও সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত, কেবল কী বাজে সেইটে জানি—সুখ বাজে কি ব্যথা বাজে, কড়ি বাজে কি কোমল বাজে, তালে বাজে কি বেতালে বাজে এইটুকুই বুঝতে পারি। (পত্রসংখ্যা ১১৯)

উদ্ধৃত অংশগুলির বহু বক্তব্যের সঙ্গে 'অন্তর্যামী' এবং 'সাবিত্রী' কবিতার বক্তব্যের মিল পাওয়া যাবে। নিসর্গ-সৌন্দর্য সমাবেশে এবং অলংকার-সংকেতে চিত্রিত ও আবেগে প্রবাহিত হয়ে ঐ সব উক্তি এখানে কাব্যের মূর্তি পেয়েছে।

এর দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিশয়োক্তি ছড়িয়ে রয়েছে কল্পনাশীল কবির আন্তর রহস্যের বর্ণনায়। যেমন—

'সে বংশী আমারি চিত্ত, রন্ধ্রে তার উঠিছে গুঞ্জরি
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবীমঞ্জরী,
নির্ঝরে কল্লোল।'

অথবা, 'জানি না কী মত্ততায়, কী আহ্বানে আমার রাগিণী
ধেয়ে যায় অন্যমনে শূন্যপথে হয়ে বিবাগিনী,'

অথবা, 'কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্ত প্রাণে ?'

অথবা, 'প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোক-বিন্দুর'

এর তৃতীয় শ্রেণীর অতিশয়োক্তি বা সাধারণ চারুতা ফুটে উঠেছে রূপক, সমাসোক্তি প্রভৃতির ব্যবহারে, যেমন, 'তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা।' বিচিত্র নিসর্গ-রমণীয়তা এখানে শুধু আলিম্পন-অঙ্কনের চিত্রে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এ ছাড়া নিসর্গ-সৌন্দযস্পর্শ কবি ভিন্নভাবেও সঞ্চারিত করেছেন নিম্নলিখিতরূপ পঙ্‌ক্তিতে—

তারা সব মিলে থাক অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে
শ্রাবণ-বর্ষণে ;
যোগ দিক নির্ঝরের মঞ্জীর-গুঞ্জন-কলরবে
উপল-ঘর্ষণে।

এসবের মধ্যে অনুপ্রাস-বাহিত গীতরীতির সৌন্দর্যও আকর্ষণীয় হয়েছে। এইভাবে কবির ব্যক্তিগত আনন্দতত্ত্বকথা কাব্যের চেহারা নিয়ে পাঠককে যথাসম্ভব মুগ্ধ করেছে, কবি-আত্মার রহস্যজনক নিগূঢ় পরিচয় পাঠক অনেকটা সানন্দে গ্রহণ করেছেন।

এইরকম আর একটি কবিতা তাঁর **'পঁচিশে বৈশাখ'**। এর মধ্যে পুরাতন ও নূতন, মৃত্যু এবং জন্মের উপলব্ধ তত্ত্ব, এবং আত্মকথা রমণীয় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে চিত্রগীতসমন্বিত কবির অনুভব ব'লে। এর প্রথম অংশে বৈশাখের নিসর্গরম্যতার বর্ণনা আত্মপরিচয়ের সঙ্গে মিলিত হয়েও উজ্জ্বলতা রক্ষা করেছে—

আর সে একান্তে আসে
মোর পাশে
পীতউত্তরীয়তলে লয়ে মোর প্রাণদেবতার
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার—
নীলকান্ত আকাশের থালা,
তারি 'পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পিয়ালা।

এই বর্ণনায় কবির পৃথিবী-প্রীতির সৌন্দর্যকে একান্ত ক'রে দেখার চরিত্রের সংকেত রয়েছে। কিন্তু তা ছাড়া পৃথক্‌ভাবেও এই অংশের রম্যতা আস্বাদনীয় হয়েছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং স্নেহপ্রেম-পূর্ণ মানবীয় প্রীতিরসের আস্বাদ সংক্ষেপে 'উচ্ছলিত সুধার পিয়ালা' ইত্যাদিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে। এখানে ঐ সংক্ষেপকরণই কাব্যসৌন্দর্যের কারণ হয়েছে। পরবর্তী অংশেও কবির আবির্ভাবের বিস্ময়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গীতময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রাধান্য বিস্তার করেছে—

নবমল্লিকার গন্ধে
সপ্তপর্ণ-পল্লবের পবন-হিল্লোল-দোল-ছন্দে,
শ্যামলের বুকে,
নির্নিমেষ নীলিমার নয়নসম্মুখে।

কবিতাটির শেষ অংশ সংকেতিত অর্থগৌরবে সমৃদ্ধ। বাইরের দিক থেকে পুরাতন হলেও আন্তরসত্তায়, কাব্যরসাস্বাদের মধ্যে উপলব্ধ আত্মস্বরূপে তিনি চিরনবীন—এই নবার্থসংকেত এই অংশের পাঠে পাঠকের চিত্তে কতকটা বিস্ময়ের আহ্লাদ উদ্ভূত করেছে। এইজন্য কবিতাটির মর্মে কিছু তত্ত্ব থাকলেও কাব্যরসের সঙ্গে মিলিতভাবেই তা প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য কবি নিজ সত্তার বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করার আগ্রহে এমন কিছু কবিতাও লিখেছেন যা তথ্যের ও তত্ত্বের কুহেলিকা অতিক্রম ক'রে কাব্যের আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে উঠতে পারে নি। এরকম রসহীন কবিতাকে আমরা অন্যত্র

'আত্মজীবনবিবৃতি' ব'লে অভিহিত করেছি। কবির শেষজীবনের লেখায় এরকম তত্ত্বময় আত্মকথার বিস্তৃতি ঘটেছে।

'সাবিত্রী' কবিতার রবি-প্রেরণার কল্পনা কবির পৃথিবী-অনুভব সম্পর্কিত একটি রচনাকেও স্পর্শ করেছে এবং নূতন চিত্রকল্পনার মূল্যে কবিতাটিকে কবির একালের অভিনব কাব্যসম্পদে গৌরবান্বিত করেছে। কবিতাটির নাম '**লিপি**'। লক্ষণীয় এই যে, পৃথিবীকে সূর্যদৈবত রূপে কল্পনা করলেও তত্ত্বচিন্তার স্পর্শ থেকে কবিতাটি মুক্ত হয়েছে এবং প্রণয়ী ও বিরহিণী সম্পর্ক যোজনায় চারুতা সমুৎপন্ন করেছে। এ-বিষয়ে বিশেষ সৌন্দর্যের সঞ্চার করেছে বিরহিণীর লিপি-প্রাপ্তি ও লিপি-লিখনের চিত্র। পার্থিব নিসর্গের বৈচিত্র্য কবিকে লিপি-লিখনের চিত্র-কল্পনায় নিয়োজিত করেছে। আর সম্ভবতঃ এই চিত্রের কল্পনাই কবিতাটির নির্মাণের মূলে। বিরহিণী-ভাবনা এবং সূর্যকে নায়করূপে কল্পনা এর পরে আসাই সম্ভব। এর পূর্বেকার পৃথিবী সম্বন্ধে কবিতায় পৃথিবীর উপর মাতা, বধূ, গৃহিণীর স্বভাব কবি আরোপ করেছিলেন। বিরহিণীর স্বভাব আরোপ প্রায় নূতন এবং লিপি-লিখনের চিত্র-অনুভব নূতনতর।* এরই ফলে কবিতাটিতে অ-পূর্বদৃষ্ট বক্রসৌন্দর্যের বর্ণসম্পাত ঘটেছে। পৃথিবীর মধ্যে প্রতি ঋতুতে পরিবর্তমান নব নব সৌন্দর্যের চিহ্ন এবং ঝটিকা, প্লাবন, ভূকম্প প্রভৃতি চিঠি-লেখা ও মুছে-ফেলার একটি ছবি কবির সামনে তুলে ধরেছে—

যুগে যুগে বারংবার লিখে লিখে
বারংবার মুছে ফেলো ; তাই দিকে দিকে
সে ছিন্ন কথার চিহ্ন পুঞ্জ হয়ে থাকে ;
অবশেষে একদিন জলজ্জটা ভীষণ বৈশাখে
উন্মত্ত ধূলির ঘূর্ণিপাকে
সব দাও ফেলে
অবহেলে,
আত্মবিদ্রোহের অসন্তোষে।

প্রাপ্তলিপি বিরহিণী নায়িকার অবস্থা-বর্ণনও কবির কল্পনার রমণীয়তা বর্ধিত করেছে—

*এ-প্রসঙ্গে পূর্ব-উদ্ধৃত ছিন্নপত্রাবলী থেকে আহৃত পত্রের নিম্নলিখিত অংশের মিল দ্রষ্টব্য— "যেন আমাদের এই নবযৌবনা ধরণীসুন্দরীর সঙ্গে কোন্-এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসা-বাসি চলছে তাই এই আলো এবং বাতাস, এই অর্ধ-উদাস অর্ধসুখের ভাব…" ইত্যাদি।

বক্ষে তারে রাখো,
শ্যাম আচ্ছাদনে ঢাকো ;
বাক্যগুলি
পুষ্পদলে রেখে দাও তুলি,—
মধুবিন্দু হয়ে থাকে নিভৃত গোপনে ;
পদ্মের রেণুর মাঝে গন্ধের স্বপনে
বন্দী করো তারে।
তরুণীর প্রেমাবিষ্ট আঁখির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে
রাখো তারে ভরি ;
সিন্ধুর কল্লোলে মিলি, নারিকেল-পল্লবে মর্মরি
সে বাণী ধ্বনিতে থাকে তোমার অন্তরে ;
মধ্যাহ্নে শোনো সে বাণী অরণ্যের নির্জন নির্ঝরে।

নিসর্গের বিভিন্ন বিষয়ের উপর কবির উৎপ্রেক্ষা কিভাবে সামঞ্জস্যে গ্রথিত হয়ে একটি অপূর্ব রমণীয়তার সৃষ্টি করে, এই কবিতাটি তার দৃষ্টান্ত। এই চিত্র অধ্যয়ন ক'রে নিসর্গপ্রীতিরসিক এবং রোম্যান্টিক বিরহভাবুকতার কবি উপসংহারে বসুন্ধরা থেকেই তাঁর কাব্যের প্রেরণা চেয়েছেন। হতে পারে কবির একালের বিরহব্যাকুল চিত্ত এবং সন্ধানতৎপরতার মনোভাব পৃথিবীর ঐ বিরহিণী অবস্থার চিত্র আঁকবার প্রেরণা দিয়েছে এবং নিচের পঙ্‌ক্তিতে সেই কবিস্বভাবেরই ব্যঞ্জনা ফুটেছে—

স্বর্গ হতে মিলনের সুধা
মর্ত্যের বিচ্ছেদ-পাত্রে সংগোপনে রেখেছ, বসুধা,
তারি লাগি নিত্যক্ষুধা
বিরহিণী অয়ি,
মোর সুরে হোক জ্বালাময়ী।

এ কবির চিরন্তন স্বভাবও বটে, তবু লক্ষণীয় এই যে, কবির নিসর্গ-সৌন্দর্যপ্রীতির এবং দূরবাসনার আকাঙ্ক্ষা সম্মিলিত ভাবেই এরকম কবিতার সূত্র নির্মাণ করেছে। আর কাল্পনিক চিত্র নির্মাণে দক্ষ কবি সহজে চিত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

ছন্দোভঙ্গিতে এবং অনুপ্রাসে গীতরীতির স্বল্পতা না থাকলেও নিঃসন্দেহে চিত্রকল্পনার চমৎকারিতা কবিতাটিতে সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করেছে।

'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের প্রথমের দিকে স্থাপিত কবিতাগুচ্ছ ('উজ্জীবন' এবং 'বোধন' ছাড়া) যে 'ফরমায়েশের দীনতা' থেকে মুক্ত নয় তার প্রমাণ এগুলির অর্থগত চিত্রের দৈন্য এবং ছন্দোবিষয়ে কবির অসতর্কতা। বরযাত্রা, অর্ঘ্য, বরণ-ডালা, শুকতারা, মায়া প্রভৃতি কবিতায় আট ও ছ'মাত্রার পর্বের সঙ্গে কখনও পাঁচ, দুই, তিন এর পর্ব বা পর্বাঙ্গ শেষের দিকে মিশ্রিত ক'রে কবি নূতন ধরনের একপ্রকার চারুতাময় চটুলতা আনবার প্রয়াস করেছেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তালফেরতার মত ছন্দের যতিগত চালের সহসা পরিবর্তন শ্রুতিকটু হয়েছে, তাছাড়া পর্ববিন্যাস প্রত্যাশিত সৌষম্যের সীমা অতিক্রম করেছে। 'মাধবী' নাম্নী কবিতাটি অক্ষরমাত্রিক ছন্দে লেখা। এর পর্ব আটমাত্রার; কেবল প্রতি তৃতীয় চরণের শেষে যে পর্বাঙ্গ যোজিত হয়েছে তার অক্ষরসংখ্যা দুই হলেও, প্রথম অক্ষরটি সর্বত্র যৌগিক হওয়ায় মাত্রবৃত্তের মত ঐ অক্ষরটিকে দু'মাত্রার ক'রে পড়ার আগ্রহ জন্মে, যেমন—

মাধবী করিল তার ॥ সজ্জা (তৃতীয় চরণ)
ছুটিল সকল তার ॥ লজ্জা (ষষ্ঠ চরণ)
দিনে দিনে ভরেছিল ॥ অর্ঘ্য (নবম চরণ)
জাগাল মর্মর কল ॥ ছন্দ (পঞ্চদশ চরণ) ইত্যাদি।

'প্রত্যাশা' কবিতাটি ছড়ার ছন্দের অসমচরণগ্রন্থনে লেখা। এর চতুর্থ চরণ 'ক্ষান্তকূজন ॥ শান্তবিজন ॥ সন্ধ্যাবেলা' নিজের দিক থেকে পরিপূর্ণ, কিন্তু চরণ-সামঞ্জস্যের দিক থেকে অপ্রত্যাশিত। 'সন্ধ্যাবেলা' এই পর্বটি দু'মাত্রার (অর্থাৎ শুধু 'বেলা') হলেই সংগত হ'ত। যেমন—

ক্লান্তিবিহীন ফুল ফোটানোর খেলা।
ক্ষান্তকূজন শান্তবিজন (সন্ধ্যা) বেলা

পরবর্তী স্তবকসমূহে অনুরূপ স্থানে ঐ পর্বটি দু'মাত্রার অপূর্ণই রাখা হয়েছে। চারমাত্রার করা হয়নি। যেমন,—

নাচের মাতন ॥ লাগল শিরীষ ॥ ডালে,
স্বর্গপুরের ॥ কোন নূপুরের ॥ তালে!

* * * * *

ডালগুলি তার ॥ রইবে শ্রবণ ॥ পেতে
অলখজনের ॥ চরণ শব্দে ॥ মেতে। ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে অক্ষরমাত্রিকে লিখিত 'দ্বৈত' কবিতায় পঞ্চম চরণে পর্ব-সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হয়েছে—

আমি যেন গোধূলি গগন
ধেয়ানে মগন,
স্তব্ধ হয়ে ধরাপানে চাই ;
কোথা কিছু নাই,
শুধু শূন্য বিরাট প্রান্তর ভূমি।

এখানে 'ভূমি' শব্দে তুই অক্ষরের আধিক্য। 'অর্ঘ্য' কবিতায় ৬+৬+৫ এর মিলবিভাগের স্তবকমধ্যে ৬+৬+২ এর তুটি পঙ্‌ক্তির চাল বিসদৃশ ব'লে প্রতিভাত হয়েছে। 'মায়া' কবিতাতেও তাই ('চিত্তকোণে ছন্দে তব বাণীরূপে') এর চাল হ'ল ছড়ার ছন্দের, চারমাত্রার তিনটি পূর্ণ পর্বের। এর মধ্যবর্তী তুটি ক'রে ভিন্ন চালের পঙ্‌ক্তির গ্রন্থন (চার-চার-তুয়ের মধ্যে চার-তুয়ের মিলন) বিশেষ কোনো ভাববৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে কিনা সন্দেহ। যেমন—

সেথায় নিয়ে ॥ যাব আমার ॥ দীপশিখা,
গাঁথব আলো ॥ আঁধার দিয়ে ॥ মরীচিকা।
মাথা থেকে ॥ খোঁপার মালা ॥ খুলে
পরিয়ে দেব ॥ চুলে—
গন্ধ দিবে ॥ সিন্ধু পারের ॥ কুঞ্জবীথির,
আনবে ছবি ॥ কোন্ বিদেশের ॥ কী বিস্মৃতির। ইত্যাদি

'মুক্তি' কবিতার পাঁচ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পর্বাঙ্গ-বিভাগ হ'ল সাধারণভাবে ৩+২, এর মধ্যে ২+৩ এর তুচারটি পর্ব হয়ত বা কানেই লাগে না। কিন্তু 'গুহাবিহারী'তে এলে কানে একটু খটকা লাগে। তেমনি নিম্নলিখিত অংশের তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে পর্বাঙ্গ-সামঞ্জস্য না পেয়ে তুঃখবোধ করতে হয়—

বুলায় : বুকে ॥ ম্যাগনো : লিয়া ॥
কৌতূ : হলী ॥ মুঠি।
অতি : বিপুল ॥ ব্যাকুল : তায়
নিখিলে : জেগে ॥ উঠি।

মহুয়ার এই প্রথমের দিকের কবিতানিচয়ে কবি যেমন তালের দিক থেকে স্বল্প নূতন পথে পদক্ষেপ করতে চেয়েছেন তেমনি শব্দবিন্যাস ও বাক্যবিন্যসা,

এমন কি চিত্রের দিক থেকেও। এ খুব স্বাভাবিক এবং রবীন্দ্রনাথের চলিষ্ণু মহাশক্তির প্রকাশকও। কারণ, এর পূর্ব পর্যন্ত বিশাল রচনায় এই মহাকবি এত বিচিত্র রীতির অনায়াস মিলবন্ধন করেছেন, সমাসে ও ব্যাসে এত নূতন শব্দ এবং নূতন অর্থের নির্মাণ করেছেন যে বাঙলা ভাষার শব্দার্থ, ধ্বনি ও যতির স্বাভাবিক শক্তির চরম প্রকাশ সেখানেই ঘটে গেছে। স্বভাবাতিরিক্ত অথচ স্বভাব থেকে দূরবর্তী নয়, এমন নূতন শক্তির যোজনায় কাব্যের সঙ্গে প্রকাশ অভিনব হয় কিনা কবির সে-প্রযত্ন স্বাভাবিক। এই মনোভঙ্গির সমর্থন পাওয়া যায় তাঁর নাট্যে নব-নব কলা-সম্মিলনের দৃষ্টান্তে, সংগীতে কথা-সুর-শিল্পের বিচিত্র পরীক্ষণে, কবিতায় গদ্যচ্ছন্দের আরোপে এবং কখনও-লৌকিক কখনও-কৃত্রিম বাগ্‌ভঙ্গির প্রয়োগে ও চিত্রকল্পযোজনায়। 'মহুয়া'য় শুধু ছন্দে নয়, ধ্বনি এবং অর্থগত বিশেষ চিত্রকল্প-নির্মাণে এবং সংকেত-বাক্যে অভিনবতা লক্ষণীয়। 'পূরবী' থেকে এবিষয়ে 'মহুয়ার' ভিন্নত্ব। মহুয়ার 'বোধন' 'পথের বাঁধন' 'পরিচয়' 'সবলা' প্রভৃতি কবিতার আলোচনায় আমরা কবির নব-সংকেত নির্মাণের সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত করছি। উপরি-উল্লিখিত কবিতা ক'টিতে এর আগ্রহ মাত্র লক্ষ্য করা যায়। ঠিক কাব্যসিদ্ধি নয়। 'বর্ম তোমার পল্লবদলে, আগ্নেয়বাণ বনশাখাতলে'—এখানে বসন্তের যোদ্ধবেশ-কল্পনা এই সংক্ষিপ্ত অতিশয়োক্তি নির্মাণের কারণ হয়েছে। 'কানন' পর ছায়া বুলায় ঘনায় ঘনঘটা। গঙ্গা যেন হেসে দুলায় ধূর্জটির জটা' এবং 'আঁখি তোমার তড়িৎবৎ ঘন ঘুমের মোহে'—এখানেও প্রেমের মধ্যে বিজয়ীর কার্য-দর্শন নিসর্গের চিত্রকে প্রভাবিত করেছে। উৎপ্রেক্ষার মধ্যে ধূর্জটির প্রসঙ্গও একালের নটরাজ-কল্পনার সঙ্গে জড়িত। 'সাগরপারের পান্থপাখির ডানার ডাকে' অজানার ইঙ্গিত অনুভবও নূতনতর হয়েছে অনেকটা শব্দগ্রন্থনে। এই ভাবে বসন্ত ও প্রেম সম্পর্কে কবির নূতন অর্থ-অনুভব যে নূতন চিত্ররীতি নিয়ে এসেছে তা আকস্মিক হলেও এসব ক্ষেত্রে অন্তরের স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু এই দৃষ্টিকোণ অতিশয়িত এবং একান্ত হয়ে এমন নিসর্গ-চিত্রও উপস্থাপিত করেছে যা পাঠকের সহানুভব-শক্তির উপর অতিরিক্ত দাবী জানিয়েছে, যেমন—

পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে
চকিত অরণ্যের সুপ্তি কাড়ে।
যেন কোন্ দুর্দম
বিপুল বিহঙ্গম
গগনে মুহুর্মুহু পক্ষ ঝাড়ে। ('বরযাত্রা')

এ হ'ল বসন্তের আগমনের চিত্র! এরই সজাতীয় বর্ণনা হ'ল—'দক্ষিণ বায়ু মর্মরস্বরে বাজায় কাড়া-নাকাড়া' এখানে কবি যে নিগূঢ় সংকেতপথের যাত্রী তা কি পাঠকের পূর্ব-সংস্কারকে গুরুতরভাবে আহত করছে না? কবি এখানে আইডিয়ার বশীভূত, কাব্যচমৎকারের আহ্লাদে উদীপ্ত নন, এমন অভিযোগ নির্মম হলেও কি সত্য নয়? কবিতাগুলিতে কবির 'ঝিল্লিঝনন' 'মৃত্যুদমন' 'রক্তদীপন' প্রভৃতি নব বিশেষণ নির্মাণের আগ্রহ লক্ষণীয়। কিন্তু এরই সঙ্গে ভাষার কৃত্রিমতা এবং আড়ষ্টতার দিকটিও অনুধাবনের বিষয়। 'ইঙ্গিতে সংগীতে নৃত্যের ভঙ্গিতে নিখিল তরঙ্গিত উৎসবে যে'—এই 'যে'—শব্দটি পূর্ববর্তী 'সেজে' এবং 'বেজে'র সঙ্গে মিল রাখতে গিয়ে দুর্বলভাবে গ্রথিত। অনুরূপ 'শুকতারা' কবিতায় অনুপ্রাস ও ছন্দোভঙ্গি মনোরম হলেও 'চন্দ্র' এর সঙ্গে মেলাবার জন্য 'রন্ধ্র' শব্দ অর্থের দিক থেকে সুপ্রযুক্ত নয়।[১] তেমনি অত্যধিক মিল-বানানোর আগ্রহে নির্মিত 'তূর্ণ' এবং 'পূর্ণ' অভিনব কোনও অর্থের বৈচিত্র্য ঘটাচ্ছে না।[২] 'থালিকা' শব্দ নিঃসন্দেহে 'মালিকা'র মিলের আকর্ষণে প্রযুক্ত।[৩] এরই মধ্যে বক্রোক্তিহীন ভাষা এবং কৃত্রিম বক্রোক্তি দু'একটি-স্থানে রবীন্দ্র-বিরোধী হয়েছে, যেমন— 'আজ যেন পায় নয়ন আপন নতুন জাগা' 'পাত্র করি পুরা' 'ঘনিয়ে আছে চেতন-বনের ছায়াতলে' ইত্যাদি।

'মহুয়া'র চিত্রে এবং কল্পনায় অপেক্ষাকৃত উত্তম কবিতাগুলি পরীক্ষা করা যাক।

'নির্ভয়'। কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের—যে ছন্দে ধ্বনিবিলাসিতার অবকাশ যথেষ্ট থাকে। অর্থাৎ সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ধ্বনির পুনরাবৃত্তি দ্বারা একপ্রকার শ্রুতিসুখকর রম্যতার সঞ্চার এই ছন্দে অনায়াসেই করা যায় এবং রবীন্দ্রনাথ সেবিষয়ে চূড়ান্ত কৌশলের পরিচয় পুনঃ পুনঃ দিয়েছেনও। কিন্তু এই কবিতাটিতে যুক্তাক্ষর প্রচুর প্রযুক্ত হলেও বাণীর চরমতার উপাসক কবি সে-সুযোগ নেন নি, নিলে অনর্থই ঘটত। কারণ, আদিরসের উপর বীরের প্রাধান্যে এ-কবিতার অর্থগৌরব প্রতিষ্ঠিত। শব্দের সঙ্গে অর্থের পূর্ণ মিলনেই কবিতাটির আবির্ভাব ঘটেছে। এর প্রথম স্তবকের কয়েক পঙ্‌ক্তিতে

---

১ ধরা যেথা অম্বরে মেশে
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র,
আঁধারের বক্ষের 'পরে
আধেক আলোকরেখারন্ধ্র।

২ সুন্দরী ওগো শুকতারা
রাত্রি না যেতে এসো তূর্ণ

৩ ছিল ভরি মোর থালিকা
ছিঁড়িব কি সেই মালিকা।

প্রেমের বিলাস বর্ণন কাব্য-প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত—'পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে, বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে' অথবা 'স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে।' অথচ এ দুটি বর্ণনায় চিরাচরিত প্রণয়ের যাবতীয় বিলাস ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তির প্রতি পর্বে একটি অকোমল ও অসম যুক্তাক্ষর দুর্বলতার প্রতি তীব্র ঘৃণা সার্থকভাবে উদ্দীপিত করেছে। 'তুমি আছ, আমি আছি'—এই উক্তিতে নব অর্থে প্রেমের গৌরব ব্যক্ত হয়েছে। প্রথম স্তবকে যে শৃঙ্গাররসের বীরত্বমহিমা আভাসে বিবৃত হয়েছে মাত্র, দ্বিতীয় স্তবকে তা-ই প্রবল ভাবাবেগের সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে। এই অংশের নির্মাণ কবির অনুরূপ বীররসোদ্দীপক বহু উত্তম রচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্য বহু স্থানের মত এখানেও তরণীতে জীবনসংশয় নদী অতিক্রম করার চিত্র যোজিত হয়েছে। কবিতাটিতে উল্লেখযোগ্য এই একটি চিত্র গ্রথিত হয়েছে। এর ভাবসৌন্দর্য রক্ষিত হয়েছে ভিন্নরীতিতে, ঋজু বাচ্যার্থ-নির্মাণে, অর্থের নবত্বে এবং কয়েকটি মাত্র সাংকেতিক শব্দে, যেমন, বাসররাত্রি. মরুপথতাপ, মরীচিকা। ঐ দ্বিতীয় স্তবকের—

> পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি
> ছিন্ন পালের কাছি,
> মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
> তুমি আছ, আমি আছি।

এই পঙ্‌ক্তিতেই যদ্যপি গীতিকাব্যিক অনুভূতির চরমতা মূর্ত হয়েছে এবং 'দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ' প্রভৃতি তৃতীয় স্তবক এইপ্রকার সমাপ্তের বর্ণহীন পুনর্গ্রহণ ব'লে প্রতিভাত হয়েছে, তবু সৌন্দর্য ব্যাঘাত ঘটিয়েছে কিনা সন্দেহ, কারণ, মাত্র দুটি স্তবকে নবার্থ বৈচিত্র্য পরিস্ফুট হতে পারত না, তা ছাড়া 'তুমি আছ আমি আছি' এই ধ্রুবপদে আবৃত্ত প্রেমের বিজয় ঘোষণাও অসম্পূর্ণ হ'ত।

'পথের বাঁধন' কবিতাটিও সদৃশভাবে তিন স্তবকে সম্পূর্ণ, ছন্দও মাত্রাবৃত্তের। কিন্তু এর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল মৌখিক শব্দের এবং বাক্‌রীতির সঙ্গে ঐ কলাবিলাসময় ছন্দের মিলবন্ধন। গতিশীলতা বা পথে-চলার অর্থগত বৈচিত্র্যের মধ্যে মৌখিক ভাষারূপ সংগতিও রক্ষা করেছে যথেষ্ট। অর্থ এবং শব্দে মিলে এই কবিতাটি আধুনিক কালের একটি প্রতিনিধি-স্থানীয় কবিতাও

হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই গতিশীল কবিস্বভাব তাঁকে আধুনিক কবিসম্প্রদায়ের পুরোবর্তী করেছে। অথচ লক্ষণীয় এই যে, নব ভাবুকতার জন্য কবিকে বাঙ্‌লা ভাষার ঐতিহ্য অতিক্রম করতে হয় নি। ঠিক এই গুণের অভাবে সাম্প্রতিক কবিগোষ্ঠীর অনেকেই, কবিস্বভাবের দিক থেকে নিতান্ত দীন না হলেও, জনমানসে স্বীকৃতি লাভ করেন নি। বাণীরূপেই যখন কাব্যের প্রকাশ-রূপ তখন এর মধ্যে বিপ্লব-সংঘটন-প্রয়াস কবির আত্মহত্যারই নামান্তর হয়ে থাকে। 'মহুয়া'র এই ক'টি কবিতার প্রণয়-কল্পনা রবীন্দ্রের পূর্ববর্তী কল্পনাকে অতিক্রম করেছে। বিশেষে 'পথের বাঁধন' কবিতাটি চলতি হাওয়ার গতিবেগে একমাত্র অনুপ্রাস-মাধুর্য ছাড়া আর কোনও সম্বলই রাখে নি।

এই হ'ল যথার্থ আধুনিক কবিতা। গদ্যবাহনা না হয়েও জীবনবেগে চলিষ্ণু, সঞ্চয় ও বিলাসের প্রতি নিষ্ঠুর, মৌখিক ভাষার সমন্বয়ে বাস্তব এবং নূতন জীবনের প্রতি আগ্রহশীল পাঠকের চিত্তের উত্তেজক রসায়ন। কবিতাটিতে আবেগ আছে, কিন্তু উচ্ছ্বাস নেই। তিনটি স্তবকের মধ্যেই চলমান গণজীবনের মূল সুরটি কবি সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন। আর এর সঙ্গে দাম্পত্য মাধুর্য মিশ্রিত ক'রে কবিতাটিকে রমণীয় প্রকাশ করেও তুলেছেন। এই রম্যতাটুকুর জন্যই নবার্থদীপ্ত অবয়বে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ধ্বনির চারুতার প্রয়োজন হয়েছে। সদৃশ-বিষয়-নির্ভর এবং সমার্থবাহী 'বলাকা'র কবিতার সঙ্গে তুলনা করলেই এর কাব্য-রহস্য ধরা পড়বে। দেখা যায়, অভাবনীয়ের আবির্ভাব এবং রমণীয়তার চকিত স্পর্শের বিষয় এর পূর্বে উৎসর্গ-খেয়া-গীতাঞ্জলির শরৎ অথবা বর্ষার কবিতায় বারংবার বর্ণিত হলেও এবং দিগবধূ, আলোর ঝলক, অরুণকিরণ, পাখির পুচ্ছদোলন প্রভৃতি কবির পূর্ব থেকেই প্রিয় চিত্র-উপাদান হলেও শুধু ভিন্নভাবে সন্নিবেশিত হওয়ার জন্যই নূতন চমৎকৃতির বাহক হয়েছে। বস্তুতঃ রঙীন নিমেষের সঙ্গে 'ধূলার দুলাল' এবং 'আবীর গুলাল' ছড়ানোর সংযোগ, দিগঙ্গনার সঙ্গে নৃত্য এবং ওড়না উড়ানোর মিশ্রিত চিত্র, এবং 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' 'ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়' প্রভৃতি ভাষাবিন্যাসই এখানে নূতনতর সংকেতের কারণ হয়েছে। ঠিক এই জন্যই রডোডেনড্রন গুচ্ছের অবতারণারও প্রয়োজন হয়েছে। 'মহুয়া' কাব্যের অন্যত্র ব্যবহৃত 'উন্মীলিত গুল্‌মোরের থোলো' 'বুলায় বুকে ম্যাগ্‌নোলিয়া কৌতূহলী মুঠি' প্রভৃতি বিদেশী ফুলের অলংকরণ লক্ষণীয়।

মহুয়ার উল্লিখিত কবিতা দুটিতে চলার সুর খুব স্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়েছে।

অন্যান্য কবিতায় বাসনাবিমুক্ত নবীন প্রেমের বিচিত্র ভাবমুহূর্ত, স্বভাবে বিচিত্র নারীর চিত্র প্রভৃতি প্রকাশ পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে এরকম কয়েকটি মাত্র কবিতা আলোচিত হচ্ছে।

'পরিচয়'। প্রেমিক প্রেমিকাকে বর্ষার কদম্ব উপহার দিচ্ছেন, আর প্রেমিকা দিচ্ছেন কেতকী। এর মধ্য দিয়ে কবি প্রণয়ের নব মহিমা ব্যঞ্জিত করেছেন। প্রণয় যে কেবল মোহমিশ্রিত বিলাসস্বপ্ন নয়, প্রণয়ী-যুগলের পরস্পরকে যথার্থভাবে লাভ করতে হ'লে যে সাহস, ত্যাগ ও পথের তপ্ত রৌদ্রকে বরণ করতে হয় এই ধ্বনিত অর্থের রমণীয়তা কবিতাটির অলংকৃত নব পরিচয়ের ইঙ্গিত বহন করেছে। নিসর্গ-পরিবেশের মধ্যেও দুঃসহ রূঢ় জীবনের সম্ভাব্যতা স্পন্দিত হয়েছে—

তখন বর্ষণহীন অপরাহ্ণ মেঘে
শঙ্কা ছিল জেগে ;
...শূন্যে যেন মেঘচ্ছিন্ন রৌদ্ররাগে পিঙ্গল জটায়
দুর্বাসা হানিছে ক্রোধ রক্তচক্ষু-কটাক্ষচ্ছটায়।

এই দুর্যোগের অবসরে প্রেমিক উপহার পাঠাবেন সেই ফুল যা নৈরাশ্য মানে না, রৌদ্রালোকিত দিবসের স্বপ্নচ্ছবি যার মধ্যে সঞ্চিত, আর তীব্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যা নির্ভীকচিত্তে বিপন্নকে আশ্বাস দিতে পারে—

কাঁদে বন শ্রাবণের রাতে
প্লাবনের ঘাতে,
তখনো নির্ভীক নীপ গন্ধ দিল পাখির কুলায়ে,—

এই হ'ল কবির অভিনব কল্পনায় চিত্রিত কদম্ব। এই কদম্বের সাহস, ধৈর্য এবং আত্মসেবা প্রেয়সীর কাছে প্রেমিকের প্রত্যাশিত। প্রেয়সী কী প্রত্যাশা করছেন তা কেতকীর কণ্টকাঘাতে সংকেতিত হয়েছে। রূপমোহ, এমন কি রসাবেশও কণ্টকের নিষেধে নিরুদ্ধ হয়েছে এবং প্রেমিক একেই প্রেমের যথার্থ সম্মান ব'লে গ্রহণ করছেন। এর প্রাকৃতিক অবসর রচনায় প্রেমিকের বিরহী হৃদয়ের ও সাধনার পরিচয় ফুটেছে—

সারি-দেওয়া সুপারির আন্দোলিত সঘন সবুজে
জোনাকি ফিরিতেছিল অবিশ্রান্ত কারে খুঁজে খুঁজে।

'গন্ধঘন প্রদোষের অন্ধকারে' বর্ণনায় মোহের ক্ষণিক অন্ধতা ব্যক্ত হয়েছে। উপরে উদ্ধৃত 'শূন্যে যেন মেঘাচ্ছন্ন' প্রভৃতির উৎপ্রেক্ষাগত নবকল্পচিত্র স্বকীয়তা

রক্ষা করেও কবিতাটির ব্যঞ্জিতার্থের মধ্যে লীন হয়ে পড়েছে। এইভাবে 'পরিচয়' কবিতাটির সর্বত্র সংকেতমূলক অভিনব কল্পনারীতি প্রকাশ লাভ করেছে।

'মহুয়া'র আর যে-একটি কবিতায় প্রণয়ের রুদ্রতা ফুটেছে তা হ'ল **'সবলা'**। এ কবিতাটিতে যেমন প্রচলিত প্রেমের দৈবাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তেমনি দুঃখ-দুর্যোগকে বরণ করার আগ্রহও পরিস্ফুট। কিন্তু একটি আশ্চর্য নির্মাণস্থল ছাড়া কবিতাটি সর্বত্র বাচ্যার্থেরই অধীন হয়েছে। এই নির্মাণটি হ'ল এই অদ্ভুত নবীন প্রণয়ের উপযোগী পরিবেশ-চিত্রের—

দেখা হবে ক্ষুব্ধসিন্ধুতীরে ;
তরঙ্গগর্জনোচ্ছ্বাস মিলনের বিজয়ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে।
…সমুদ্র-পাখির পক্ষে সেই ক্ষণে উঠিবে হুংকার
পশ্চিম পবন হানি
সপ্তর্ষি-আলোকে যবে যাবে তারা পন্থা অনুমানি।

নিঃসন্দেহে 'ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীর' প্রভৃতি বিঘ্নসংকুল আধুনিক জীবনের ব্যঞ্জক হয়েছে। সমুদ্র-পাখির উল্লেখ 'মহুয়া'র কয়েক স্থানেই পাওয়া যাচ্ছে, এবং এর সঙ্গে পূর্ব-উল্লিখিত বিদেশী ফুলেরও। কিন্তু এখানে সপ্তর্ষি-আলোকে পাখিদের যাত্রার বর্ণনে একটু যেন অত্যর্থকতা এসে পড়েছে, বিশেষতঃ সপ্তর্ষির সঙ্গে বিবাহ-মাঙ্গল্যের একটা সংস্কার আমাদের চিত্তে আছেই। এ যাত্রা মানব-দম্পতির হলে কোনও কথাই ছিল না। তবু তুলিকার একটানে আঁকা এই চিত্রটি সমগ্রভাবে কবির প্রৌঢ়বাণী নির্মাণের অদ্ভুত পরিচয় দিচ্ছে।

প্রেমভাবুকতার অভিনব বৈশিষ্ট্য নিয়ে লেখা তিন-চারটি কবিতা উল্লেখ্য। একটি 'দায়মোচন' একটি 'প্রতীক্ষা' একটি 'মুক্তরূপ' অন্যটি 'বিদায়'। এর মধ্যে প্রথম দুটি মাত্র বাচ্যার্থ-মনোহর। শেষেরটি 'শেষের কবিতা' থেকে গৃহীত এবং কাব্য-ঐশ্বর্যে মূল্যবান। **'দায়মোচন'** কবিতায় প্রেমকে নিরলংকার সহজভাবে দেখা হয়েছে। এতে কয়েকস্থানেই মহুয়া-পূর্ব প্রেমকবিতার বিরুদ্ধ ভাবনা তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন—

যাবার সময় হলে যেয়ো সহজেই,
আবার আসিতে হয় এসো।

…আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নহি
ভুলিতে ভুলিতে যাবে হে চির-বিরহী
…মার্জনা করো যদি তবে পাব বল,
করুণা করিলে নাহি ঘোচে আঁখিজল।

কবিতাটি বাচ্যার্থময় হলেও আকস্মিকতার জন্য চমৎকৃতিজনক হয়েছে। **'প্রতীক্ষা'** কবিতাটি বাস্তব-জীবন-সংস্পর্শে অধিকতর রমণীয় হয়েছে। এর মধ্যে আমাদের আধুনিক সমাজব্যবস্থায় নিগৃহীত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ প্রেয়সীর কাছ থেকে বীরত্বের প্রেরণা চাইছে। কবি কয়েক পঙ্‌ক্তিতে আমাদের জাতীয় চরিত্রের গ্লানির দিক সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করেছেন—

যাচে দেশ মোহের দীক্ষারে,
কাঁদে দিক বিদিব ধিক্কারে,
ভাগ্যের ভিক্ষুক চাহে কুটিল সিদ্ধির আশীর্বাদ,
ধূলিতে খুঁটিয়া-তোলা বহুজন-উচ্ছিষ্ট প্রসাদ।
…অশক্তি মজ্জায় রক্তে, শক্তি বলি জানি ছলনাকে,
মর্মগত খর্বতায় সবকালে খর্ব করি রাখে। ইত্যাদি

অন্যত্র কবি আদর্শ-অনুরাগের দ্বারা এই জঘন্য বাস্তব পরিবেশকে অতিক্রম করতে বলেছেন, এখানে প্রেয়সীর সুমহৎ প্রেমের কল্যাণে, এই পার্থক্য।

'বিদায়' কবিতাটিতে মিশ্রকরুণের অপূর্ব সংগীত ধ্বনিত হয়েছে। অসহ প্রণয়-বিচ্ছেদকে গতিশীল কালপ্রবাহের মধ্যে স্থাপিত ক'রে দেখায় এ বিচ্ছেদের বৈচিত্র্য ফুটেছে, অথচ 'শাজাহান' কবিতার মত প্রেমকে শুধু বিলাস-মরীচিকা রূপে দেখা হয় নি। 'বলাকা'য় তীব্র বৈরাগ্যের মধ্যে পার্থিব যাবতীয় আকর্ষণের তুচ্ছতা (কয়েকটি কবিতায়) ঘোষিত হয়েছে। মনুষ্যময় পৃথিবী অস্বীকৃত হয় নি ব'লে গতিশীল জীবনের মধ্যে পরিবর্তিত রূপে প্রণয়ের সার্থকতা প্রতিপাদিত হয়েছে। 'বিদায়' কবিতায় প্রেমের বৈরাগ্য এবং প্রেমের নিগূঢ় সার্থকতাকে বিচ্ছেদের মধ্যেই পরিস্ফুট ক'রে তোলা হয়েছে। ভূমিকার পঙ্‌ক্তিগুলিতে পরিবর্তনশীলতার মধ্যে জীবনের নবরূপবৈচিত্র্যকে দেখা হয়েছে। ফলে ফেলে-আসা-জীবনের জন্য সকরুণ দৃষ্টিক্ষেপ এবং নব জীবনের জন্য ঔৎসুক্য একই আধারে আধুনিক মনস্তত্ত্বের উপযোগী জটিল 'ভাবশবলতা'র সৃষ্টি করেছে। নিম্নলিখিত বর্ণনায় এই মিশ্র মনোভঙ্গির আভাস দেওয়া হয়েছে—

রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।

সে-নাম নিশ্চয়ই মুহূর্তের শোক এবং মোহ নিয়ে আসে, আবার স্বীয় চঞ্চলতায় মুহূর্তে তা অপসারিতও করে, কারণ, 'তারি নিমন্ত্রণ লোকে লোকে, নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।' লক্ষণীয় এই যে, মহুয়া-পরবর্তী কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যেখানে আত্মপরিচয় দিয়েছেন সেখানে তাঁর মনের দুই প্রবৃত্তির বর্ণনা দিয়েছেন, ফেলে-আসা পুরাতন জীবনের উপর মায়িক দৃষ্টিক্ষেপ এবং নূতন জীবনকে বরণ করার আগ্রহ। প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তবকে কালের প্রবাহের মধ্যে জীবনকে গতিশীল ক'রে দেখা হয়েছে। তৃতীয় স্তবকে বিরহের মধ্যে প্রাপ্তির সার্থকতা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রাপ্তি স্বপ্নের আকারে মুক্তির সত্যের উপলব্ধি। প্রয়োজন-সীমার অতিরিক্ত প্রেম এই মুক্তির বাহক। 'মহুয়া' কাব্যে এই প্রেমকেই রডোডেনড্রন গুচ্ছের মত ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে। বলাকায় 'শাজাহান' কবিতায় একেই মর্ত্য-বাসনার মধ্যে আবদ্ধ রূপে কল্পনা করা হয়েছে। গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্যই এই, দৃষ্টিকোণের পার্থক্য কবিতার ভাব ও সৌন্দর্য নিয়ন্ত্রিত করে। পরিবর্তনের স্রোতে মানুষ চলছে, এবং অপরিবর্তন অর্ঘ্য তাকে প্রেরণা দিচ্ছে—এ ভাবটি অবশ্য বলাকার 'উপহার' কবিতায় রয়েছে। যাই হোক—

সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে—

এই 'সবচেয়ে সত্য' 'মৃত্যুঞ্জয়' 'অপরিবর্তন অর্ঘ্য' প্রভৃতি গুণবাচক শব্দে নির্দেশিত হওয়ায় প্রেমের রমণীয় বৈচিত্র্য এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। প্রেমের অতিরিক্ত কোনও সত্যবস্তুর আভাস দেওয়া হচ্ছে না ব'লে কবিতাও তত্ত্বে গিয়ে পৌঁছাচ্চে না। 'হে বন্ধু বিদায়' এই ধুয়ার মধ্যে বিচ্ছেদের অনিবার্যতা এবং করুণরস-সংযোগ রক্ষা করা হয়েছে। পরবর্তী স্তবক বিচ্ছিন্ন প্রেমিকের প্রতি প্রেমিকার সান্ত্বনা-বাক্য। পূর্ব স্তবকে যদি প্রেমিকার দানের কথা বিবৃত হয়েছে, এ স্তবকে প্রেমিকের গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে প্রাপ্তির চেয়ে নিজ কল্পনায় নোতুন ক'রে সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের সার্থকতা ও সত্যতা প্রেমিকা ঘোষণা করেছেন, প্রাত্যহিক অনুসৃত দেহী প্রেমের দৈন্যও

বিবৃত করেছেন। কিন্তু সংসার-মধ্যবর্তী প্রেমের ভিন্নতর গৌরবের বিষয় প্রতিষ্ঠিত ক'রেই প্রেমিকার বক্তব্য শেষ হয়েছে।

কবিতাটিকে উপন্যাসের ঘটনাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে অনুভব করতে গেলে দ্বিপাক্ষিক প্রণয়ের অর্থসংগতি কিছুটা অস্পষ্ট থেকে যায়। একই আধারে দুই রীতির প্রণয়ের অস্তিত্বও বহুল পরিমাণে কাল্পনিক হয়ে পড়ে। কিন্তু 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের অবয়বে কাব্য, আর কবিতায় কাল্পনিকতার সীমানির্দেশও করা যায় না। প্রেমের এই দ্বৈতপ্রকাশকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুভব করলে অবশ্য কোনও বিঘ্ন থাকে না এবং এর মধ্যে দ্বিতীয়টিই অর্থাৎ যা কর্মে এবং আত্মদানে প্রেমিকাকে নিয়োজিত করে, দুঃখময় দুর্গম পথের যা সঙ্গী তা-ই বিশেষভাবে মনুষ্যত্বের নব বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে। কবিতাটির কাব্যগুণ নির্ভর করছে প্রথমতঃ গতিশীল কালের মধ্যে জীবন ও প্রণয়ের বৈচিত্র্য পরীক্ষা ক'রে দেখায়, তার পর প্রেমের অবিস্মরণীয় স্বভাবের বর্ণনায়—

> বিস্মৃত প্রদোষে
> হয়তো সে দিবে জ্যোতি,
> হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মূরতি।

এই স্বপ্নকেই কবি চরম সত্য ব'লে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ভাববৈচিত্র্যের প্রতি আকর্ষণও এনেছেন। নিঃসন্দেহে কবির নূতন অর্থযোজনা রমণীয় বাণীর স্পর্শেই সার্থক হয়েছে। কারণ, দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত প্রেমকে "যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে"—আবার, ঐ প্রাত্যহিক জীবনের অতিপরিচয়ের বর্ণহীনতাযুক্ত প্রেমকে—

> শুক্ল পক্ষ হতে আনি
> রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
> যে পারে সাজাতে
> অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ রাতে

প্রভৃতি বর্ণনাই যুক্তি-নিরপেক্ষভাবে কাব্যপদবীতে চালিয়ে নিয়ে গেছে। এসব বর্ণনায় অলংকার-নির্ভর ব্যঞ্জনাধর্ম লক্ষণীয়। এ ছাড়া, নিম্নলিখিত অংশের মত বিরোধের আশ্রয়ে গঠিত বাচ্যার্থের অপূর্বতাও কবিতাটিকে কাব্যধর্মে শাণিত ও সমুজ্জ্বল ক'রে তুলেছে—

> তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান ;
> গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।

'সাগরিকা' একটি ঐতিহ্যগত বিষয়কে অবলম্বন ক'রে শুদ্ধ সৌন্দর্যসৃষ্টির অর্থাৎ Art for Art's Sake এর সমুন্নত এবং চরমতম নিদর্শন। পূর্বদ্বীপ-পুঞ্জের সঙ্গে ভারতের মিলনের ব্যাপারটি ঐতিহাসিক এবং কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে খুবই মূল্যবান্। কিন্তু এটি 'সাগরিকা' কবিতার পাঠকের অতিরিক্ত প্রাপ্তি। অর্থাৎ বলা যায় 'সাগরিকা' বিষয়গৌরবে উচ্চশ্রেণীর হ'লেও শিল্প-গৌরবে অসামান্য এবং বর্ণনার বক্রতাই এর কাব্যমূল্যের নির্ণায়ক। এটি রূপক কবিতা নয়, কারণ এর প্রতি বাক্যার্থে রূপক প্রতীত হচ্ছে না, যদিও সমগ্রভাবে নায়ক-নায়িকার প্রণয়ের বিবিধ ভঙ্গি আরোপিত হয়েছে। এর শব্দার্থ নির্মাণে রূপকের আনুগত্য ত্যাগ ক'রে অতিশয়িত সৌন্দর্য সম্পাতেই কবি মনোযোগ দিয়েছেন। এরই ফলে মিলন-বিরহের বিচিত্র বিলাস সমস্ত কবিতাটিকে প্রসিদ্ধ আদিরসের সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে। তবু সৌন্দর্য-সর্বস্বতায় কবিতাটি হয়ত নিঃশেষ হয়ে পড়ছে না, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে ভারতের সম্পদ্ বিনিময়ের ইতিবৃত্তগত একটি ভাবের স্বাদ গৌণভাবে চিত্তে সংলগ্ন হয়ে থাকছে। এই ভাবও রমণীয়, কারণ তার বিষয় প্রাচীনের এবং যা প্রাচীনের তা যে বহুল পরিমাণে কাল্পনিকতায় মধুর তাতে সন্দেহ কি। ফলে, রূপ এবং ভাব দুদিক থেকেই শুদ্ধ রমণীয়তা কবিতাটির সারবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কবিতাটির চমকপ্রদ প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হ'ল এর বাগ্-বিন্যাসে প্রচুর ধ্বনিগত সৌন্দর্যের সমাবেশ এবং শব্দে যথাসম্ভব কোমলাক্ষর ব্যবহার। এমনকি শব্দমধ্যবর্তী যৌগিক অক্ষরের প্রয়োগ বা তৎসম শব্দের যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ এর দশ-বারোটি শব্দে মাত্র সীমাবদ্ধ। তাও সর্বত্র অনুপ্রাস-সৌন্দর্যের সঙ্গে সেগুলি মিলে গেছে, একমাত্র বোধ হয়, প্রথম স্তবকের 'বক্ষে' শব্দটি ছাড়া। এরকম অসামান্য শব্দশিল্প মোটামুটি বড কবিতায় অন্য কোথাও দেখা যায় না। আর এই ধরনের একটানা কোমলধ্বনিসম্পাত 'গীতগোবিন্দ' ছাড়া অন্য কোথাও দুর্লভ। হিসেবে দেখা যায়, র, ল, ন, ম, ত এবং দ-ধ ব্যঞ্জনের পুনঃপুনঃ প্রয়োগেই এর মাধুর্যের ব্যাপ্তি ঘটেছে। এক সময় 'কল্পনা'র কয়েকটি কবিতা রচনার কালে কবি অনুপ্রাস-সৌন্দর্য নিয়ে সজ্ঞানে পরীক্ষা করেছিলেন, ফলে এ বিষয়ে অতিরেকও ঘটেছিল পদে পদে। কিন্তু পরমুহূর্তেই অচেতন শিল্পীসত্তার গোপনকক্ষে তাঁর বহিঃপ্রযত্ন সমাহিত হয়ে অপরূপ হয়েই দেখা দিয়েছে, অনল্প অথচ অনধিক লাবণ্যে তদ্ভব বাঙ্লার

ভাষাদেহ উদ্ভাসিত হয়েছে। এরই পরিণত বিলাস যেমন 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গ' কাব্যের অন্তর্গত নিম্নলিখিতরূপ পঙ্‌ক্তির শুদ্ধ সৌন্দর্যের বাহক হয়েছে—

নৃত্যের বশে সুন্দর হ'ল
বিদ্রোহী পরমাণু;
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্রভানু।

তেমনি 'সাগরিকা' কবিতায় প্রণয়ের রোম্যাণ্টিক স্বপ্নলোক উদ্‌ঘাটিত করেছে—

মধুর হল বিধুর হল মাধবী নিশীথিনী,
আমার তালে তোমার নাচে মিলিল রিনিঝিনি।
পূর্ণ-চাঁদ হাসে আকাশ-কোলে,
আলোক-ছায়া শিব-শিবানী সাগরজলে দোলে।

উদ্ধৃত অংশের শেষ চরণটির অপরূপতা যে-কোনও কল্পরূপবিলাসীর স্মরণীয় সম্পদ্‌।

'সাগরিকা' যে কবির অতীতচারী রোম্যান্‌টিক কল্পলোকেরই বস্তু তা এর রূপনির্মাণ পুনঃপুনঃ প্রমাণ করছে। প্রথম স্তবকে উপলময় উপকূল সমাসীন সন্তস্নাত নগ্ন সৌন্দর্যের বর্ণনা এবং মকরচূড় মুকুট ও ধনুর্বাণ সহ বিদেশী রাজপুত্রের বর্ণনা এবং দ্বিতীয় স্তবকে নটরাজ-পূজা প্রভৃতি নিঃসংশয়ে অপরিচিত প্রাচীনের মায়ায় আমাদেব আকৃষ্ট করেছে। পরের স্তবকের—

কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতী-মালা মাথে,
কাঁকন দুটি ছিল দুখানি হাতে

প্রভৃতি রূপবর্ণনায় 'ওরিএণ্টাল' সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। দ্বীপপুঞ্জের প্রত্যক্ষ রূপ এবং ভারতের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের ইতিবৃত্ত এইভাবে নিতান্ত গৌণ হয়ে পড়েছে এবং তার স্থানে রূপকথার কল্পকক্ষ তার ইন্দ্রজাল নিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করেছে। কবির বক্র কল্পনা এবং অনুগামী শব্দার্থরচনাই এই সৌন্দর্য-সম্পদের কারণ হয়েছে।

এই কবিতাটি যেমন মহুয়ার জীবনবেগ-তত্ত্বকে বহন করছে না, তেমনি করছে না আরও কয়েকটি উত্তম কবিতা যেগুলি কবির প্রেমবোধের পূর্ব-পরিচয়ই অনুসরণ করেছে। যেমন **'বাপী'** কবিতা—

একদা বিজন যুগল তরুর মূলে
তৃষ্ণার জল তুমি দিয়েছিলে তুলে।

আর কোনোখানে ছায়া নাহি দেখি,
শুধালেম, কাছে বসিতে দিবে কি।
সেদিন তোমার ঘরে ফিরিবার বেলা
বহে গেল বুঝি, কাজে হয়ে গেল হেলা।

এই ক্ষণমিলনের পটভূমিতে কবি যেমন পল্লীর বাস্তব নিসর্গকে স্থান দিয়েছেন, তেমনি অতীতসঞ্চারী কাল্পনিকতাকেও ('চিত্রা' কাব্যের অন্তর্গত 'দিনশেষে' তুলনীয়)—

লুপ্তকালের শুষ্কসাগর ধারে
বহু বিস্মৃতি যেথা রয় স্তূপাকারে,
অতি পুরাতন কাহিনী যেথায়
রুদ্ধ কণ্ঠে শূন্যে তাকায়,
হারানো ভাষার নিশার স্বপ্নছায়ে
হেরিনু তোমায়, আসিনু ক্লান্ত পায়ে।

অথবা, বলা যেতে পারে, বাস্তব নিসর্গচিত্রের সঙ্গে অতীতের ধূসর বিস্মৃতিময় রোম্যান্টিক কল্পনা পাশাপাশি বিন্যাস করা হয়েছে। কবিতাটিতে যেহেতু করুণ বিচ্ছেদ কল্পিত হয়েছে সেইহেতু এরকম অতীত-সঞ্চারিতা সংগত হতেও পারে। তবু প্রত্যক্ষতা এবং অপ্রত্যক্ষতার মিশ্রণে কবিতাটি যে দোষস্পৃষ্ট হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া বিস্তৃত পরিবেশ বর্ণনায় কবিতাটি প্রারম্ভের উপাত্ত প্রণয়ভাবুকতা থেকে বিক্ষিপ্তও হয়ে পড়েছে। ঐ ক্ষণমিলনের তথ্যটুকু মাত্র বর্ণনীয় হ'লে, নিম্নলিখিতরূপ গভীর বিষাদ বর্ণিত না হ'লে কবিতাটিকে ক্ষণিকার প্রেমকবিতার ('বিরহ', 'ক্ষণেক দেখা' দ্রষ্টব্য) সঙ্গে সমীকৃত ক'রে দেখা যেত—

দিন শেষ হ'ল চলে যেতে হ'ল একা,
বলিনু তোমারে, আরবার হবে দেখা।
শুনে হেসেছিলে হাসিখানি ম্লান,
তরুণ হৃদয়ে যেন তুমি জান
অসীমের বুকে অনাদি বিষাদখানি
আছে সারাখন মুখে আবরণ টানি।

বস্তুতঃ ক্ষণিকা-কল্পনার কালের গভীরতর-জীবন-সংকেতহীন কবিতার আবির্ভাব কবিস্বভাবে যদি কদাচিৎ ঘটেই থাকে, হয় তার মূলে কোনও বিশিষ্ট

নূতন ভাবার্থের প্রেরণা কাজ করেছে (যেমন 'সাগরিকা'), নয়, পূর্বেকার স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তি থেকে তা বঞ্চিত হয়েছে। 'বলাকা'র কালের সহজ পৃথিবী-প্রীতি বা জীবনানুরাগের কবিতাগুলি পূর্বেকার থেকে কি বর্ণহীন হয় নি ?

এদিক থেকে **'নববধূ'** বরং সকরুণ জীবনচিত্র উদ্ঘাটনে অপেক্ষাকৃত রমণীয় হয়েছে। প্রারম্ভে অজানা পথের যাত্রী হিসাবে বধূর সকরুণ আশা, বিমূঢ় শঙ্কা এবং নীড়ত্যাগের বেদনা প্রভৃতি মিশ্র মনোভাবের পরিচয় গ্রথিত ক'রে আমাদের বহুপরিচিত ছবিকেই বর্ণনাসংকেতে তুলে ধরা হয়েছে। পরিশেষে বধূজীবনের সুখদুঃখময় কর্মের সংসার নির্বাহের, জীবনারম্ভ থেকে জীবনাবসানের একটি সমগ্রতা একনিমেষে উদ্দীপ্ত করা হয়েছে। কবিতাটি তাই করুণরস-প্রধান হয়েছে। যাত্রার দৃশ্যে তরণী, নদী, গ্রাম, ঘাট এবং দিনান্তের চিত্র গ্রথিত হয়েছে এবং শব্দ ও বাক্যের মিলনে নববধূ একটি চিরপ্রবাহিত আসা-যাওয়ার করুণ জীবনস্রোতের মধ্যে চিরন্তন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে—

চলেছে উজান ঠেলি তরণী তোমার,
দিক-প্রান্তে নামে অন্ধকার।
কোন্ গ্রামে যাবে তুমি কোন্ ঘাটে হে বধূবেশিনী,
ওগো বিদেশিনী।
···এই ঘাটে কত বধূ কত শত বর্ষ বর্ষ ধরি
ভিড়ায়েছে ভাগ্যভীক তরী।

'মহুয়া' কাব্যের প্রথমে স্থাপিত **'বোধন'** নামে বসন্তের কবিতাটি 'কল্পনা'-কাব্যের 'বসন্ত', 'চিত্রা' কাব্যের ১৪০০ সাল, বিজয়িনী প্রভৃতি কবিতার সঙ্গে বৈপরীত্যে তুলনীয়। আবার নটরাজের 'বসন্তে'র সঙ্গে ভাব-প্রেরণা-নির্ভরতার দিক থেকে সাদৃশ্যে স্মরণীয়। নটরাজের বসন্তে ('হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যানভরা ধন') এখানকার মত বিদ্রোহী-নবীনের সংকেত নেই, দুর্লভ-সুন্দরের সংকেত আছে এই পার্থক্য। একালের ঋতু-পর্যায়ের বহু কবিতা ও গান ঐভাবে নূতন সংকেতে রমণীয় হয়েছে। পূর্বেকার নিসর্গের মধ্যে যে সহজ আবেশ, মায়া ও মোহের যোগ ছিল তা পরিত্যক্ত হয়েছে। কখনও আসক্তিহীন সূক্ষ্মতর কাব্যসৌন্দর্য কবির কাম্য হয়েছে, কখনও বা গূঢ় জীবন-সংকেত অভিপ্রেত হয়েছে।

'বোধন' কবিতা ঋতুরঙ্গের। পত্ররিক্ততার মধ্য দিয়ে শীতের প্রয়াণ এবং নূতন কিশলয়-মুকুলের আবির্ভাবের নৈসর্গিক দৃশ্য একটি বিশেষ ভাবার্থে কবির

চিত্তকে সমাহিত করেছে। এই ভাব বা আদর্শের সংকেত, অর্থাৎ জীর্ণতাকে অপসারিত ক'রে চিরকাল ধরে নূতনেব পুনঃপুনঃ আবির্ভাব এবং নূতনের বা যৌবনেরই জয়যাত্রা— এ গীতালি-ফাল্গুনী-বলাকা পর্যায়ের রচনাকালে কবিচিত্তের পারম্পর্য-ক্রমাগত অনায়াস-উপলব্ধি।

বসন্তের আবির্ভাবের মধ্যে যে বীরভাব রয়েছে তা সংকেতিত করতে সূর্যের উত্তরায়ণে পদক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে—'মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে পার হয়ে এল চলি'। কালিদাসের অকালবসন্তে যদিচ সূর্যের উত্তরায়ণই বর্ণিত হয়েছে, তবু 'উত্তরায়ণ' শব্দটি ব্যবহৃত হয় নি। এই শব্দটির সঙ্গে আমাদেব যে ভাব-সংস্কার জড়িত রয়েছে, কবি তাকেই এখানে কাজে লাগিয়েছেন। তা সত্ত্বেও অকালবসন্তের "কুবেরগুপ্তাং দিশমুষ্ণরশ্মৌ গন্তুং প্রবৃত্তে……দিগ্‌দক্ষিণা গন্ধ-বহং মুখেন ব্যলীকনিশ্বাসমিবোৎসসর্জ" এই কবিতাটির উপোদ্‌ঘাতে যে কবিচিত্তকে প্রভাবিত করেছিল তার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে "তার পানে, হায়, শেষ চাওয়া চায় করুণ কুন্দকলি" এই বর্ণনায়। সেখানে বিরহিণী হ'ল দক্ষিণ দিগ্‌বধূ। এখানে কুন্দকলিকা। সূর্যকে যাত্রী বাউল ব'লে কল্পনা করা হয়েছে। তাই 'একতারা'র উল্লেখ করা হয়েছে। তীব্র 'নি' এর বিবৃতিতে বসন্তের আবির্ভাবে পরিবেশ-কঠোরতা দ্যোতিত হয়েছে, কিন্তু অলংকারবৈচিত্র্যে তা রম্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। 'শীতের রথের' ইত্যাদিতে শীতকেও মনোরম ব্যক্তিরূপ দেওয়া হয়েছে, এবং এ-বর্ণনায় রিক্ততা এবং ধূসরতার সঙ্গে জরাজীর্ণতাও ব্যঞ্জিত হয়েছে। এর পরবর্তী স্তবকগুলি শীত এবং বসন্তের উপর আরোপিত নব কল্পনার রমণীয়তা বিস্তৃত করেছে। এই নূতন-অর্থ-আবিষ্কার না থাকলে কবিতাটি শুধু আইডিয়ার বাহন মাত্র হ'ত। এই অর্থ প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে শীত এবং বসন্তকে অভিনব কার্য-কারিতার মধ্য দিয়ে দেখা হয়েছে, যেমন, 'লক্ষ্মীর দান নিমেষে উজাড়ি নির্ভয় মনে দূরে দেয় পাড়ি' 'দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয় চিরাভ্যাসের মেলা' প্রভৃতি। শেষ তিন স্তবকে বসন্তের প্রগল্‌ভতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, নিসর্গের মধ্যেই এ বর্ণনা সীমিত রাখা হয়েছে। 'কল্পনা'কাব্যের বসন্তের মত মানুষের কথা বলা হয় নি এবং ঋতুরঙ্গের স্বভাব রক্ষিত হয়েছে। বকুল, শিমূল, পলাশ, দাড়িম্ব প্রভৃতি কয়েকটি ফুলকে যদিচ বসন্তের মায়াবিস্তারের পটভূমিতে স্থাপন করা হয়েছে এগুলির সংক্ষিপ্ত কার্যের আলংকারিক বর্ণনে ইঙ্গিতের সাহায্যে সমস্ত বসন্তের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে কবি-অভিলাষকেও

পরিস্ফুট করা হয়েছে, যেমন, 'দাড়িম্ববন প্রচুর পরাগে হোক্ প্রগল্‌ভ রক্তিম রাগে' 'নগ্ন শিমুলে কার ভাণ্ডার রক্তদুকূল দিল উপহার' 'দ্বিধা না রহিল বকুলের আর রিক্ত হবার তরে' ইত্যাদি। এ সব কবির একালের নূতন কল্পনার চুম্বক-শক্তিবলে সমাকৃষ্ট শব্দার্থবিন্যাস, জাতীয় জড়তা জীর্ণতা ও আবিলতা-সমাকীর্ণ জীবন-পরিবেশে উদ্ভূত এবং রসিকচিত্তের প্রাথিত। গীতালি-বলাকার সময় থেকে কবিচিত্তে যে জীবন-কল্পনা বা বিশ্ব-কল্পনা গঠিত হয়েছিল তার প্রতিধ্বনি পরবর্তী বহু কবিতার মধ্যেই পড়েছে। **'মহুয়া'** কবিতাটিও প্রেম ও নারী সম্পর্কে এই নূতন কল্পনার আশ্রয়ে রমণীয়তা লাভ করেছে। বিপদের মুখে অচঞ্চল, নিরাশ্রিতকে আশ্রয় দানের শঙ্কিতকে আশ্বাস দানের এবং বুভুক্ষুকে আহাযদানের মহৎ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত নারীর বিলাসহীন যৌবন-মত্ততা মহুয়ার মধ্যে দেখা হয়েছে। শেষ পঙ্‌ক্তির (বধূরে যেদিন পাব, ডাকিব মহুয়া নাম ধ'রে) ব্যঞ্জিতার্থে মহুয়ার বা এই ধরনের নারীর প্রতি কবিচিত্তের অনুরাগাতিশয্য সূচিত হয়েছে।

এই কাব্যের 'নাম্নী' শ্রেণীর কবিতা রচনায় বিভিন্ন স্বভাবের কয়েকটি নারীর ভাব-পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং প্রকৃতি-অনুসারে নামকরণের প্রয়াসও করা হয়েছে। এগুলি মহুয়ার উচ্চ জীবন-নিষ্ঠার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হলেও এবং কবির লঘু-কল্পনা-সম্ভব হলেও রসিকচিত্তাকর্ষক হয়েছে। যেমন, বিষণ্ণতাময়ী বালিকার বিষাদমিশ্র করুণ সৌন্দযের নিম্নলিখিত চিত্র—

কোন্ দেব নিত্যনিবাসনে
পাঠাল তাহারে।
স্বর্গের বীণার তারে
সংগীতে কি করেছিল ভুল।
মহেন্দ্রের দেওয়া-ফুল
নৃত্যকালে খসে গেলে আনমনে দলেছিল কভু ?
আজো তবু
মন্দারের গন্ধ যেন আছে তার বিষাদে জড়ানো,
অধরে রয়েছে তার ম্লান
সন্ধ্যার গোলাপসম—
মাঝখানে-ভেঙে-যাওয়া অমরার গীতি অনুপম।

এই শব্দার্থ আদ্যন্ত অতিশয়োক্তিতে গড়া এবং ব্যঞ্জনায় মনোহর। 'নাম্নী'

শ্রেণীর কবিতাগুলিকে কবিস্বভাবের দিক থেকে সমগ্রভাবে দেখে আলোচিত জীবন-সংকেতের মনোভাবের প্রতিঘাত থেকে সমুৎপন্ন ব'লে মনে করতে হবে। সাগরিকা, নব-বধূ, বাপী এই প্রতিঘাতেরই সহজ রোম্যান্টিক ফসল। এইভাবে সুদূরগামী কল্পনার প্রাধান্য নিয়ে ঋতুরঙ্গ-মহুয়া পর্যন্ত রবীন্দ্রের চিত্রগীত-বৈচিত্র্যের সুদীর্ঘ অধ্যায় অবসিত হয়েছে। এর পর থেকে নিঃসন্দেহে কবির বাস্তব-প্রসক্তির মিশ্রণ দেখা দিয়েছে।

সংবৃত-কল্পনা ও প্রতিহত-গীতধর্মের অধ্যায়

যে-কবি ধ্বনিবক্রতায় বাঙ্‌লা কবিতাকে সংস্কৃতের রাজকীয় ঐশ্বর্য দিয়েছেন, ছন্দ ও মিলের অজস্র বৈচিত্র্যে বঙ্গবাণীর পদসঞ্চার যিনি নিতান্ত কোমল ও রমণীয় ক'রে তুলেছেন এবং অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল ধ'রে যাঁর প্রয়াস বাঙ্‌লা কবিতার ভাষাকে একটি স্থায়ী 'গুণ' ও 'রীতি'র অন্তর্ভুক্ত করেছে, কাব্য-জীবনের অন্তিম পর্বে তাঁর পথ-পরিবর্তন বিস্ময়ের ব্যাপার সন্দেহ নেই। আমাদের ধারণায় দুটি প্রবল কারণে তিনি গদ্যচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। একটি হ'ল এই যে, একই কল্পচিত্র দিয়ে সমাকৃষ্ট একই ভাবারীতির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি তাঁকে ক্লান্ত ক'রে তুলেছিল এবং এর থেকে তিনি পরিত্রাণ চাইছিলেন। দ্বিতীয়টি হ'ল নূতন অভিজ্ঞতার জন্য তাঁর প্রবল আগ্রহ, যা একালের ছবি-আঁকার মধ্যেও অভিব্যক্ত হয়েছিল। গদ্যচ্ছন্দে কবিতা-রচনা তখন পাশ্চাত্ত্যে বেশ প্রতিষ্ঠিত। ফলে কবির এই নবশৈলীর প্রবর্তনে বাস্তব প্রেরণার অভাব হয় নি।

ইংরেজিতে Free Verseকে Cadenced Prose ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। বাঙ্‌লায় বলা যাক সুরধর্মী বা সুরেলা গদ্য। এই গদ্যের পূর্বপরিচয় বাঙ্‌লা রূপকথার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। সংস্কৃত গদ্য-পদ্যও দৃষ্টান্তের কাজ করেছে। বাঙ্‌লা ভাষার পদস্থাপন-রীতিকে পদ্যের সদৃশ মুক্ত রেখে, যেমন বলা যায়, ক্রিয়া বা বিশেষণপদকে বাক্যবন্ধে স্বচ্ছন্দ স্থাপন ক'রে, সুরসংগতি আনা চলে। বিশেষ এই যে, পদ্যের কোনও-না-কোনও রূপকল্পে আবদ্ধ যতি বা লয় এতে অনুসৃত হয় না। সেদিক থেকে গদ্যচ্ছন্দ গদ্যই, পদ্য থেকে পৃথক্। কিন্তু বিপরীত নয়। এই কারণে যে, নিয়মমত যতিপাতের পরিবর্তে একটি সুর-প্রবাহ এই গদ্যকে ঘিরে রয়েছে। চারুতাবশে সাধারণভাবে উভয়ের মধ্যে মিল রয়েছে। বাঙ্‌লায় এককালে নাট্যসংলাপকে যথাযথ ও রমণীয় করবার জন্যে 'অমিত্রাক্ষর'কে ভাঙা হয়েছিল; তবু 'অমিত্রাক্ষরে'র ছয়-আটের নিয়মিত যতিপাত তার মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছিল। কবির 'বলাকা'তেও তাই, অধিকন্তু মিলের যোজনা কবির 'প্রবহমান পয়ারে'র মত ধ্বনিসুষমা বিস্তার

করেছে। এসব পদ্যচ্ছন্দেরই প্রকারবিশেষ, মুক্তবন্ধ অর্থাৎ গদ্যচ্ছন্দ নয়। গদ্যচ্ছন্দে যতিপাত গদ্যেরই মত, অনিয়মিত। এর চরণবিন্যাস ঐ স্বরধর্মের অধীন। নিঃসন্দেহে কবি লিপিকার দু-চারটি কাব্যময় গদ্য-রচনায় পূর্বেই গদ্যচ্ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এবিষয়ে আমরা বহুপূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।*

কাব্যরীতির এই নবত্বে কালোচিত স্বভাব-ধর্মের বিষয়টিও যে কবির প্রজ্ঞানে ধরা পড়ে নি এমন নয়। কবি নিশ্চিতরূপে বুঝেছিলেন যে এই সংকট, সংশয়, সমস্যা ও সংগ্রামের যুগে পোষাকী কবিভাষা এবং মধ্যযুগীয় মম, তোমা, তব, তরে, পানে, নিন্দি, গণি, লক্ষি প্রভৃতি শতাধিক গদ্যে-অপ্রচলিত পদ অনায়াসে কাব্যের ক্ষেত্র থেকে দূরে স'রে যাচ্ছে এবং চলিত ভাষা গদ্যের মত কবিতারও স্বাভাবিক বাহন হয়ে পড়ছে; অবশ্য যুগরুচি বদলালেও কাব্যে অরুচি ঘটছে না। গদ্যচ্ছন্দে লেখা প্রথম কাব্য 'পুনশ্চ' লক্ষ্য করলে বোঝা যায় কবি-কল্পনার বিষয় এবং ভঙ্গি বদলে গেছে একত্র ভাষারীতির সঙ্গেই। 'পুনশ্চ'র প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতার মধ্যে 'কোপাই' 'খোয়াই', মানুষ ও জীব-জগৎ নিয়ে লেখার মধ্যে 'অপরাধী' 'ছেলেটা', 'সহযাত্রী' 'কীটের সংসার' 'শালিখ', আধুনিক সমস্যা থেকে প্রেরণা পেয়ে লেখার মধ্যে 'শুচি', 'রঙরেজিনী' প্রভৃতি কবি-দৃষ্টির অভিনবতা সূচিত করছে। এসব ক্ষেত্রে রোম্যান্টিক কবির প্রবল সুদূর-বাসনা সংকুচিত হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ তাঁকে আকর্ষণ করেছে এ কথা বলা যায়। কিন্তু যাঁরা মনে করেন, শেষ পর্বের কবিতায় আমাদের কবি একেবারে বদলে গেছেন তাঁরা ভুল করেন, কারণ কবির মৌল স্বভাবের মধ্যেই বৈচিত্র্যের প্রতি আগ্রহ এর পূর্বেও ধরা পড়েছে বার বার। তা ছাড়া 'পুনশ্চ'র মধ্যে এবং পরে বহুক্ষেত্রেই কবির পূর্বেকার স্বপ্নবিলাস পুনরাবৃত্ত হয়েছে। যেমন পুনরাবৃত্ত হয়েছে পদ্যচ্ছন্দের ও আলংকারিক ভাষার পুরাতন পরিচিত পদ্ধতি। তবু অভিনবতা যে নানাভাবে ঘটেছে এইটাই বড় কথা এবং কবি যে কল্পনার ঊর্ধ্বগতিকে সংযত ক'রে প্রত্যক্ষ বস্তু এবং সহজ ভাবালুতার দিকে পক্ষপাত প্রদর্শন করেছেন তা-ই এ-কালের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গদ্যচ্ছন্দে লেখা কবিতাসমূহ পূর্বেকার মত পাঠকের অনুরাগ এবং বিস্ময় অব্যাহত রাখতে পেরেছে কি না তার পরিচয় কবিতাবিশেষের পাঠের দ্বারাই

* 'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়' দ্রষ্টব্য

উপলব্ধ হতে পারে। শুধু গদ্যচ্ছন্দে বা নবতর ভাষারীতিতে গ্রথিত হয়েছে ব'লেই কবিতা সমাদরের যোগ্য ব'লে বিবেচিত হতে পারে না। তবে, প্রসঙ্গক্রমে বাঙ্‌লা কাব্যরসিকদের এ বিষয়টিও ভেবে দেখতে হবে যে বিশ্বে গদ্যচ্ছন্দে কবিতা রচনা আজ শতায়ু হলেও এবং খ্যাতিমান্ এলিয়ট্ এই রীতির রচনায় কাব্যসম্পদ্ নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেও, নিয়মানুগ পদ্যচ্ছন্দে রচিত কবিতাসমূহের উৎকর্ষের কাছে আজও এ সমমানরেখায় মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি। ভবিষ্যতে করবে কিনা তা ভাবী কালই বলতে পারবে। কিন্তু রীতিগত আধুনিকতার অবশ্যম্ভাবী জয়ের দোহাই দিয়ে সুপ্রচুর চিত্র-গীতহীন রচনা যে মুদ্রিত অক্ষরে স্থান পেয়েছে এ সম্বন্ধে সংশয় নেই। বাঙ্‌লায় এরকম কবিতা প্রায়শই বিদেশি কবিদের অনুকরণে এবং বিবদমান মতের আশ্রয়ে রচিত হয়ে থাকে। ভাব, উপাদান বা রচনাধর্ম যাই হোক, এরকম কবিতার সাধুত্ব বা অসারতার প্রাথমিক নিরীক্ষা হল এগুলির মধ্যে উত্তম গদ্য স্ফুরিত হয়েছে কিনা। কারণ, প্রথম উত্তম গদ্য, দ্বিতীয়, ছন্দে গ্রথিত ঐ গদ্যের প্রকাশশক্তির উপরই কবিতার চিত্রধর্ম এবং গীতধর্মের মিলিত সৌন্দর্য নির্ভর করছে। এ গদ্যে বিষয়ানুসারে মৌখিক অথবা তৎসম যে-কোনও শ্রেণীর শব্দেরই আধিক্য থাকুক, রচনাশিল্পে এ গদ্যকে যথাযথ ও রমণীয় হতেই হবে। আবার এ গদ্যের মধ্যে এমন প্রচ্ছন্ন শক্তি থাকবে যাতে কবিশিল্পী একে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে পারবেন। এই ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করেছেন—

> একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ ;
> পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
> এর নানারকম গতি অবগতি।
> বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
> অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
> গুরু লঘু নানা ভঙ্গিতে।
> সেই গদ্যে লিখেছি আমার নাটক,
> এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে,
> আর চলতি কালের চাঞ্চল্য।

কবির এই ছন্দোময় গদ্যের স্বরূপ বর্ণনে কিছু অতিকথন থাকলেও, এ বিষয়টি স্পষ্ট যে গদ্যদক্ষ না হ'লে গদ্যচ্ছন্দে কবিতা-রচনার প্রয়াস নিষ্ফল হবে।

কবিতায় মৌখিক শব্দ ও ভাষারীতির দিকে আকর্ষণ গীতালি-বলাকার সময় থেকেই কবি অনুভব করেছেন। নিঃসন্দেহে লৌকিক রীতির প্রতি কবির পক্ষপাতের মূলে বাউল-সংগীতের ভাষাভঙ্গি কাজ করেছে। 'বলাকা'র 'সবুজের অভিযানে' কাব্যের রম্যতাকে অবহেলা ক'রেও সহজ এমনকি গ্রাম্য শব্দকে কবি বেছে নিয়েছেন। 'এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো' 'যখন আমায় হাতে ধ'রে আদর করে' 'আমার কাছে রাজা আমার' প্রভৃতি কবিতাগুলি বাউলদের ভঙ্গি ও ছন্দ নিয়েই গ্রথিত। এই সময় থেকে গুরুগম্ভীর বিষয়ে চলিত ভাষার অনুবর্তনও কবিচিত্তের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ফলতঃ কবি ক্রমশঃ কবিতার ভাষা ও ছন্দ বিষয়ে অলংকারহীন সহজ রীতিকে আশ্রয় করবেন এমন সম্ভাব্যতার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। সব দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায়, 'পুনশ্চ'র গদ্যচ্ছন্দ বিস্ময়কর হলেও আকস্মিক নয়, এর প্রবণতা বিষয়ে পুর্বাপর সংযোগ বিরল হচ্ছে না। 'পুনশ্চ' থেকে এই মৌখিক ভাষারীতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। কোথাও কোথাও এরকম পঙ্‌ক্তি সুসংস্কৃত সাধুভঙ্গির সঙ্গে একই কবিতায় পাশাপাশি বসেছে—

(১) পার হয়ে যাবে গোরুব গাড়ি
আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে ;
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা ;
আর, মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।

(২) ক্রন্দিত আকাশের নিচে ঐ ধূসর বন্ধুর
কাঁকরের স্তূপগুলো দেখে মনে হয়েছে
লাল সমুদ্রে তুফান উঠল,
ছিটকে পড়ছে তার শীকরবিন্দু।

(৩) এর কাছে কিছুই নেই জরুরি,
বর্তমানের নোঙর-ছেঁড়া ভেসে-যাওয়া এই দিন।
··· তেমনি এই যে সোনায় পান্নায় ছায়ায় আলোয় গাঁথা
অবকাশের নেশায় মন্থর আষাঢ়ের দিন

বিহ্বল হয়ে আছে মাঠের ওপর ওড়না ছড়িয়ে দিয়ে,
এর মাধুরীকেও মনে হয় আছে তবু নেই,

(৪) বাতাস রুদ্ধ—
ধোঁওয়া জমে আছে আকাশে,
গাছপালাগুলো যেন শঙ্কায় আড়ষ্ট।
কুকুর অকারণে আর্তনাদ করছে,
ঘোড়াগুলো কান খাড়া করে উঠছে ডেকে

(৫) স্টেশনে যাবার রাঙা রাস্তায়
শহরের-দাদন-দেওয়া দড়ি-বাঁধা ছাগল-ছানা
পাঁচটা ছটা করে।

পুনশ্চ এবং পরবর্তী কালের বহু গদ্যচ্ছন্দরচনার ভাষার পদ্ধতি এই। কিছু সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের অভিজাত রীতির ভাষানির্মাণও যে এই ছন্দে সমানভাবে কার্যকর হয়েছে তার প্রমাণ শেষ-সপ্তক পত্রপুটে ছড়িয়ে রয়েছে। এর কারণ বোধ হয় এই যে ক্রিয়াপদটিকে এবং কিছু কিছু প্রত্যয়াদিকে চলিত রীতির রেখে যথেচ্ছ তৎসম শব্দপ্রয়োগকেও আমরা চলিত বাঙ্‌লা ব'লে মেনে নিয়েছি। যে বাক্যে কুড়িটি শব্দের মধ্যে ষোল-আঠারোটিই সমাসবদ্ধ দীর্ঘ সংস্কৃত শব্দ তাকে চলিত ভাষা বলার কোনও অর্থ না হলেও যেহেতু উচ্চতর ভাবসমূহকে বাহিত করতে গেলে খাঁটি চলিত বা শুদ্ধ মৌখিক ভাষার অপূর্ণতা লক্ষ্য করা যায় পদে পদে, সেইহেতু, সাহিত্যের সৃষ্টিতে এই ধরনের আধা-চলিত বা সাধু-চলিতের প্রয়োজন না মেনেও উপায় নেই। চলিত রীতিতে লেখা প্রবন্ধে অভিজাত শব্দের ব্যবহার উদ্দিষ্ট রসের পোষক হবে কিনা তা নির্ভর করছে বিন্যস্ত কল্পার্থের উপর এবং উদ্দিষ্ট 'সামাজিকে'র উপর। কবির গদ্যচ্ছন্দের বহু রচনাই এই অভিজাত চলিতে। উদাহরণ দেওয়া যাক—

(১) যা একদিন পড়েছে আমার চোখে
দুর্লভ দিনাবসানে
রোহিত সমুদ্রের তীরে তীরে
জনশূন্য তরুহীন পর্বতের রক্তবর্ণ শিখরশ্রেণীতে,
রুষ্টরুদ্রের প্রলয়ভ্রূকুঞ্চনের মতো।

(২) কোন্ অভাবনীয় স্মিতহাস্যে
আমার আত্মবিহ্বল যৌবনটাকে
দিলে তুমি দোলা;

··· জোয়ারের তরঙ্গলীলায় গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত হল
চিরদুর্লভের একটি রত্নকণা
শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্র-বেলায়।

(৩) নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
··· বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেনপাখির মতো তোমার ঝড়
··· তোমার আতপ্ত দক্ষিণে হাওয়া
ছড়িয়ে দিয়েছে বিরহমিলনের স্বগতপ্রলাপ

কিন্তু কাব্যের প্রয়োজনে তৎসম শব্দের গ্রন্থন যতই প্রচুর হোক কবির মেজাজ যে চলিতের সপক্ষে এ সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। এ রবীন্দ্রনাথ আধুনিক এবং সার্থক কবি এই জন্য যে, শব্দ নিয়ে ধ্বনি নিয়ে বাক্যের গঠন নিয়ে বঙ্গভাষার বঙ্গালত্ব খর্ব করার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন নি।

গদ্যচ্ছন্দের বিষমমাত্রিক চালের মধ্যে কবির সমমাত্রিকতার প্রতি আগ্রহও মূর্তি নিয়েছে কিছু কিছু কবিতায়—অক্ষরমাত্রিক পদ্ধতির ছয়-আট-দশের বন্ধনে। এগুলিকে অবশ্যই গদ্যচ্ছন্দ বলা চলবে না, এগুলি মিলহীন পদ্যচ্ছন্দই, চরণবিন্যাস যতই অসমান হোক না কেন। যেমন—

কিনু গোয়ালার ॥ গলি
দোতলা বাড়ির ॥
লোহার-গরাদে দেওয়া ॥ একতলা ঘর ॥
পথের ধারেই ॥
লোনা-ধরা-দেওয়ালেতে ॥ মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি ॥

—ইত্যাদি 'বাঁশি'। এবং অনুরূপ ভাবে পুনশ্চ'র 'খেলনার মুক্তি' 'পত্রলেখা' 'ভীরু' প্রভৃতি। ছড়ার ছন্দের চাল অবলম্বিত হয়েছে 'ছুটি' 'গানের বাসা' প্রভৃতি কবিতায়—

জলের প্রলাপ ॥ যেখানে প্রাণ ॥ উদাস করে ॥
সন্ধ্যাতারা ॥ ওঠার মুখে ॥
যেখানে সব ॥ প্রশ্ন গেছে ॥ থেমে,
শূন্য ঘরে ॥ অতীত স্মৃতি ॥ গুনগুনিয়ে ॥
ঘুম ভাঙিয়ে ॥ রাখে না আর ॥
বাদল রাতে ॥

'পুনশ্চ'র প্রকৃতি-সম্পর্কের কবিতানিচয়ের মধ্যে **'কোপাই'** এবং **'খোয়াই'** কবির কিছুটা নূতনতর দৃষ্টিকোণের পরিস্ফুট পরিচয় বহন করছে। কিন্তু বলা যায় যে, কবির আগ্রহ-অভিলাষের পরিবর্তন যে-পরিমাণে ঘটেছে, খাঁটি বাস্তব মনোভঙ্গি সে পরিমাণে প্রসারিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। সৌন্দর্য-দৃষ্টি অবিকৃত আছে, কেবল কল্পনার সুদূর-যাত্রা তিরস্কৃত হয়েছে। এ-কবির রোম্যান্টিক সৌন্দর্যপ্রীতির পরিচয় ফুটেছে নিম্নলিখিতরূপ পঙ্‌ক্তিতে—

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা
দুই তীরকে ঠেলা দিয়ে
উচ্চ হেসে ধেয়ে চলে।
··· যেমন নটী যখন অলংকারের ঝংকার দিয়ে নাচে,
আর যখন সে নীরবে বসে থাকে ক্লান্ত হয়ে,
চোখের চাহনিতে আলস্য,
একটুখানি হাসির আভাস ঠোঁটের কোণে।

বলা বাহুল্য, নটীর চিত্র-কল্পনা নদীর বর্ণনাকে মনোহারী করেছে। অপরপক্ষে যথাদৃষ্ট পরিবেশের স্বভাবচিত্র স্ফুরিত হয়েছে নিম্নলিখিত বর্ণনে—

তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক-হাতে সাঁওতাল ছেলে
পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি
আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে;
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে;
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা;
আর, মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।

এ-বর্ণনায় কবির অব্যবহিত-পূর্ব কাব্যজীবনের সংকেতময় নিসর্গচিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু এর সূত্র মিলবে চৈতালিতে ও ছিন্নপত্রে। সে-সময়কার উল্লেখযোগ্য দুটি কবি-প্রবৃত্তি—নিসর্গ-নির্ভর নিরুদ্দিষ্ট কল্পনা-বশ্যতা এবং প্রত্যক্ষ নিসর্গানুরক্তি—পরবর্তী কাব্য-জীবনে নানাভাবে অনুসৃত হয়েছে এবং দুটি প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব এবং সমন্বয়ও ঘটেছে প্রচুর। কবির অরূপাসক্তি, নটরাজ-কল্পনা এবং বলাকার 'অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে' এমন কি মহুয়ার 'দেখা হবে ক্ষুব্ধসিন্ধু-তীরে' পর্যন্ত নভোবিহারী কল্পনার অনুগত শব্দার্থ-নির্মাণ।

এরই ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু কবিতায় ও গানে বাস্তব নিসর্গ তার স্বরূপে কবিকে চমৎকৃত করেছে। ঋতুপর্যায়ের মধ্যে নটরাজের চরণক্ষেপ অনুভব এবং বাস্তবোত্তীর্ণ মুক্তজীবনবোধ পর্যন্ত কবির ঐ উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার মায়াচিত্র-সৃজন। পুনশ্চ থেকে কল্পনারশ্মি সংযত হয়েছে, প্রত্যক্ষ নিসর্গ ফিরে এসেছে এবং আত্মচেতনলোকের ঐশ্বর্যের দিকে কবিদৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে।

'কোপাই' এর প্রারম্ভে স্মৃতি থেকে সমাহৃত পদ্মাতীরচিত্র 'কোপাই' নদীর সঙ্গে বৈপরীত্যের দিক থেকে নয়, প্রবৃত্তির ঐক্যের দিক থেকেই আস্বাদ্য, যদিও দুই নদীর বৈপরীত্যের প্রসঙ্গ কবি এনেছেন কবিতাটির অভ্যন্তরে। উপরি-উদ্ধৃত বর্ণনার সঙ্গে পদ্মাতীরের বর্ণনা মিলিয়ে নেওয়া যাক—

অন্যপারে বাঁশবন, আমবন,
পুরানো বট, পোড়ো ভিটে,
অনেকদিনের গুঁড়ি-মোটা কাঁঠালগাছ—
পুকুরের ধারে সর্ষে-ক্ষেত,
…ঐখানে রাজবংশীদের পাড়া,
ফাটল-ধরা খেতে ওদের ছাগল চরে,
হাটের কাছে টিনের ছাদওয়ালা গঞ্জ—

পদ্মা এবং কোপাই দুয়ের বর্ণনাতেই কবিপ্রবৃত্তি এক। 'খোয়াই' কবিতাটি উপসংহারে 'কোপাই' এর সদৃশ রূপ গ্রহণ করেছে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নিসর্গের অনলংকৃত চিত্র উপস্থাপনে কবিতা দুটি শেষ হয়েছে। 'খোয়াই' এর শেষ পঙ্‌ক্তিগুলি হল—

তার পরে রইবে উত্তরদিকে
ঐ বুক-ফাটা ধরণীর রক্তিমা,
দক্ষিণ দিকে চাষের খেত,
পুব দিকের মাঠে চরবে গোরু।
রাঙামাটির রাস্তা বেয়ে
গ্রামের লোকে যাবে হাট করতে।
পশ্চিমের আকাশপ্রান্তে
আঁকা থাকবে একটি নীলাঞ্জন রেখা।

সমস্ত 'খোয়াই' কবিতাটিই নিসর্গ-উদ্দীপিত বিস্ময়ে স্পন্দিত। 'কোপাই' এর বর্ণনায় মুগ্ধতা আছে, কিন্তু এতখানি বিস্ময়-বোধ নেই। ফলে 'খোয়াই'এ

আবেগ সঞ্চারিত হয়েছে এবং স্ফুট অলংকৃতিরও প্রকাশ ঘটেছে। যেমন,—

দেখেছি সেই মহিমা
যা একদিন পড়েছে আমার চোখে
দুর্লভ দিনাবসানে
রোহিত সমুদ্রের তীরে তীরে
জনশূন্য তরুহীন পর্বতের শিখরশ্রেণীতে
রুষ্টরুদ্রের প্রলয় ভ্রূকুঞ্চনের মতো।

'কোপাই'এ কবির আকর্ষণ হয়ত অনাদৃত তুচ্ছের সপক্ষে, কিন্তু এখানে স্পষ্টই খাপছাড়া ভয়ানক সুন্দরের উপর। উভয়ত্রই কিন্তু সৌন্দর্যনিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। 'খোয়াই'এ কবির 'grotesque'এর দিকে আগ্রহের অন্য দৃষ্টান্ত হ'ল—

ক্রন্দিত আকাশের নিচে ঐ ধূসর বন্ধুর
কাঁকরের স্তূপগুলো দেখে মনে হয়েছে
লাল সমুদ্রে তুফান উঠল
ছিটকে পড়েছে তার শীকরবিন্দু।

'কোপাই' থেকে এর অন্যবিধ বৈশিষ্ট্য এই যে, এর সঙ্গে কবির আত্মভাবুকতার সংযোগ স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে; ফলে বিদায়ী কবির চিত্তের করুণ স্পর্শও কিছু বৈচিত্র্য এনেছে।

'বাসা' কবিতাটি গদ্য-সংগীতের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। স্তবকান্তে 'ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে' এই কল্পচিত্রময় ইঙ্গিত ধুয়ার মত অনুবৃত্ত হয়ে সমস্ত কবিতাটিকে দীর্ঘায়িত সংগীতের রূপ দিয়েছে। চিত্রধর্মও কবিতাটির স্বরূপ-লক্ষণ। উপসংহারে "এ বাসা আমার হয়নি বাঁধা, হবেও না। ময়ূরাক্ষী নদী দেখিওনি কোন দিন" প্রভৃতি উক্তিতে কবির স্বপ্নচারী স্বধর্ম প্রতিফলিত হয়েছে। আরণ্যক কবির নিসর্গ-প্রীতি আমাদের পরিচিত, কিন্তু এখানে বিশেষ এই যে, অতিপ্রত্যক্ষ এবং সহজ দৃষ্টিতে দেখা ছবি নিয়ে রূপকথার গন্ধে একালে নবরূপ-কথার আমেজ সঞ্চার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

নদীর ধারে ধারে পায়ে-চলা পথ
রাঙা মাটির উপর দিয়ে,
কুড়চির ফুল ঝরে তার ধুলোয়;

এ দৃশ্য আমাদের পরিচিত হলেও সম্পর্কহীনতার জন্য অপরিচিতই। আর,

সেইখানে ভাসে রাজহংস
আর ঢালুতটে চরে বেড়ায়
আমার পাটল রঙের গাই গোরুটি
আর মিশোল রঙের বাছুর।

এ সম্পদ অত্যন্ত অভীপ্সিত, কারণ 'এ বাসা আমার (আমাদের) হয়নি বাঁধা, হবেও না।' রূপকথা-বলার ভঙ্গিতে অর্থাৎ সহজ গদ্যচ্ছন্দে গ্রথিত হয়ে কবিতাটি মোটামুটি উত্তম হয়েছে বলা যায়।

নিঃসন্দেহে সুরধর্মী গদ্যেও রচনার উত্তম-মধ্যম শ্রেণীবিভাগ আছে। চরণ-বিন্যাস যেখানে বিবৃতিমাত্রকে অনুসরণ করেছে সেখানে চিত্রধর্ম এবং এই নবগীতি-প্রেরণার নিত্যসম্বন্ধ ঘটছে না এবং কাব্যরস কৃপণ হয়ে পড়ছে। 'পুনশ্চ'র প্রারম্ভে স্থাপিত নাটক, নূতন কাল, ফাঁক, এমনকি অপরাধী, ছেলেটা, সহযাত্রী প্রভৃতি কবিতা কাব্যের নেশা লাগাতে পারে নি। কোথাও অতিমাত্রার মৌখিক রীতির জন্য পারে নি, কোথাও বিবৃতি সম্বল ব'লে, কোথাও বক্তব্যের অতিতুচ্ছতায়, কোথাও বা কবিমানসের সাময়িক বিকৃত-কুৎসিত-খাপছাড়া-অদ্ভুতের প্রতি আগ্রহের জন্য। আমরা এরকম 'চিত্রকাব্যে'র পরপর চারটি উদাহরণ দিচ্ছি—

(১) আমাদের কালে গোষ্ঠে যখন সাঙ্গ হল
সকালবেলার প্রথম দোহন,
ভোরবেলাকার ব্যাপারীরা
চুকিয়ে দিয়ে গেল প্রথম কেনা-বেচা।

(২) কী কী আছে দিনের দাবি
পাছে সেটা যাই এড়িয়ে
বন্ধু তার ফর্দ রেখে যায় টেবিলে।
ফর্দটাও দেখতে ভুলি,
টেবিলে এসে বসাও হয় না
এমনিতরো ঢিলে অবস্থা।

(৩) এইখানটায় একটুখানি তন্দ্রা এল।
হঠাৎ-বর্ষণে চারিদিক থেকে ঘোলা জলের ধারা
যেমন নেমে আসে, সেইরকমটা।

তবু ঝোঁকে ঝোঁকে উঠে টলমল করে কলম চলেছে।
যেমনটা হয় মদ খেয়ে নাচতে গেলে।
তবু শেষ করব এ চিঠি,
কুয়াশার ভিতর দিয়েও জাহাজ যেমন চলে,
কল বন্ধ করে না।

(৪) মোটা মোটা কালো মেঘ
ক্লান্ত পালোয়ানের দল যেন,
সমস্ত রাত বর্ষণের পর
আকাশের এক পাশে এসে জমল ঘেঁসাঘেঁসি করে।

'পুনশ্চ'র এরকম শুধু-লিখে-যাওয়ার ঝোঁকে রচিত ছন্দোবদ্ধ বাক্যসমষ্টিতে আমরা আনন্দ পাই নি। কবির নূতন ছন্দের স্রোতে ভালো মন্দ সব কিছু একই সঙ্গে বাহির হয়েছে এমন মনে করা যেতে পারে। হয়ত এই নির্বিচার শব্দার্থ-নির্মাণের প্রয়াসই কবির গদ্যছন্দের কাব্যাকর্ষণ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। যাই হোক, পরবর্তী 'শেষ সপ্তক' কাব্যে কবি এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছেন এবং নূতন রীতির রচনার অনবদ্য স্বাক্ষর রেখেছেন।

'অপরাধী' অথবা **'ছেলেটা'** কি 'সহযাত্রী' কবিতা বিষয়-বৈচিত্র্যে যদ্যপি আকর্ষণীয় হয়েছে এবং বর্ণনায় নূতন ভঙ্গির স্বাভাবিক চমকও লাগিয়েছে তবু কাব্যের পরমবৈচিত্রীর সৃষ্টি করতে পারে নি। এর কারণ বোধ হয় এই যে এগুলির মধ্যে চারিত্র্যের অতি পরিস্ফুট বর্ণনায় চিত্রের রমণীয়তা রক্ষিত হয় নি। কাব্যে আমরা আভাস-ইঙ্গিত, বলা-না-বলার আলো-ছায়ার মিশ্রণ চাই। কাব্যের ঐ ধর্ম এগুলির মধ্যে উপেক্ষিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে দুটি চরিত্রের নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা বর্ণ-বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে এবং ক্লান্তিকর হয়েছে—

(১ তিনু অপকার করে কিছু না ভেবে,
উপকার করে অনায়াসে,
কোনোটাই মনে রাখে না।
ও ধার নেয়, খেয়াল নেই শোধ করবার;
যারা ধার নেয় ওর কাছে
পাওনার তলব নেই তাদের দরজায়।
মোটের উপর ওরই লোকসান হয় বেশি।

(২) একদিন প্রতিবেশীর বাড়া ভাতে মুখ দিতে গিয়ে
তার দেহান্তর ঘটল।
মরণান্তিক দুঃখেও কোনো দিন জল বেরোয়নি যে ছেলের চোখে
দু' দিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়ালো;
মুখে অন্নজল রুচল না। ইত্যাদি।

বাচ্যার্থের অতিস্পষ্টতা এবং শব্দার্থের বাহুল্যে এরকম বর্ণনায় কাব্যরস ব্যাহত হয়েছে। গদ্যচ্ছন্দে রচনা ব'লে নয়, এরকম বিবৃতি কাব্যের অনুকূল নয় বলেই বা চমৎকারজনক কোনও ইঙ্গিত দিতে পারছে না বলেই কাব্য হয় নি। তুচ্ছ এবং সাধারণের প্রতি অতিকৃত আগ্রহই কি এরকম শব্দার্থবিন্যাসের কারণ?

'নূতন কাল' কি **'নাটক'** ঐভাবে তত্ত্বের বিবৃতিমাত্র হয়েছে। 'নাটক'এ গদ্যচ্ছন্দের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, আর 'নূতন কাল' এ কবির পুরাতন সৃষ্টির চিরন্তনতার সত্য এবং কালোপযোগী নতুন কবিতার স্বরূপ বোঝানো হয়েছে। এই কবিতাটিতে হাট, কেনাবেচা, দেনাপাওনা, হিসাব, উদ্বৃত্ত প্রভৃতির চিত্র বিন্যস্ত হলেও বিষয়টিকে রমণীয় করে নি। এর রস আস্বাদ্য নয়, মাত্র ভাবার্থ বিশ্লেষণযোগ্য হতে পারে। সেকালের কবিকণ্ঠে আবৃত্ত কাব্যের শ্রবণ এবং একালের মুদ্রিত কবিতার পাঠ নিয়ে **'পত্র'** কবিতাটিতে বরং হাস্যরসিকতা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'মেঘদূত' নিয়ে লেখা কবির কয়েকটি কবিতার মধ্যে **'বিচ্ছেদ'** কবির নিজ তত্ত্বভাবনার প্রকাশ মাত্র হয়েছে। যে গতিহীন, আবদ্ধ এবং স্থির বিরহদুঃখ তারই, এই ধারণা অনুসারে যক্ষকে বিরহের আনন্দের মূর্তি এবং যক্ষপ্রিয়াকে যথার্থ দুঃখমূর্তিরূপে দেখা হয়েছে। দ্বিতীয় চিন্তায় যক্ষপ্রিয়াকেও গতিশীলতার মধ্যবর্তী ব'লে বোঝানো হয়েছে। কবির গীতালি-বলাকা পর্যায়ের যাত্রা ও দুঃখবোধের ধারণায় কবিতাটির জন্ম। তবে গদ্যচ্ছন্দ-নির্মাণের সুচারু পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসের এবং সীমিত ও শক্তিমান্ গদ্যের পরিচয় কবিতাটিতে কিছু কিছু মিলবে—

মেঘ চলছে না, চলছে না হাওয়া,
টিপি টিপি বৃষ্টি
ঘোমটার মতো পড়ে আছে
দিনের মুখের উপর।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেছে মেঘ,
পুবে-হাওয়া বয়েছে শ্যামজম্বুবনান্তকে দুলিয়ে দিয়ে।

… সেখানে অচল ঐশ্বর্যের মাঝখানে
প্রতীক্ষার নিশ্চল বেদনা।

গদ্যচ্ছন্দে শব্দের ব্যবহারের দুটো বিভাগ—একটি সাধু এবং অন্যটি মৌখিক—পুনশ্চর মধ্যেই মিলবে বিষয়ানুসারে।

পুনশ্চর একটি বিশেষ চিহ্ন হ'ল এর আখ্যান-কাব্যিকতা। এর পূর্বেকার এই ধরনের রচনা স্মরণে আনলে দেখা যায় 'কথা' কাব্যে চিত্রধর্ম এবং ভাবাসক্তির মনোহারিতা আকর্ষণের বিষয় হয়েছে। 'পলাতকা'য় নারীমানস-চিত্র এবং নিসর্গপ্রীতি-সম্পর্কের পরিচয়। 'পুনশ্চ'র কবিতাগুলিতে ঘটনার বিস্ময়। এদিক থেকে এগুলির মধ্যে ছোটগল্পের চমৎকার অনুভূত হয়েছে, তা ছাড়া গদ্যচ্ছন্দে গদ্যের আভাস রয়েছে ব'লেও গীতিকাব্য অপেক্ষা গল্পরসের প্রাধান্য পেয়েছে 'ক্যামেলিয়া'র মত কবিতা। অবশ্য আখ্যান-বাহিত বা কাহিনীর মাত্র স্পর্শযুক্ত সব কবিতাই সমান রসাস্বাদের বাহক হয় নি। 'বাঁশি' কবিতায় প্রেমিকের ও বিরহীর মনোধর্মের ইঙ্গিত গীতিভাবপ্রবণতার আধিক্য ঘটিয়েছে, আর 'বঙবেজিনী' 'মুক্তি' 'প্রথম পূজা' প্রভৃতির মধ্যে আদর্শমিশ্র ভাবের আলোড়নে কবি মনোযোগ দিয়েছেন। এর মধ্যে 'প্রথম পূজা' কিছু স্বভাবচিত্রের দীপ্তিও বিস্তার করেছে। **'শেষ চিঠি'**তে কাহিনীর একটা ছিন্নসূত্র মাত্র গৃহীত হয়েছে, কিন্তু এই সূত্রটিকে শব্দার্থের মধ্যে এমনভাবে যোজনা করা হয়েছে যাতে অভিপ্রেত করুণরসসিদ্ধি ঘটে। নিরুপায় কন্যার ছবি এবং পিতৃহৃদয়ের পরিচয় এরই মধ্যে একত্র ফুটেছে। এর সমস্ত কারুণ্যকে নিয়ন্ত্রিত করছে ঐ চিঠি এবং চিঠির একমাত্র কথা—'তোমাকে দেখতে বড্ডো ইচ্ছে করছে।' এই সাধারণ এবং শত সহস্রবার কথিত মনোভাবকেই কবি অসাধারণতায় তুলে ধরতে চেয়েছেন। পরিবেশ-চিত্র একালকার এবং মধ্যবিত্ত সমাজের সংলগ্ন ব'লে এর কারুণ্য প্রায় বাধাহীন হতে পেরেছে সংস্কৃতিমান আধুনিক জনচিত্তে। **'ক্যামেলিয়া'** এই শ্রেণীর আধুনিক পরিবেশ-প্রধান কবিতা। এটিকে যথার্থভাবে কাহিনীরই কাব্যরূপ বলা যেতে পারে। ছোট গল্পের সমস্ত উপাদান এই কবিতায় সুলভ, একটিমাত্র ঘটনার গতি ও পরিণাম এর মধ্যে স্পষ্ট। তা ছাড়া সমাপ্তিতে উপন্যাসের ঘটনা-সমানীত অপ্রত্যাশিতের বিস্ময় কবিতাটিকে ছোটগল্পেরই শ্রেণীভুক্ত করেছে, গীতিকাব্যের নয়। মনে রাখতে হবে যে গীতিকাব্যের সঙ্গে ছোটগল্পের জন্মমূলে কিছু ঐক্য আছেই এবং

কবিভাবুকতার যোগে ছোটগল্পও কাব্যধর্মী হয়ে পড়ে অনায়াসে। 'ক্যামেলিয়া'য় গল্পকেই ছন্দোবদ্ধ করা হয়েছে। ক্যামেলিয়ার কাব্যগত চমৎকার নির্ভর করছে ভাগ্যদেবতার পরিহাসরসিক স্বরূপের ব্যঞ্জনায়। গল্পনির্মাণের মধ্যে ঐ কৌতুকরসই পাঠকের একমাত্র লভ্য হয়েছে। **'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি'**তে যদিও একটি সম্ভাব্য ঘটনাকেই রূপ দেওয়া হয়েছে, তবু এর উদ্ভব কবির গীতিকাব্যিক মানসলোকে, সেই গীতিকাব্য স্ফুরিত হয়েছে বিচ্ছিন্ন দুটি তরুণ-তরুণীর ব্যর্থ প্রণয়ের বিমূঢ়তায়। কাহিনী বিস্তারের দিকে কবির বিন্দুমাত্র ঝোঁক এর মধ্যে দেখা যায় না। **'সাধারণ মেয়ে'** কবিতায় আধুনিক কালের শিক্ষা সংস্কৃতির আভিজাত্য নেই এমন অত্যন্ত সাধারণ নারীর স্বপ্ন ও আশা কবি সহানুভূতি দিয়ে অনুভব করেছেন, যেমন করেছেন 'পলাতকা'য়। এও ঘটনা-প্রধান নয়, কাল্পনিক চিত্র এবং নারীসুলভ ভঙ্গিমাময় গীতাত্মক বাক্যে এর আদ্যন্ত করুণের ছায়া বিস্তার করেছে। অবহেলিত অতিসাধারণ নারীর মধ্যে অসাধারণতা প্রদর্শনের জন্য শরৎচন্দ্র তখন খ্যাতির উচ্চ আসনে। রবীন্দ্রনাথ নারীমানসের এ চিত্রাঙ্কনে তৎকালের শরৎচন্দ্র-উদ্বোধিত বাঙালির অভিলাষকে যেমন মান্য করেছেন, তেমনি তাঁর স্বকীয় কাব্য-কল্পনাও যোগ করে দিয়েছেন। **'উন্নতি'** এবং **'ভীরু'** কবিতায় উন্নত কাব্যের লক্ষণ কিছু নেই, শিল্পগত আকর্ষণও যৎসামান্য। কেবল জীবনের স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক ঘটনা বা চারিত্র্যের উপর এক ধরনের বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ স্থানে স্থানে রম্যতার উদ্ভব ঘটিয়েছে বলা যায়, যেমন—

ভাঙা বোতলের ঝুড়ি বেচে
শেষকালে কে হয়েছে লক্ষপতি ধনী
সেই গল্প শুনে শুনে
উন্নতি যে কাকে বলে দেখেছি সুস্পষ্ট তার ছবি।
······বহু কষ্টে ঋণ ক'রে
বোনের দিয়েছি বিয়ে।
নিজের বিবাহ প্রায় টার্মিনাসে এল
আগামী ফাল্গুন মাসে নবমী তিথিতে।
নববসন্তের হাওয়া ভিতরে বাইরে
বইতে আরম্ভ হল যেই—
এমন সময়ে রিডাক্‌শান্‌।

জীবনের প্রতি এই কটাক্ষ, যা কিছুটা অগভীরও বটে, তা কবিতাটির আদ্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে। গদ্যচ্ছন্দের এবং মৌখিক ভঙ্গির রচনা ব'লে হয়ত এরকম ক্ষেত্রে আভাস-ইঙ্গিতের অবসর কবি কম পেয়েছেন। 'ম্যাট্রিকুলেশন পড়ে, ব্যঙ্গ-সুচতুর, বটেকৃষ্ট' ইত্যাদি। 'ভীরু' কবিতার শেষে বটেকৃষ্টের প্রতি কবির আরোপিত নিজব্যঙ্গ কিছু ভয়ানকই হয়েছে এবং প্রতিশোধ কবি যে নিজেও নিয়েছেন, বর্ণনায় তা স্পষ্ট—

জোর ক'রে হেসে উঠে
কী কথা বলতে গেল বটু,
সুনীত হাঁকল 'চুপ'—
অকস্মাৎ বিদলিত ভেকের ডাকের মতো
হাসি গেল থেমে।

হাসি-ঠাট্টা যদিচ পরিণামে কখনও কখনও গুরুতর হয়ে থাকে, তবু কবি সেই বাস্তবের নকল করবেন কিনা, এবং চরিত্রাঙ্কনে তাঁর পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠবে কিনা এর দক্ষ বিচারক রবীন্দ্রনাথের চেয়ে একালে আর কেই বা আছেন? তবু কবি এই অসংগতিকে প্রশ্রয় দিলেন কতকটা অতিরিক্ত বাস্তবের আগ্রহে এবং কিছুটা বোধ হয়, সাময়িক কল্পনাহীন অবস্থার মধ্যেও লেখনী-চালনার উৎসাহে। 'ভীরু' কবিতাটি অন্যদিক থেকে দেখলে বিবাদী-রস-সংস্পৃষ্টও হয়েছে। বিরহী সুনীতের বিরহ-বিনোদন বর্ণনায় কবি রোম্যান্টিক ভাবালুতা বিস্তারের অবকাশ ত্যাগ করতে পারেন নি—

সুনীত ধরেছে গান
নটমল্লারের সুরে,
—আওয়ে পিয়রওয়া,
রিমিঝিমি বরখন লাগে!—
সুরের সুরেন্দ্রলোকে মন গেছে চলে,
নিখিলের সব ভাষা মিলে গেছে অখণ্ড সংগীতে
অন্তহীন কালসরোবরে
মাধুরীর শতদল—
তার'পরে যে রয়েছে একা বসে
চেনা যেন তবু সে অচেনা।

এই ভাববিস্তার অপ্রাসঙ্গিকতা দোষে দুষ্ট হয়েছে।

কাহিনীর রেশ আছে মাত্র, কাহিনী নেই—একটি ঘটনার অনুস্মৃতি আছে মাত্র, বিস্তৃতি নেই—এমন বিষয় অবলম্বনে গীতিকাব্যিকতার ধর্ম কবি পুরোপুরি রক্ষা করেছেন 'পত্রলেখা' 'বাঁশি' প্রভৃতি কবিতায়। **'পত্রলেখা'** কবিতায় যে সদ্যোবিরহিতার মানসিক অবস্থা কবির অঙ্কনের বিষয় সে চির-কালের হয়েও বিশেষভাবে একালের এই বিশেষত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। অর্থাৎ ইনি আধুনিক বিরহিণী, সংসারের কর্তব্য পালন ক'রে বিরহকে যে-পরিমাণে এবং যে-ভাবে রক্ষা করা যায় তা-ই ইনি করছেন। 'পুনশ্চ'র সর্বত্র কবির এই বাস্তবতা-প্রীতি লক্ষণীয়। সন্দেহ নেই সাধারণের কাছে অতিপরিচিত এই বধূর চিত্র প্রাচীনের বহুকথিত কাল্পনিক বিরহিণীদের চেয়ে অধিকতর প্রার্থিত—

দশটা তো বেজে গেল।
তোমার ভাইপো বকু যাবে ইস্কুলে,
যাই তাকে খাইয়ে আসিগে।
শেষবার এই লিখে যাই—
তুমি চলে গেছ।

'বাঁশি' কবিতাতেও কবি আধুনিক চিত্রগীতের মধ্যেই চিরন্তনের স্বপ্নদ্রষ্টা বিরহীকে ধরেছেন। 'বাঁশি' কবিতায় সাম্প্রতিক চরিত্র এবং সাম্প্রতিক চিত্রই একালের জনমানসে কবিতাটির স্থায়ী আবেদনের কারণ হয়েছে। 'সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি'টির দুবহ জীবনের কোনও অবকাশে অনাগত বধূর বেশে দুর্লভ বসন্তের আবির্ভাব চিত্র মনোরম কারুণ্যের বিস্তার করেছে। 'বাঁশি' কবিতার পরিবেশ ও মানসচিত্র স্বগতোক্তির আশ্রয়ে গঠিত। কিন্তু স্বগতোক্তির রীতি কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিচালিত হয় নি বলেই মনে হয়। সেখানে কবির নিজ মন্তব্য চরিত্রমুখে যোজিত হওয়ায় বর্ণনা অতিশয়িত হয়ে পড়েছে, যেমন—

হঠাৎ খবর পাই মনে
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানীর কোনো ভেদ নেই।
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।

অথবা 'আপিসের সাজ' নিয়ে কৌতুক—

গোপীকান্ত গোসাঁইএর মনটা যেমন
সর্বদাই রসসিক্ত থাকে।

চরিত্রমুখে এসব স্থানে রসিকতার পরিবর্তে তিক্ততাই প্রত্যাশিত ছিল। কবিতাটিতে গদ্যছন্দের চরণবিন্যাসের মধ্যে আসলে অক্ষরমাত্রিকের ছয়-আটের পব ও চার মাত্রার পর্বাঙ্গের চা'ল অনুসৃত হয়েছে। **'খেলনার মুক্তি'**তে লঘু কল্পনাভঙ্গির আশ্রয়ে কবি খেলনার মত তুচ্ছ শিশুরাজ্যের বস্তুকেও মুক্তির আনন্দের অংশীদার করেছেন।

'শুচি', 'রংরেজিনী' থেকে 'প্রথম পূজা' পর্যন্ত এক ঝাঁক কাহিনী-কবিতা কবির অস্পৃশ্যতা-বিরোধ এবং উদার মানবীয়তার আদর্শবোধ থেকে জন্ম নিয়েছে। তবু কবিতাগুলিতে ভাব-সংযমন এবং চিত্ররীতির বর্ণনার দিকে আগ্রহ লক্ষণীয়। প্রাচীন বিষয় নিয়ে লেখা ব'লে কবিতাগুলি কবির 'কথা'র সজাতীয় রচনা হয়েছে। এর মধ্যে **'রংরেজিনী'**তেই কাহিনীর গ্রন্থন সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে এবং আবেগের নিতান্ত সংযমও লক্ষণীয় হয়েছে। চমৎকার কাহিনীটি নিজেই কথা বলেছে। কবির বাগ্‌বিস্তারের কোনও প্রয়োজনই ঘটে নি। 'প্রথম পূজা'য় কাব্যকৌশল একটু পৃথক্ পথ নিয়েছে, কবিকে চিত্র-কর হয়ে ছবি আঁকতে হয়েছে কয়েকটি স্থানে, যেমন পূজার মেলার ছবি অথবা ভূমিকম্পের বর্ণনা। কিরাতবৃদ্ধের অবদানের বিষয় শ্রীমতীর আত্মদান স্মরণ করিয়ে দেয়। বর্ণনায় সর্বত্র কবির ভাবুকতার স্পর্শ লেগেছে আর অপেক্ষাকৃত মার্জিত ভাষারীতি কবি ব্যবহার করেছেন ব'লে পঙ্‌ক্তি দীর্ঘায়িত হয়েছে। বর্ণনার প্রাধান্য যেখানে, সেখানে অনেক কথাকে এককথায় বলবার আগ্রহে এবং কিছুটা গদ্যসংগীতবৈচিত্র্যের জন্যও কবিকে চরণ দীর্ঘ করতে হয়েছে। 'শাপমোচন' এবং **'শিশুতীর্থে'**ও বর্ণনার আবেগের ক্ষেত্রে চরণ দীর্ঘতা লাভ করেছে। শেষোক্ত কবিতাটিতে অভিব্যক্তির পথে চলমান মানুষের যে চিত্র দেওয়া হয়েছে সে চিত্র কিছু পূর্বে লেখা 'বলাকা'র 'ঝড়ের খেয়া' কবিতার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে, তা ছাড়া 'এবার ফিরাও মোরে' প্রভৃতিতেও আভাসিত হয়েছে। পথিক মানুষের যাত্রার ছবি অবশ্য এখানে বিস্তৃততর ভাবে দেওয়া হয়েছে। আর সমস্ত মানুষকে নিয়ে একটি সামগ্রিক মানবসত্তার কল্পনা এর মধ্যে ভাব-প্রেরণার কাজ করেছে। 'শিশুতীর্থ' প্রকৃতপক্ষে গদ্যেই লেখা হয়েছে বলা যেতে পারে। গদ্যচ্ছন্দে এবং সাধারণ গদ্যে সুরধর্মের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব নিয়ে

যদি পার্থক্য অনুধাবন করা যায় তাহ'লে বলতে হবে কবি নিম্নলিখিতরূপ স্থান সমূহে অতিদীর্ঘ চরণবিন্যাসের ক্ষেত্রে সুরসামঞ্জস্য অবহেলা ক'রে শুধু উত্তম গদ্যই লিখে গেছেন। মনে রাখতে হবে, এটি কবির ইংরেজী রচনার অনুবাদী—

অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ডবেগে।
অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না।
একজনের পর একজন উঠল, আঘাতের পর আঘাত করলে,
তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
··· শেষে যখন খাপ থেকে ছুরি বেরোতে চায় এমন সময় অন্ধকার ক্ষীণ হ'ল
প্রভাতের আলো গিরিশৃঙ্গ ছাপিয়ে আকাশ ভরে দিলে।

'শাপমোচন'ও এইভাবে গদ্যকেই প্রায়শঃ খুশীমত চরণে বিন্যস্ত ক'রে লেখা। 'পুনশ্চ' কাব্যে ভাষা রীতি ও চরণবিন্যাসের দিক থেকে গদ্যচ্ছন্দের যে সব বিক্ষিপ্ততা লক্ষ্য করা যায় তা পরবর্তী অধ্যায়ে সংহত হয়েছে এবং 'শেষ সপ্তকে' যেমন সংখ্যায় অধিক উত্তম কবিতা পাওয়া যাচ্ছে তেমনি ছন্দের সৌকর্যও লক্ষিত হচ্ছে পুনঃ পুনঃ।

'পুনশ্চ'র এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি কবিতা সহজ চিত্রধর্ম নিয়ে ব্যঞ্জনায় অসামান্য হয়ে উঠেছে, তা হ'ল **'ছুটির আয়োজন'**। এর প্রথম স্তবকে প্রকৃতি-সংস্পর্শে কবিচিত্তের প্রয়োজন-মুক্তি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে স্কুল ও কলেজের ছাত্রের পাঠে ঔদাসীন্য। পরবর্তী অংশে প্রৌঢ় দম্পতির সংসার-মুক্তি এবং শেষ অংশে সবচেয়ে অসহায় প্রাণীর কাতর আর্তনাদের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এ চিত্রগুলি আমাদের অতি পরিচিত কিন্তু এগুলির গ্রন্থনে এবং নির্বাচিত সংযত বর্ণনা-নৈপুণ্যে কবি আমাদের অলৌকিকের স্থায়ী আনন্দ দিয়েছেন। এরই সঙ্গে বিপরীত ভাবে তুলনীয় **'চিররূপের বাণী'**। এ কবিতাটি কবির একটি আইডিয়ার বাহক মাত্র হয়েছে। প্রাণ এবং মনের কার্য কল্পিত চিত্রের মধ্যে গ্রথিত করা হলেও এবং শব্দবিন্যাসে সুরের আতিশয্য আরোপিত হ'লেও কাব্যচমৎকার ঘটে নি। ক্রিয়াপদকে বাক্যের অন্তর্নিবিষ্ট ক'রে এবং অন্যবিধ অলংকার যোজনা ক'রে এতে যে সুরমিশ্রণের প্রয়াস দেখা যায় তার দৃষ্টান্ত হ'ল—

এর অণুতে অণুতে আমার নৃত্য
নাড়ীতে নাড়ীতে ঝংকার,
মুহূর্তেই কি উৎসব দেবে ভেঙে,

দীর্ণ হয়ে যাবে বাঁশি,
চূর্ণ হয়ে যাবে মৃদঙ্গ,
ডুবে যাবে এর দিনগুলি
অতল রাত্রির অন্ধকারে
··· হে মহাজ্যোতি, হে চিরপ্রকাশ, হে রূপের কল্পনির্ঝর,
··· কায়ামুক্ত ছায়া আসবে আলোর বাহু ধরে
তোমার দৃষ্টির উৎসবে।
··· বায়ুসমুদ্রে ঘুরে ঘুরে চলে অশ্রুতবাণীর চক্রলহরী—
ইত্যাদি।

'ছুটির আয়োজন' অথবা 'রংরেজিনী' অতিরিক্ত অলংকরণের এই মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়েও শুধু চিত্ররচনার কৃতিত্বের উপরই কাব্য হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। 'চিররূপের বাণী'র মধ্যে একটি মহিমময় বার্তা আছে, তা হ'ল—স্থূলের উপর সূক্ষ্মের চিরন্তন জয়। 'রংরেজিনী'র ঘটনাচিত্রে অথবা ছুটির আয়োজনের নিসর্গচিত্রের পরিণামে অলৌকিক আহ্লাদ ছাড়া আর কোনো বার্তা নাই। অপরপক্ষে **'পয়লা আশ্বিন'** কবিতার বিষয়ানুষঙ্গ 'ছুটির আয়োজনে'র সজাতীয় হলেও—

ভয় কোরো না, লোভ কোরো না, ক্ষোভ কোরো না,
জাগো আমার মন,

প্রভৃতি নীতি-পরিণামে কাব্যসম্পদ হারিয়েছে।

শেষ সপ্তকের 'স্থির জেনেছিলেম' প্রভৃতি প্রথম কবিতা বিচ্ছেদ-ব্যবহিত পূর্ব-প্রণয়ের স্মৃতির উপর ক্ষণিকের রচনা। দাম্পত্য-প্রীতি সুলভ ব'লে এবং নিত্যপ্রাপ্যতা ও অধিকারবোধের সঙ্গে যুক্ত ব'লে প্রাপ্য গৌরব থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। প্রিয়ার বিয়োগই কবির অনুপলব্ধ প্রেমকে যথার্থ মহিমায় স্থাপিত করেছে—এই বিষয়টির রমণীয়তা কবিতাটিতে বাহুল্যহীন বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। বিগত প্রিয়ার কণ্ঠাভরণ কবিভাবনার বাস্তব-প্রসক্তির উপাদান-রূপে কাজ করেছে। বিচ্ছেদের কারুণ্য ফুটেছে নিম্ন বর্ণনায়—

দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত,
তুমি আস না।

আসা ক্রিয়াটিকে এখানে বক্রভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর আগের

স্তবকের বর্ণনা 'দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত' প্রভৃতির সংগতি অনুসারে এই পঙ্‌ক্তি গ্রথিত ব'লে মিলন ও বিচ্ছেদের বৈপরীত্য একসূত্রেই চমৎকার ফুটেছে। 'শরতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে স্পর্শ' এবং 'যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন' প্রভৃতি ক্ষেত্রে গদ্যচ্ছন্দের সুচারু রচনাবিন্যাসের দৃষ্টান্ত মিলবে।

দ্বিতীয় কবিতায় (একদিন তুচ্ছ আলাপের ফাঁক দিয়ে) অন্য আর একটি প্রণয়াভাসের মুহূর্ত এবং স্মৃতির মধ্যে ঐ মুহূর্তের রহস্যময় প্রভাব বিবৃত হয়েছে। অভাবনীয় চকিত স্মিতহাস্যে কবির চিত্তে যে অপরূপের ছোঁওয়া লাগল তাকেই কবি অকারণে এবং অসময়ে ফিরে পান, যেমন ফিরে পেতেন ওআর্ড্‌স্‌ওআর্থ Daffodil ফুলের সমারোহ দৃষ্টে উদ্ভূত রসাবস্থাকে। কবি তাঁর ক্ষণসঙ্গিনীর স্মিতহাস্যের গভীর আবেদনের সঙ্গে বৃষ্টিমুখর নির্জন প্রবাসে অথবা সন্ধ্যাযূথীর করুণ স্নিগ্ধ গন্ধে আকস্মিকভাবে উপলব্ধ বিরহস্বপ্নলোকের তুলনা করেছেন। অথবা বলা যায়, ক্ষণসঙ্গিনীর বিরহকাতরতাই উপযুক্ত নিসর্গ-পরিবেশে তাঁকে বিহ্বল করেছে। যাই হোক, উৎকৃষ্ট গদ্যচ্ছন্দের বাহন উত্তম গদ্যনির্মাণ কবিতাটির ক্ষণ-অনুভবকে রমণীয় ক'রে তুলেছে, যেমন—

> রেখে দিয়ে যায় কোন্ অলক্ষ্য আকস্মিক,
> আপন স্খলিত উত্তরীয়ের স্পর্শ।

প্রায় প্রতি পঙ্‌ক্তিতে রমণীয় অর্থের বাহক বিশেষণ প্রয়োগই এখানকার গদ্যকে কাব্যসীমায় উত্তীর্ণ করে দিয়েছে এমন মনে করা অসংগত হবে না। যেমন,—'আত্মবিহ্বল যৌবন', 'অভূতপূর্বের অদৃশ্য অঙ্গুলি' 'অলক্ষ্য আকস্মিক' 'বিস্ময়-উন্মনা নিমেষ' 'গোরুচরা শস্যরিক্ত মাঠ' 'সঙ্গহারা সায়াহ্ন'। তৃতীয় কবিতায় (ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন) একটি বিশেষ নিসর্গ-পরিবেশ কবিকে তাঁর প্রবুদ্ধ কৈশোরের ঐ ক্ষণবধূর একদিবসের সঙ্গস্মৃতিচারণায় নিবিষ্ট করেছে। কিশলয় যে বার্তা বহন করে তার সঙ্গে ক্ষণিকার না-বলা বাণীর সামঞ্জস্য অনুভব কবিতাটির প্রথম চমৎকৃতির বিষয়। এর দ্বিতীয় চমৎকৃতি বিচ্ছেদ-বর্ণনার ভঙ্গিতে—

> সেই একটুখানি কথা
> যা তুমিই বলতে পারতে
> কিন্তু না ব'লে গিয়েছ চলে।

'সায়াহ্নে তুমি চলে গেলে অব্যক্তের অনালোকে' বর্ণনায় নায়িকার লোকান্তর ব্যঞ্জিত হয়েছে।

কবির শেষ পর্যায়ের কাব্যের একটি বিশেষ পরিচিতি হ'ল কবির আত্ম-মনোবিকলন। একালের এই আত্মরতি কখনও শুষ্ক বিবৃতির জন্ম দিয়েছে, কখনও বা চিত্রসংকেত-প্রধান উত্তম গীতিকাব্যের। শেষ সপ্তকে কাব্যি-কতারই প্রাধান্য। 'চার' সংখ্যক ('যৌবনের প্রান্তসীমায়') কবিতায় কবির মনোবিলাস প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে ; কোনও নিসর্গ-বস্তু, কোনও স্মৃতি, কোনও ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে কবির ব্যাখ্যাবিশেষের চমৎকারিতা নয়। প্রারম্ভে দেখা যায় পরাবৃত্ত যৌবনের ভাবস্বপ্নের আবেশটুকুও কাটিয়ে উঠতে চান, ঠিক যেরকম মুক্তি চেয়েছিলেন একদা কড়ি-ও-কোমলে। কবি বলছেন—

ঝরে-পড়া ফুলের ঘনগন্ধে আবিষ্ট আমার প্রাণ,
চারদিকে তার স্বপ্নমৌমাছি
গুন গুন করে বেড়ায়,
কোন অলক্ষ্যের সৌরভে।
এই ছায়ার বেড়ায় বদ্ধ দিনগুলো থেকে
বেরিয়ে আসুক মন

কড়ি ও কোমলের "কুসুমদলের বেড়া, তারি মাঝে ছায়া" প্রভৃতি এবিষয়ে স্মর্তব্য, আর নিম্নলিখিত বিবৃতির সঙ্গে 'এস ছেড়ে এস সখি, কুসুমশয়ন' প্রভৃতির মানস-প্রবণতার সামঞ্জস্য-সাদৃশ্যও অনুধাবনযোগ্য—

সহজে দেখব সব দেখা
শুনব সব সুর,
চলন্ত দিনরাত্রির
কলরোলের মাঝখান দিয়ে।

কবিতাটিতে নিসর্গ-বর্ণনার একটি চমৎকার স্তবক রয়েছে, কিন্তু কবি নিসর্গকে একটি বৃহৎ অস্তিত্বের ধারারূপে বর্তমানে দেখছেন, এই দেখার বর্ণনায় অভি-নবতা ফুটেছে, বার্ধক্যের উপযোগী যথার্থতাও রক্ষিত হয়েছে। এই দেখাকে কবি সমাহিত ধ্যানদৃষ্টি বলেছেন, এবং যুগ যুগান্তরের মানব-ইতিহাসের পাশাপাশি প্রবাহিত সহজ প্রাণের ধারার অস্তিত্ব অনুভব ক'রে বিস্ময় বোধ করেছেন—

অতি পুরাতন প্রাণের বহুদিনের নানা পণ্য নিয়ে
এই সহজ প্রবাহ—
মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন
ভাঙন-গড়নের উপর দিয়ে
এর নিত্য যাওয়া-আসা।

যৌবনস্বপ্নের দিন শেষ হলেও নিসর্গ-রহস্যের অনুভবের পালা অবসিত হয়েছে এমন বোধ হয় কবি মনে করেন না। এখনকার বৈশিষ্ট্য হল, নিসর্গ-আত্মীয়তাও নয় সুদূর-কল্পনাও নয়, অস্তিত্বের একটি প্রবাহের সঙ্গে কবি-আত্মার যোগ সংস্থাপন। ফুল-ফোটানো নয়, ফলের দিকে কবির অভিলাষ। কবির অনুভবের রীতিও পূর্বেকার থেকে স্বতন্ত্র, যোগীর মত নিতান্ত অন্তরঙ্গ এবং বাহ্যতঃ নির্লিপ্ত—

আকণ্ঠ ডুব দেব এই ধারার গভীরে ;
এর কলধ্বনি বাজবে আমার বুকের কাছে
আমার রক্তের মৃদুতালের ছন্দে।

এসব কবিতার যেটুকু কাব্যমূল্য তা কবির এই মনোলোকের চিত্রের মধ্যেই নিহিত। পাঁচ সংখ্যক 'বর্ষা নেমেছে প্রান্তরে অনিমন্ত্রণে' এই শ্রেণীরই অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয় কবিতা। বর্ষা-ঋতুর আবির্ভাবের দৃশ্য থেকে বনস্পতির প্রাণসত্তায় বর্ষার দান এবং তা থেকে নিজ অস্তিত্বের মধ্যে ঋতু-সম্পদের ও অবকাশ-মুহূর্তের বিস্ময়কর কার্য অনুভবের রম্যতা কবিতাটির বিষয়। গদ্যরীতির সৌন্দর্য এবং ছন্দের চরণক্ষেপের সৌষম্যই কবিতাটির আকর্ষণের অন্যতম কারণ। এই সুষমা প্রথম তিন পঙ্‌ক্তিতে বর্ষার আগমন বর্ণনায়—

বর্ষা নেমেছে প্রান্তরে অনিমন্ত্রণে ;
ঘনিয়েছে সার-বাঁধা তালের চূড়ায়,
রোমাঞ্চ দিয়েছে বাঁধের কালো জলে।

এ ছাড়া রূপক-মণ্ডিত কয়েকটি চিত্রে, যেমন—

কিছু দান রেখে গেছে আমার দেহলিতে ;
জীবনের গুপ্তধনের ভাণ্ডারে
পুঞ্জিত হয়েছে বিস্মৃত মুহূর্তের সঞ্চয়।

.বহু বিচিত্রের কারুকলায় চিত্রিত

এই আমার সমগ্র সত্তা

শেষাংশে বধূর চিত্রে ফলাসক্ত কবির আত্মদিদৃক্ষা ব্যঞ্জিত হয়েছে। ছয় সংখ্যক 'দিনের প্রান্তে এসেছি' প্রভৃতি আত্মপরিচয়মূলক কবিতাটির গদ্যরীতি পরিস্ফুট ও অনতিস্ফুট খণ্ড খণ্ড রূপকে পূর্ণ। প্রারম্ভ অংশ থেকেই দেখা যাচ্ছে—গোধূলির ঘাট, পাত্র ভরা, দাম দিয়েছি, কথার হাট, প্রেমের সদাব্রত, ফুটো ঝুলি প্রভৃতি প্রতি পঙ্‌ক্তির রূপকের ফসল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কিন্তু এই ধরনের অলংকারচিত্র কাব্যের উপকার করছে না, কারণ, কল্পনার ইন্দ্রধনুর বর্ণালী থেকে এসব চিত্র বঞ্চিত। বলা যায় যে বিবৃতিমূলক নীরস ব্যাখ্যানকেই কবি রূপক প্রয়োগে স্পষ্ট করতে চান। এরকম ক্ষেত্রে কবি প্রত্যক্ষগোচর কোনও চিত্র যেখানে দিতে চেয়েছেন সেখানে বরং অনায়াসেই কাব্যরস উচ্ছলিত হয়েছে—

সেখানে দৈবে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল

জল-ভরা ঘট নিয়ে যে চলে গিয়েছিল চকিত পদে।

কবির নিজ প্রেমিক-সত্তা সম্পর্কে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কারণ বোধ হয় সাধারণের মধ্যে তাঁর কবিখ্যাতির উপর অন্যবিধ খ্যাতির প্রসার। উপসংহারে কবি ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের পূজা দৃঢ়ভাবে নিষেধ করছেন। তাঁর ধারণায় বহিরঙ্গ কর্ম ও ব্যক্তিগত নামখ্যাতি যা দেহী রবীন্দ্রনাথেব সঙ্গে যুক্ত তা ক্রমশঃ মূল্যহীন হয়ে পড়ছে অনায়াসেই। যে নিষ্ঠুর ধ্বংসের শক্তি কবির বহির্জীবনের পাথেয়কে গ্রাস করছে তারই মহিমা স্বীকার করা হয় খ্যাতিমান ব্যক্তির পুজো করলে। অতএব সব ছেড়ে রবীন্দ্রের বিশুদ্ধ কবিস্বরূপ স্মরণে রাখতে হবে। 'ধুলোয় উদাসীন বেদী' প্রভৃতি রূপকে কালের যে কর্তৃত্বে দেহ ইন্দ্রিয় মনের ধ্বংস হয় তার কথা বলা হয়েছে। এই অংশে প্রকাশিত কবির আবেগ লক্ষণীয়।

সাত সংখ্যক 'অনেক হাজার বছরের' প্রভৃতি কবিতা ব্রহ্মাণ্ডের এবং ধ্বংসসৃষ্টির মধ্য দিয়ে আবর্তিত কালচক্রের চিত্র অনুভবে মূল্যবান। ভাষার সংহতি ও গাম্ভীর্যে ক্লাসিক্যাল গুণ ও ধর্ম কবিতাটির বহিরঙ্গে ব্যাপ্ত হয়েছে। অভ্যন্তরে রয়েছে ধ্যানী কবির মহাবিশ্ব কল্পনার আগ্রহ। কল্পনায় কবি যা দেখছেন, বিজ্ঞানের প্রভাব তার পিছনে রয়েছে ব'লে এ কবিতা শুধু প্রাচ্যের প্রাচীন মননের অনুবৃত্তিমাত্র হয় নি, যেমন—

ঐ নির্মল নিঃশব্দ আকাশে
অসংখ্য কল্প-কল্পান্তরের
হয়েছে আবর্তন।
নূতন নূতন বিশ্ব
অন্ধকারের নাড়ি ছিঁড়ে
জন্ম নিয়েছে আলোকে,
ভেসে চলেছে আলোড়িত নক্ষত্রের ফেনপুঞ্জে।

এর থেকে কবি সহজেই তাঁর পূর্ব-কল্পিত এবং কল্পনায় পুনঃ পুনঃ অনুশীলিত নটরাজের ধারণায় এসেছেন। পার্থক্য এই যে রমণীয়তা-বোধ এখানে লুপ্ত হয়েছে এবং শান্তের সঙ্গে ভয়ানকের মিলিত এক ধরনের আনন্দবোধ কবিচিত্তকে আচ্ছন্ন করেছে, যেমন—

মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি।
তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে
উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে সৃষ্টি
আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে।
প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত অব্যক্তের চক্রনৃত্য
তারি নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে
তুমি আছ অবিচলিত আনন্দে।

এর সঙ্গে এবিষয়ে তাঁর পূর্ববর্তী কল্পনার সাদৃশ্য এবং পার্থক্য লক্ষ্য করার বিষয়—

নৃত্যের বশে সুন্দর হল
বিদ্রোহী পরমাণু;
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্রভানু।
... ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,
ওগো শংকর, হে ভয়ংকর,
... জীবন-মরণ-নাচের ডমরু
বাজাও জলদমন্দ্র হে।

পরিণামে কবি জন্মমরণ-ছায়ার অন্তরালবর্তী ধ্রুবের জন্য আগ্রহশীল হয়েছেন। কিন্তু কবিভাবনা ত্যাগ ক'রে তত্ত্বভাবনায় অগ্রসর হন নি। কবিতাটির

আবির্ভাবও মননবিশেষ থেকে নয়, আবিষ্কৃত প্রাচীন লোকালয়ের চিত্র এবং তার উপর নির্ভর ক'রে গঠিত কবিভাবনা থেকে। এই ভাবনায় উদ্ভাসিত বিলুপ্ত জীবনবেগের পরিচয়ে কবি প্রথমেই রমণীয় কাব্য গড়ে তুলেছেন—

তার মুখরিত শতাব্দী
আপনার সমস্ত কবিগান
বাণীহীন অতলে দিয়েছে বিসর্জন।

এই ছবি থেকেই বরঞ্চ কবি মননের মধ্যে এসেছেন—যা স্বাভাবিকও। যেমন—

যা বিকাল, আর যা বিকাল না—
দুই-ই সংসারের হাট থেকে গেল চলে
একই মূল্যের ছাপ নিয়ে।

পরিণামে অপরিমিত বিস্ময়ের কাছে কবি আত্মসমর্পণ করেছেন। ভাষণের সংযমে এবং অর্থের ঋজুতায় কবিতাটি যেমন বিশিষ্ট হয়েছে, তেমনি উল্লেখযোগ্য হয়েছে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়ের সুমিত কল্পনায়। কল্পনার ঐশ্বর্যের সংবরণ ও আত্মকেন্দ্রিকতার অবসরে এরকম কবিতা মূল্যবান নিঃসন্দেহে।

আট সংখ্যক 'মনে মনে দেখলুম' প্রভৃতি কবিতায় কবির আত্মভাবুকতার অভিব্যক্তি প্রধান হলেও, ঠিক তত্ত্ব-সন্ধান ঘটে নি, কবিমনের রমণীয় ভাবনায় জড়িত হয়েছে মাত্র। কয়েকটি চিত্র, যা থেকে কবি ঐ ভাবনার প্রেরণা পেয়েছেন, তা বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়েছে, যেমন মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষীকৃত গুহাচিত্রকর—

দুর্গম গিরিব্রজে
কোলাহলী কৌতূহলী দৃষ্টির অন্তরালে
অসূর্যম্পশ্য নিভৃতে
ছবি আঁকছে গুণী

কিন্তু আরও আকর্ষণীয় হয়েছে বসন্তের নিসর্গ-চিত্র। মূল ভাবার্থের দিক থেকে এ চিত্র গৌণ হলেও, কাব্যের দিক থেকে গৌণ নয়—

এখন প্রৌঢ় বসন্তের পারের খেয়া
চৈত্রমাসের মধ্যস্রোতে।

…উড়তি ধুলোয় আকাশের নীলিমাতে
ধূসরের আভাস,
নানা পাখির কলকাকলিতে
বাতাসে আঁকছে শব্দের অস্ফুট আলপনা।

কয়েক পঙ্‌ক্তিতে পরিণত বসন্তের সম্পূর্ণ ছবিই ধরা পড়েছে। খেয়া, স্রোত, এবং আলপনার উপমানে চিত্রের ব্যঞ্জনাধর্ম রক্ষিত হয়েছে। ভাবার্থে কবি নিজনামপ্রচারের আনন্দ থেকে নিজ-সৃষ্টির আনন্দকেই বরণীয় মনে করেছেন কাব্যানুগত যুক্তির বিস্তারে। কবিতার এই অংশের অন্য কোনও রমণীয়তাধিক্য ফুটে ওঠে নি। নয় সংখ্যক 'ভালবেসে মন বললে' প্রভৃতি কবিতায় বাচ্যার্থেরই প্রাধান্য, তবে নিজ সত্তার পুর্ণরূপকে যথার্থ ভাবে জানার এবং প্রকাশ করার আগ্রহ বৈচিত্র্যগুণে কতকটা আকর্ষণীয় হয়েছে। উপসংহার অংশের নিম্নলিখিত সারার্থ-নির্দেশ মাত্র বক্তব্য হিসেবে মূল্যবান—

অপ্রকাশের পর্দা টেনেই কাজ করেন গুণী ;
ফুল থাকে কুঁড়ির অবগুণ্ঠনে,
শিল্পী আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে ;

দেখা যায়, এরকম বক্তব্যের মাঝখানে সার্থক চিত্রের অনায়াস অবতারণা যেখানে ঘটেছে সেখানে বিবৃতি ও মননকে অতিক্রম করে কাব্যের দীপ্তি পরিস্ফুট হয়েছে, যেমন—

চারিদিকে ব্যর্থ ও সার্থক কামনার
আলোয় ছায়ায় বিকীর্ণ আকাশ।
সেখান থেকে নানা বেদনার রঙিন ছায়া নামে চিত্তভূমিতে ;
হাওয়ায় লাগে শীতবসন্তের ছোঁওয়া।

অর্থাৎ বলা যায় এখানে বাচ্যের বক্রতাগুণই পঙ্‌ক্তিগুলিকে সৌন্দর্যের সীমায় উপনীত করতে সহায়তা করেছে।

"মনে হয়েছিল আজ সব কটা দুর্গ্রহ" প্রভৃতি দশ সংখ্যক কবিতায় কবির কঠিনতম বাস্তব দুঃখ ট্র্যাজেডি-পাঠে কিভাবে রূপান্তরিত করুণরসে অভিব্যক্তি লাভ করছে সে কথা বলা হয়েছে। ট্র্যাজেডির উপলব্ধি বর্ণনায় কবিতাটি স্মরণীয় হয়েছে। এর পুর্বে মহাভারত সম্পর্কে অনুভব-বর্ণনায় আমরা কবির শান্তকরুণের উপলব্ধির পরিচয় ক্বচিৎ পেয়েছি, এখানে পাচ্ছি বিশেষভাবে। ট্র্যাজেডির ভয়ংকর দিকের অনুভব বর্ণিত হয়েছে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিতে—

কোন্ দুর্দাম সর্বনাশের

বজ্রঝঞ্ঝনিত মৃত্যুমাতাল দিনের হুহুংকার

আর এর শোচনীয়তার দিক অভিব্যক্ত হয়েছে—

কতকালের দুঃখ লজ্জা গ্লানি,

কত যুগের জ্বলৎধারা মর্মনিঃস্রাব

সংহত হয়েছে

প্রভৃতিতে। আর পরবর্তী কালের বিচারে এই ট্র্যাজেডিতে বর্ণিত জীবন-সংগ্রামের মূল্য নির্দেশিত হয়েছে নিম্নলিখিতভাবে—

নির্বাপিত বেদনার পর্বত প্রমাণ ভস্মরাশি,

জ্যোতির্হীন বাক্যহীন অর্থশূন্য।

এই শেষাংশে মহাকালের ঔদাসীন্যের ব্যঞ্জনা কবিতাটিকে কাব্যসম্পদে মূল্যবান করেছে। গদ্যচ্ছন্দে সাধারণ গদ্যের মতই কোথাও চলিতভাষা কোথাও তৎসমশব্দবহুল ব্যঞ্জনসংঘাতময় সাধুভাষা, কোথাও বা বিমিশ্র—এর অবয়বের বৈচিত্র্য সম্পাদন করে থাকে। এখানে দ্বিতীয় রীতির প্রাধান্য।

যেখানে নিসর্গ-উদ্বোধিত চিত্রগীতের প্রসার সেখানে রবীন্দ্রনাথের জুড়ি মেলা দুষ্কর। শেষ সপ্তকের আত্মমনস্তত্ত্ব-বিবৃতির মাঝে মাঝে পাওয়া এরকম দুচারটি কবিতা পাঠকের পুরাতন তৃপ্তি কিছুটা ফিরিয়ে দিতে পারে। এগারো-সংখ্যক 'ভোরের আলো-আঁধারে' প্রভৃতি স্বরূপে-অবস্থিত নিসর্গের বর্ণনে সমৃদ্ধ কবিতা। এরই মধ্যে কবির স্বগতোক্তি আশ্রয় পেয়েছে, কোনও দৃঢ়সংবদ্ধ রচনাশৈলীর অনুসরণে নয়, শিথিলভাবে এবং একালের সুদূরগামী কল্পনার রিক্ততার অধ্যায়ে স্বাভাবিকভাবেই, যেমন—

মাঠের মাঝখানকার পথে

চলেছে গোরুর গাড়ি।

কলসীতে নতুন আখের গুড়, চালের বস্তা,

গ্রামের মেয়ে কাঁখের ঝুড়িতে নিয়েছে

কচুশাক, কাঁচা আম, সজনের ডাঁটা।

ছটা বাজল ইস্কুলের ঘড়িতে।

ঐ ঘণ্টার শব্দ আর সকালবেলাকার কাঁচা রোদ্দুরের রং

মিলে গেছে আমার মনে।

এর পর কম ক'রে চল্লিশ পঙ্‌ক্তি একই রীতিতে প্রত্যক্ষ নিসর্গের

স্বভাবোক্তি-প্রধান রমণীয় বর্ণনার পর কবির আত্মমনোভাবের পরিচয় গ্রথিত হয়েছে উপসংহারে—

আজকের এই সকালটুকুকে
ইচ্ছে করেছি রেখে দিতে।

প্রভৃতি। ব্যঞ্জনায় কবিচিত্তের বিশুদ্ধ আনন্দের প্রতি আগ্রহ ব্যক্ত হয়েছে। তবু কবির আত্মভাব-প্রকাশের চেয়ে ঐ স্বভাবোক্তিময় নিসর্গই আকর্ষণীয় হয়েছে।

বারো-সংখ্যক 'কেউ চেনা নয়' কবির পূর্বপরিচিত রোম্যান্টিক অনুভবের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করছে, কিন্তু কবিতা হিসেবে হয়েছে ব্যাখ্যানধর্মী। অর্থাৎ মানুষের প্রত্যক্ষতার অন্তরালে যে অপ্রত্যক্ষ রয়েছে তার উপলব্ধি কবির গদ্যে উপস্থাপিত করলে যা হওয়া স্বাভাবিক এখানে ছন্দোবদ্ধ হওয়াতেও তা-ই হয়েছে। কল্পনাবৃত্তির চেয়ে স্মরণ এবং বর্ণন প্রাধান্য পেয়েছে—

চোখ বলে,
যা দেখলুম, তুমি আছ তাকে পেরিয়ে
মন বলে,
চোখে-দেখা কানে-শোনার ওপারে যে রহস্য
তুমি এসেছ সেই অগমের দূত—

বৈশিষ্ট্য এনেছে কবির নিজের মধ্যেও অচেনার রহস্য অনুভবের সংবাদ যে-অনুভব 'তিলে তিলে নোতুন হোয়'। বহু পূর্বে 'অন্তর্যামী' কবিতায় এই আত্ম-অনুভবেরই বিলাসের স্পর্শ আমরা পেয়েছি। এই ভাবার্থের পরবর্তী 'রাস্তায় চলতে চলতে বাউল এসে থামল' প্রভৃতি কবিতা বরং ব্যক্তিরূপচিত্রের অনুগামী হওয়ায় কিছু রমণীয়তার সঞ্চার করেছে—

তুমি তখন স্নানের পরে এলোচুলে
দাঁড়িয়েছিলে জানালায়।
অধরা ছিল তোমার দূরে-চাওয়া চোখের
পল্লবে,
অধরা ছিল তোমার কাঁকন-পরা নিটোল হাতের
মধুরিমায়।

এখানে কাব্যের স্ফূর্তি ঘটেছে অবিসংবাদিতভাবে। এই রমণীর অন্তর-বাহির মিলিয়ে কবি একে একতারার সঙ্গে তুলনা করেছেন, আবার খাঁচার পাখির

সঙ্গেও। কিন্তু এ তুলনা বা চিত্রযোজনা কাব্য-অনুভবের মধ্য দিয়ে অনায়াসে আসেনি, কবির বোধের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে। বস্তুতঃ,

'সেই যন্ত্র তোমার রূপের খাঁচা
দোলে বসন্তের বাতাসে।'

অথবা, 'মিলনের খাঁচায় থাক,
নানা সাজের খাঁচা।'

এসব উপমান ঐ আদিরসগত সৌন্দর্যের সঙ্গে সর্বথা অসংলগ্ন। কবির চিত্র-গীতময় অনুভব এখানে বোধ-পরিণামের দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে। চোদ্দ-সংখ্যক কবিতায় একটি প্রণয়-মুহূর্তকে স্মরণ করায় কবির স্বানুভব বিস্তার লাভ করেছে। অবশ্য সেকালের অনুভব একালের বিশেষ আনন্দ-অমৃত-বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে এবং শব্দ-স্পর্শ-রূপের উত্তরলোকের অর্থপূর্ণ সারনিষ্কর্ষের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন কবি—

সেই মুহূর্তের আনন্দবেদনা
বেজে উঠল কালের বীণায়,
প্রসারিত হ'ল আগামী জন্মজন্মান্তরে।
সেই মুহূর্তে আমার আমি
তোমার নিবিড় অনুভবের মধ্যে
পেল নিঃসীমতা।

ঐ নিমেষের অনুভবকেই অনন্ত ক'রে অতিশয়িত ক'রে দেখে বাস্তব প্রয়োজন-সীমার জগৎকে নিম্নলিখিতভাবে নগণ্য ক'রে তুলেছেন কবি—

এই নিমেষটুকুর বাইরে আর যা-কিছু
সে গৌণ।
এর বাইরে আছে মরণ,
একদিন রূপের আলো-জ্বালা রঙ্গমঞ্চ থেকে
সরে যাবে নেপথ্যে।

তবু এরকম ভাষণ পাঠকের কাছে কবি-পরিচয়ের সংবাদমাত্র, এর ভূমিকায় এমন চিত্রনির্মাণ নেই যা ইন্দ্রজালবৎ পাঠককে মোহাবিষ্ট ক'রে রাখতে পারে কিছুক্ষণ। শেষ সপ্তকের পনেরো-ষোলো-সতেরো প্রভৃতি কবিতায়ও নিজ মনোলোকের পরিচয় দেওয়ার জন্যে কবির আগ্রহ ব্যক্ত হয়েছে।

উনিশ কবিতায় অপ্রাপণীয়কে পাওয়ার এবং স্বপ্নের প্রতি আসক্ত কবির কল্পনাবৃত্তির সংকোচের পরিচয় পাই তাঁর নিজেরই কথায়—

মনের রসনা থেকে
অজানার স্বাদ গেছে মরে
অনুভবে পাইনে
ভালোবাসায় সম্ভবের মধ্যে
নিয়তই অসম্ভব,
জানার মধ্যে অজানা,
কথার মধ্যে রূপকথা।
ভুলেছি প্রিয়ার মধ্যে আছে সেই নারী,
যে থাকে সাত সমুদ্রের পারে

এই তথ্যবিবৃতির প্রারম্ভে স্মৃতিলীন রোম্যান্‌টিক সংস্কারের উদ্বোধনের মুহূর্তে অবশ্য চিত্রের সঙ্গে ভাবসংগীতের যে মিশ্রণ ঘটেছে তাতেই সৌন্দর্যের ক্ষণিক স্ফুরণ অনুভূত হয়েছে—

আকাশে সন্ধ্যার প্রথম তারা
দূরে মাঠের সীমানায় দেখা যায়—
একটিমাত্র ব্যগ্র বিরহী আলো একটি কোন্ ঘরে
নিদ্রাহীন প্রতীক্ষায়।

বিশ সংখ্যক ('সেদিন আমাদের ছিল খোলা সভা') কবিতায় কবি তাঁর চিরাচরিত মর্ত্য-অনুরাগ অরূপ-বিলাস প্রভৃতির রচনাকে অপ্রতিপন্ন ক'রে ঔদাসীন্য এবং বৈরাগ্যের সংগীতে দীক্ষা নিতে চাইছেন। গীতিকবিতা কবির মেজাজের এবং দৃষ্টিকোণের পার্থক্য বহন করে মাত্র, বড কবির ক্ষেত্রেও একথা অনেক সময় সত্য! এই কবিতার প্রথম অংশে অভ্যস্ত রীতির কবিতাকে নিম্নলিখিত বক্রভাবে কবি বর্ণনা করছেন—

এরা সব অন্তঃপুরিকা,
রাঙা অবগুণ্ঠন মুখের 'পরে;
তার উপরে ফুলকাটা পাড়,
সোনার সুতোয়।
রাজহংসের গতি ওদের,
মাটিতে চলতে বাধা।

এরকম বিলাসবৈচিত্র্যের বিপরীত-কোটির, বোধ হয় ঠিক কবিতা নয়, নিরাভরণ অনুশাসনবাক্যের মত রচনার প্রতি আকস্মিক অনুরক্তি প্রকাশ ক'রে এগুলিকে ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত ক'রে কবি বলছেন—

এই পথের ধারের সভায়
আসতে পারে তারাই
সংসারের বাঁধন যাদের খসেছে,
খুলে ফেলেছে হাতের কাঁকন
মুছে ফেলেছে সিঁদুর ;
···কত রৌদ্রতপ্ত দিনে
কত অন্ধকার অর্ধরাত্রে
যাদের কণ্ঠ প্রতিধ্বনি জাগিয়েছে
অজানা শৈলগুহায়—
জনহীন মাঠে,
পথহীন অরণ্যে।

কবির সহজ, নিরলংকার এবং অন্তঃসারসম্মিত বচনের প্রতি এই আগ্রহের সঙ্গে একালের নব কাব্য-প্রবৃত্তি তুলনা করে দেখা যেতে পারে, আর একথাও মনে করা যেতে পারে যে মুষ্টিমেয় রসিকগোষ্ঠীর চেয়ে আপামর জনসাধারণের সঙ্গে, সুন্দরের চেয়ে মঙ্গলের সঙ্গেই অধিকতর ঘনিষ্ঠতা চাইছেন। ছয়, সাত, আট প্রভৃতি সংখ্যার কবিতায়ও কবির এই উদাসীনতার পরিচয় দেখা গিয়েছে।

একুশ-সংখ্যক 'নূতন কল্পে' প্রভৃতি কবিতায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণার ও ইতিহাসের তথ্যের সঙ্গে মহাকালের কল্পনা মিশ্রিত ক'রে কবি পৃথিবীর ক্ষুদ্রতা এবং মানুষের রাষ্ট্রিক কলহ এবং রাজত্বের কীর্তিকে নগণ্য অনুভব করেছেন, আর সেই সঙ্গে নিজ কাব্যগত ক্ষণিক রমণীয়তার মুহূর্তগুলিকেই অনন্ত ক'রে দেখেছেন। রবীন্দ্র-কবিস্বভাবে এ কোনও নূতন অনুভব নয়, কিন্তু বর্ণনে নূতন এবং Sublimeএর প্রতি আগ্রহে আকর্ষণীয়। ব্রহ্মাণ্ডে নক্ষত্র-নীহারিকায় ব্যাপ্ত ধ্বংস এবং সৃষ্টির লীলা এবং তার কাছে মানুষের যাবতীয় কীর্তির নিরর্থকতার উপস্থাপনই যে রীতিবিশেষের আশ্রয়ে ধ্রুপদধর্মী রম্যতার কারণ হয়েছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এই রম্যতার পরিচয় ফুটেছে প্রথমত মহাকাশের মধ্যে জীবন-মৃত্যুর খেলা বর্ণনায়—

কোন্ কেন্দ্রে জ্বলছে সেই মহা আলোক
যার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্যে
হয়েছে উন্মত্তের মতো উৎসুক।
আয়ুর অবসান খুঁজছে আয়ুহীনের অচিন্ত্য রহস্যে।

এরই সঙ্গে পার্থিব কীর্তির চিত্রকে একত্র স্থাপন করায় চমৎকারের আবির্ভাব ঘটেছে—

বুদ্‌বুদের মতো উঠল মহেঞ্জোদারো,
মরুবালুর সমুদ্রে নিঃশব্দে গেল মিলিয়ে।
সুমেরিয়া, আসীরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর,
দেখা দিল বিপুল বলে
কালের ছোটো-বেড়া-দেওয়া
ইতিহাসের রঙ্গস্থলীতে।

আর হয়েছে ক্রমোৎকর্ষের নীতিতে গ্রথিত নির্লিপ্ত দৃষ্টির পরিচায়ক নিচের পঙ্‌ক্তিত্রয়ে—

ভেঙে পড়েছে যুগের জয়স্তম্ভ,
নীরব হয়েছে কবির মহাকাব্য,
বিলীন্ হয়েছে আত্মগৌরবে স্পর্ধিত জাতির ইতিহাস।

বাইশ-সংখ্যক 'শুরু হতেই আমার সঙ্গ ধরেছে' প্রভৃতি কবিতায় বার্ধক্যের অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে। একে মনন-দর্শন প্রভৃতির প্রকাশ রূপেও কেউ দেখতে পারেন, কিন্তু এর মধ্যে কবির স্বকীয় অভিজ্ঞতার পরিচয়ও স্পষ্ট। এ হ'ল কবি-সংস্পর্শে আমাদের বহুপরিচিত বাইরের স্বরূপ এবং অন্তরাত্মার মর্মবস্তুর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। একদিকে সুখদুঃখে ও আশানৈরাশ্যে ক্ষুব্ধ কৌমার-যৌবন-জরায় পীড়িত বাইরের আমি, আর অন্যদিকে অনন্ত জীবনের অভিলাষী জরামরণহীন অন্তরসত্তা। এই বহিঃস্বরূপের বর্ণনায় তাকে ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত ক'রে বিশিষ্ট রূপ দান করার মধ্যে চমৎকার ফুটেছে, যেমন—

ও যাক্ ঐখানে দ্বারের বাইরে—
ঐ বৃদ্ধ, ঐ বুভুক্ষু।
ও ভিক্ষা করুক, ভোগ করুক,

তালি দিক ব'সে ব'সে
ওর ছেঁড়া চাদরখানাতে।

কবিচিত্তের উচ্ছলতার স্পর্শ পাচ্ছি নিম্নলিখিত আত্মস্বরূপ-কথনের বৈশিষ্ট্যে—

মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি-উৎসের আনন্দ-ধারা আমি —ইত্যাদি

আত্মসত্তাকে এইভাবে পৃথক ক'রে দেখার এবং দেখে বিস্ময় অনুভবের অনুরণন চলেছে তেইশ সংখ্যাতেও। এ যেন ঐ অনুভূতির অবস্থাকে এবং কবি-আত্মাকে নিরীক্ষণ করার বিস্ময়। কবি বলছেন—

আপনাকে দেখছি আপনার বাইরে—
অন্য যুগের অজানা আমি
অভ্যস্ত পরিচয়ের পরপারে।

এ সব কবিতায় পাঠকের শব্দার্থ-রমণীয় আনন্দের স্বাদ দুর্লভ, অর্থবাহিত ঔৎসুক্যের উদ্বোধই প্রধান। কবি যে-ভাবলোকে পাঠককে সঙ্গী করতে চাইছেন তাকে আধ্যাত্মিক বলা যেতে পারে। নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে কবি যে-অর্থ জাগাতে চাইছেন তা তাঁর পূর্বলিখিত 'প্রবাসী' কবিতার 'সে-দুয়ার-খুলি কবে কোন্ ছলে বাহির হয়েছি ভ্রমণে' প্রভৃতির বাচ্যের সমকক্ষ হ'লেও ইঙ্গিতের চেয়ে সংবাদই অধিক বহন করছে এবং দেহ ও আত্মা, বাসনা-কামনা ও নির্লিপ্ত-সুখানুভব প্রভৃতির তত্ত্বের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে—

আমার এতকালের কাছের জগতে
আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি দূরের পথিক।
তার আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য।

কবি আধ্যাত্মিক বোধে উদ্দীপ্ত হয়েই যে তুচ্ছ সাধারণ অনাদৃতের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন—কতকটা ওআর্ডস্‌ওআর্থের মত—তার পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলিতে—

আমার নগ্ন চিত্ত আজ মগ্ন হয়েছে
সমস্তের মাঝে।
জনশ্রুতির মলিন হাতের দাগ লেগে

যার রূপ হয়েছে অবলুপ্ত,
যা পরেছে তুচ্ছতার মলিন চীর
তার সে জীর্ণ উত্তরীয় আজ গেল খসে।
দেখা দিল সে অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে।
দেখা দিল সে অনির্বচনীয়তায়।
যে বোবা আজ পর্যন্ত ভাষা পায়নি
জগতের সেই অতি প্রকাণ্ড উপেক্ষিত
আমার সামনে খুলেছে তার অচল মৌন

সুতরাং বলা যেতে পারে গদ্যচ্ছন্দের রচনা-পর্যায়ে কবির দৃষ্টিকোণের যে দিক্-পরিবর্তন দেখা যায় তার কারণ লোকায়ত বাস্তব নয়, এই ধরনের অধ্যাত্ম। 'ছাব্বিশ' সংখ্যার কবিতা দেখা যাক্।

এ কবিতাটিতে কবি তাঁর অস্তিত্বের মধ্যেকার দুটো বিভাগের কথা তুলেছেন—প্রাত্যহিকতা ও প্রয়োজনের দায় মেনে চলা এবং সে দায় থেকে মুক্ত অন্য এক ধরনের অস্তিত্ব। এই দ্বিতীয় অস্তিত্বের বর্ণনা কবি যে-ভাষায় দিয়েছেন তাতে তাঁর পুর্ব-অভিজ্ঞাত রোম্যান্‌টিক অর্থাৎ কল্পনাপ্রবণ সুদূর স্পৃহাই ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু নিশ্চয়তার বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রায় অধ্যাত্মকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে—

বিপুল ঔৎসুক্য আমাকে বহন করে নিয়ে যায়
সুদূরে ;
বর্তমান মুহূর্তগুলিকে
অবলুপ্ত করে কালহীনতায়।
যেন কোন্ লোকান্তরগত চক্ষু
জন্মান্তর থেকে চেয়ে থাকে
আমার মুখের দিকে—
চেতনাকে নিষ্কারণ বেদনায়
সকল সীমার পরপারে দেয় পাঠিয়ে।

অবশ্য কবি যাকে সীমা বলছেন এবং যাকে সীমার পরপার বলে নির্দেশ করছেন তার সঙ্গে আমাদের পুর্ব-জ্ঞাত তত্ত্বাদির মিল পাওয়া দুষ্কর। কবির অসীম তাঁর সীমিত চিত্তেরই একটা ভাবাবস্থা, এখানে কল্পনাকে অতিক্রম

ক'রে ধ্যানের নিবিষ্টতায় সমাহিত হতে চাইছে। প্রারম্ভে মহাকাশের চিত্রময় বর্ণনায় কবি-মনোভাবের পরিচয়ের সঙ্গে কাব্যের স্বাদ কিছু পাওয়া যায়—

দেশকালের সেই বিপুল আনুকূল্যে
তারায় তারায় নিঃশব্দ আলাপ,
তাদের দ্রুতবিচ্ছুরিত আলোক-সংকেতে
তপস্বিনী নীরবতার ধ্যান কম্পমান।

এই ধরনের আত্মবোধ, আত্মপরিচয়দান এবং দার্শনিকতায় আভাসিত নিজ ব্যক্তিসত্তার বর্ণন শেষ সপ্তকে আরও দুচারটি কবিতায় রয়েছে এবং 'শেষ লেখা' পর্যন্ত বহু কবিতাতেই তা সুলভ, হয়ত স্বাভাবিকও। পঁয়তাল্লিশ সংখ্যক কবিতায় বার্ধক্যের এই অনুভবের সহজ প্রকাশ দেখছি অব্যক্তের মধ্যবর্তী নিজ জীবনকে দেখায়—

সেই একটি-আধখানা আমার মধ্যে আজ ঠেকেছে
আপন প্রান্তরেখায় ;
দুইদিকে প্রসারিত দেখি দুই বিপুল নিঃশব্দ,
দুই বিরাট আধখানা,—

'পঁচিশে বৈশাখ'কে নিয়ে লেখা একালের কবিতাগুলিতেও একমাত্র রমণীয় সৌন্দর্যের বিবৃতি অংশগুলি ছাড়া সর্বত্রই জন্মমৃত্যুর রহস্যানুভব প্রকাশ পেয়েছে। এগুলি নিয়ে আমাদের তেমন আলোচনার প্রয়োজনীয়তা কিছু নেই।

শেষ সপ্তকের কয়েকটি কবিতায় কবিচিত্তের বিশুদ্ধ ও সহজ সৌন্দর্য-ভাবুকতার স্পর্শে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। সাতাশ সংখ্যক 'জলভরা' কবিতায় কবি নিজের উপর উদাসিনী গ্রামবধূর মন ও কার্য আরোপ ক'রে পূর্বেকার প্রয়োজনহীন নিসর্গ-ভাবুকতারই পরিচয় দিয়েছেন ('খেয়া' দ্রষ্টব্য)। গদ্যচ্ছন্দে হ্রস্ব চরণে যথাস্থিত নিসর্গের রূপ যে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে এ আমরা কোপাই, খোয়াই, ময়ূরাক্ষীতে দেখেছি ; এখানেও তার দৃষ্টান্ত স্মরণীয় হয়েছে—

রাঙা ছিল সকালবেলাকার
নতুন রৌদ্রের রঙ,
উঠল সাদা হয়ে।
বক উড়ে চলেছে পাহাড় পেরিয়ে
জলার দিকে,

শঙ্খচিল উড়ছে একলা
ঘন নীলের মধ্যে,
ঊর্ধ্বমুখ পর্বতের উধাও চিত্তে
নিঃশব্দ জপমন্ত্রের মতো।

এ ছবি আমরা পুনঃপুনঃ দেখেছি হয়ত, কিন্তু কবির শব্দার্থের মধ্য দিয়ে নূতন ক'রে দেখলাম। আটাশ সংখ্যক 'শুকতারা' কবিতাটি তত্ত্বহীন রম্য অনুভবের উত্তম দৃষ্টান্ত। কবিতাটিতে লৌকিক এবং বৈজ্ঞানিক দুই দৃষ্টিকোণ থেকেই শুকতারাকে দেখা হয়েছে, আর কবিচিত্ত স্বাভাবিকভাবে শুকতারার পরিচিত মানবিক সম্পর্ককে উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরেছে। গদ্যচ্ছন্দের ঋজু ও সংযত বর্ণন-ভঙ্গির সৌন্দর্য-বিষয়েও কবিতাটি দৃষ্টান্তের কাজ করছে—

সূর্যবন্দনার প্রদক্ষিণপথে
তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী,
রবিরশ্মিগ্রথিত দিনরত্নের মাল্য
দুলছে তোমার কণ্ঠে।

কিন্তু এই বিজ্ঞান-বীক্ষিত গ্রহসত্তার বর্ণনার মধ্যেই বিস্ময়রসের স্পর্শ পাওয়া যায়, যেমন—

আজ আসন্ন রজনীর প্রান্তে
কবিচিত্তে যখন জাগিয়ে তুলেছ
নিঃশব্দ শান্তিবাণী
সেই মুহূর্তেই
আমাদের অজ্ঞাত ঋতুপর্যায়ের আবর্তন
তোমার জলে স্থলে বাষ্পমণ্ডলীতে
রচনা করছে সৃষ্টিবৈচিত্র্য।

শুকতারা সম্পর্কে লৌকিক অনুভবের রম্য পরিচয়ের মধ্যে আমাদের জীবন-সম্পর্ক গ্রথিত হয়েছে বলেই এই অংশ সমধিক রমণীয় হয়েছে, কেবল সৌন্দর্য-বর্ণনায় এ চমৎকার ফুটত না—

সুপ্তিসমুদ্রের এপারে ওপারে
চিরজীবন
সুখদুঃখের আলোয় অন্ধকারে

মনের মধ্যে দিয়েছ
আলোকবিন্দুর স্বাক্ষর।

অথবা,

প্রভাতে মানব-পথিককে
নিঃশব্দ সংকেত করেছ
জীবনযাত্রার পথের মুখে,
সন্ধ্যায় ফিরে ডেকেছ
চরম বিশ্রামে।

ঊনত্রিশ সংখ্যক 'অনেককালের একটিমাত্র দিন' অনুরাগের সংস্কারকে অবলম্বন ক'রে কবির স্বপ্নের বাস্তবতা প্রকাশ করছে। জীবন-সম্পর্কের মধ্যে মানুষকে যেভাবে দেখা যায় বা অনুভব করা যায়, মৃত্যুর পর তার ছবি স্মৃতিতে, কল্পনায় এবং স্বপ্নে সেভাবে ধরা পড়ে না। তার একটি বিশেষ মূর্তি এবং বিশেষ ভাবুকতাই বিরহীর চিত্ত ঘিরে থাকে। এ পরিস্থিতি বাস্তব ও যথার্থ। মিশ্র করুণরস কবিতাটির কাব্যবীজ, কিন্তু চিত্রসমন্বিত প্রকাশই ঐ করুণকে ঘনীভূত করেছে। উপসংহারে গ্রথিত সেই চিত্রটি হ'ল—

স্তব্ধ সে দাঁড়িয়ে আছে
ছায়া-আলোর বেড়ার মধ্যে,
মনে হচ্ছে কী একটা কথা বলবে,
বলা হ'ল না,—

এর সঙ্গে পুরবীর 'ক্ষণিকা' কবিতার পূর্ব-প্রদর্শিত 'সে মূর্তি ফিরিছে কাছে কাছে' প্রভৃতি মাত্র ভাবার্থের দিক দিয়ে তুলনীয়। কবিতাটির সংক্ষিপ্ত নিসর্গ-বর্ণনের মধ্যে মৌলিক উৎপ্রেক্ষা নির্মাণের একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়—

চৈত্রের রৌদ্রে আর সর্ষের খেতে
কবির লড়াই লাগল যেন
মাঠে আর আকাশে।

ত্রিশ সংখ্যার কবিতাতেও এই বিরহস্মৃতির অনুবৃত্তি চলেছে। কাব্যস্বপ্ন ও বাস্তব এর মধ্যে একাকার হয়ে পড়েছে। 'পুরবী'তে দৃষ্ট অনুসন্ধানতৎপরতার স্পর্শ এর ভূমিকায় রয়েছে—

আমি যে খুঁজে বেড়াই
সে তো আমার ছিন্ন জীবনের

সবচেয়ে গোপন কথা ;
ও-কথা হঠাৎ আপনি ধরা পড়ে
যার আপন বেদনায়,
আমি জানি
আমার গোপন মিল আছে তারি ভিতরে।

"ফুলের পাপড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে" প্রভৃতির সঙ্গে 'ক্ষণিকা' কবিতার—

ছিন্ন ফুল, এ কি মিছে ভান ?
কথা ছিল শুধাবার, সময় হ'ল যে অবসান।

প্রভৃতি বর্ণনা তুলনীয়। কিন্তু শেষ সপ্তকের এই কবিতাটিতে বিরহকাতরতা তেমন প্রসারলাভ করেনি, না-বলা বাণীর ব্যাকুলতাও নয়। এ শুধু কাব্যময় প্রণয়ের মানস-পরিস্থিতির পরিচয় বহন করছে। একত্রিশ সংখ্যক "পাড়ায় আছে ক্লাব" এই বিরহিত স্মৃতিচারণাকে বাস্তবের আশ্রয়ে অত্যন্ত স্মরণযোগ্য করেছে। কবি যে-হারানো প্রণয়ের ছবি তুলে ধরেছেন তার সঙ্গে কল্পনা বা আদর্শ যোগ না করায় রমণীয় বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের সহজ চারুতা ঘটেছে। লোকান্তরিত প্রিয়তমা পরিচিত পরিবেশের মধ্যে অনুভূত হওয়ার ফলে যে একটি রহস্যময় নিবিড় মুগ্ধাবস্থার সৃষ্টি হয়, তার বর্ণন কবিতাটিকে অতি-প্রাকৃতেরও মূল্য দিয়েছে—

হঠাৎ ঝরঝরিয়ে উঠল হাওয়া
গাছের ডালে ডালে,
জানালাটা উঠল শব্দ ক'রে,
দরজার কাছের পর্দাটা
উড়ে বেড়াতে লাগল অস্থির হয়ে।
আমি ব'লে উঠলেম,
"ওগো, আজ তোমার ঘরে তুমি এসেছ কি
মরণলোক থেকে
তোমার বাদামি রঙের শাড়িখানি পরে ?"
একটা নিঃশ্বাস লাগল আমার গায়ে।

"সেই আমার চিরকিশোর বঁধু" প্রভৃতির সঙ্গে পুরবীর কয়েকটি কবিতার বর্ণনা মিলিয়ে দেখা যায়। নিঃসন্দেহে এই নারীই মৃত্যুর পর অশরীরী সৌন্দর্যময়ী

বা সৌন্দর্যের দূতী হিসেবে রূপান্তরিত হয়ে কবির বহু কবিতায় প্রতিভাত হয়েছেন।

শেষ সপ্তকের স্মরণীয় কবিতাবলীর আলোচনা ক'রে এখন আমরা পরবর্তী কবিতাপথ-পরিক্রমায় দ্রুত পদক্ষেপ করছি। গদ্যচ্ছন্দের রচনায় শব্দার্থ-নির্মাণের নিত্যনবীনতা অবিদ্যমান। সৌন্দর্য নির্ভর করে প্রধানত ভাবগত রমণীয়তা, পরে বিন্যাসগত পারম্পর্য এবং গদ্যের স্টাইলবিশেষের উপর। অবশ্য ছন্দোরীতির একটি ব্যাপক মহিমা সর্বত্র প্রচ্ছন্ন থাকেই। সুষম চরণবিন্যাস এবং চরণ থেকে চরণান্তরে ছন্দের সুরধর্ম প্রবাহিত করার সহজ কৌশলের উপর এই ছন্দ দাঁড়িয়ে থাকে। একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। ফলে গদ্যচ্ছন্দে রচনার ভাবগত রমণীয়তা অথবা তুচ্ছতা এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বাক্‌কৌশলের পরিচয় চিহ্নিত করলেই এর সৌন্দর্য-বিশ্লেষণ কার্যের সমাধান হতে পারে।

পত্রপুটের কবিতাগুলি কবির খুব প্রগল্‌ভ রচনা, প্রায়-ব্যঞ্জনাহীন, পরিস্ফুট এবং সম্পূর্ণ রচনা। এর বিশ্লেষণ-ধর্মিতায় পুনরুক্তির প্রশ্রয়ও ঘটেছে পুনঃপুনঃ, ক্বচিৎ অতিকথনের। যেমন—

কতবার ভেবেছি গেঁথে রাখব
    ভারতীর গলার হারে ;
সাহস করি নি,
    ভয় হয়েছে কুলোবে না ভাষায়,
ভয় হয়েছে প্রকাশের ব্যগ্রতায়
    পাছে সহজের সীমা যায় ছাড়িয়ে।

এর শেষ তিন চরণ অপ্রয়োজনীয়। আবার নিচের অংশের শেষের দিকে অতিকথন—

আমার মনের মধ্যে ছুটি নেমেছে
    যেন পদ্মার উপর শরতের শেষ প্রশান্তি।
বাইরে তরঙ্গ গেছে থেমে,
    গতিবেগ রয়েছে ভিতরে।
সাঙ্গ হ'ল দুই তীর নিয়ে
    ভাঙন-গড়নের উৎসাহ।

ছোটো ছোটো আবর্ত চলেছে ঘুরে ঘুরে
আনমনা চিত্তপ্রবাহে ভেসে-যাওয়া
অসংলগ্ন ভাবনা।

এই অতিভাষণ-দোষ তিন সংখ্যার "আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী" প্রভৃতি বিখ্যাত পৃথিবী-প্রণামের কবিতাটিতেই প্রবল হয়েছে। যেমন—

তবু সেই আদিম বর্বর আঁকড়ে রইল তোমার ইতিহাস।
ব্যবস্থার মধ্যে সে হঠাৎ আনে বিশৃঙ্খলতা,
তোমার স্বভাবের কালো গর্ত থেকে
হঠাৎ বেরিয়ে আসে এঁকেবেঁকে।
তোমার নাড়ীতে লেগে আছে তার পাগলামি।

ইত্যাদি বর্ণনার পর পুনশ্চ দানবদলনের মন্ত্রের কথা এবং "তবু তোমার বক্ষের পাতাল থেকে আধপোষা নাগদানব" প্রভৃতি বর্ণনায় স্পষ্ট পুনরুক্তি। অথবা যেমন, "বিরাট প্রাণের, বিরাট মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার" প্রভৃতি বর্ণনার পরই—

অগণিত যুগযুগান্তরের
অসংখ্য মানুষের লুপ্ত দেহ পুঞ্জিত তার ধুলায়।

প্রভৃতিতে একই কথা বলা হয়েছে। নিঃসন্দেহে পত্রপুটের কবিতাগুলির মধ্যে আবেগের প্রাবল্য ঘটেছে। শেষ সপ্তকে আবেগ-উচ্ছ্বাস এইভাবে সীমা অতিক্রম করেনি। পত্রপুটের কবিতাগুলির চরণবিন্যাসে দীর্ঘতাও এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়।

শেষ সপ্তকের মত কিছু নূতন ধরনের অলংকরণ বা সৌন্দর্য- নির্মাণ পত্রপুটেও রয়েছে। যেমন, প্রথম কবিতাতেই—

(১) পশ্চিমের দিগ্‌বলয়ে
সুরবালকের খেলার অঙ্গনে
স্বর্ণসুধার পাত্রখানা বিপর্যস্ত,
পৃথিবী বিহ্বল তার প্লাবনে।

(২) সামনে পূর্ণচন্দ্র,
বন্ধুর অকস্মাৎ হাস্যধ্বনির মতো।
যেন সুরলোকের সভাকবির
সদ্যোবিরচিত কাব্যপ্রহেলিকা
রহস্যে রসময়।

তা ছাড়া—

(৩) প্রান্তরে আপন ছায়ায় মগ্ন একলা অশথ গাছ,
সূর্যমন্ত্র-জপ-করা ঋষির মতো।

(৪) রাস্তায়-চলা ব্যস্ত যে পৃথিবী
এখন আঙিনায় আঁচল-মেলা তার স্তব্ধ রূপ।
লক্ষ্য নেই কাছের সংসারে,
শুনছে তারার আলোয় গুঞ্জরিত পুরাণকথা।

(৫) ফুলগুলি যেন আলো পান করবার
শিল্প-করা পেয়ালা. বেগুনি রঙের।

(৬) সূর্যাস্তসীমার রঙিন পাঁচিল ডিঙিয়ে
ব্যস্ত বেগে বেরিয়ে পড়ল মেঘের ভিড়।

(৭) আমি-বনস্পতির এরা কিরণ-পিপাসু পল্লবস্তবক,
এরা মাধুকরী-ব্রতীর দল।

—ইত্যাদি

'পত্রপুট' ভাষার আতিশয্যে এবং আবেগের আধিক্যে সংহতিহীন রচনার নিদর্শন হলেও, কেন্দ্রাতিগ নয়; আর ভিন্ন দিক থেকে এ স্বতঃস্ফূর্ত ও শক্তিমতী লেখনীর প্রকাশ।

'আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী' পৃথিবী-সম্পর্কে কবির বিস্ময়-মিশ্রিত কল্পনার স্পর্শে আকর্ষণীয় হয়েছে। এর রসকে বিস্ময়রস বলা যেতে পারে মুখ্যভাবে। শেষ ভাবার্থে দুঃখের মূল্যে মানুষকে মহৎ করার উপলব্ধি প্রকাশিত হওয়ায় বীররসেরও স্পর্শ এর মধ্যে মিশ্রিত হয়েছে। তা ছাড়া বিস্ময় পরিপুষ্ট হয়েছে ভয়ানক এবং শান্তের সাহায্যে। যেমন, "একদিকে আপকধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র" প্রভৃতিতে শান্ত এবং "পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য" প্রভৃতিতে ভয়ানক। এ ছাড়া পৃথিবীর ঔদাসীন্যের চিত্রের মধ্যেও শান্তের অনুভব কাজ করেছে, যেমন—

বিনা বেদনায় বিছিয়ে এসেছ তোমার বর্জিত সৃষ্টি
অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে।

দুঃখ অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হওয়ার মধ্যেই মানুষের মহিমা এবং পৃথিবী তার রূপবৈচিত্র্যে মানুষকে আত্মবিকাশের অবকাশ দিয়েছে, অতএব পৃথিবী ধন্যা এবং প্রণম্যা—এরকম ভাবার্থ এর কাব্যবীজ হলেও, কল্পনা ও বর্ণনার

অসাধারণত্বেই মুখ্যতঃ কবিতাটির সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা, ভাবমূল্যে গৌণভাবে। কবির পূর্বরচিত 'বসুন্ধরা' কবিতার বা অন্যত্র প্রকাশিত পৃথিবী-অনুরক্তির সঙ্গে এখানকার বন্দনাবহুল মনোভাবের পার্থক্যও লক্ষণীয়। 'বসুন্ধরা'য় কবির অনুরাগ শুদ্ধ রোম্যান্টিক—জীবনবোধের দ্বারা উদ্দীপ্ত নয়। কল্পনায় পৃথিবীর সঙ্গে জন্মান্তরীণ রহস্যময় নিবিড় আকর্ষণ অনুভব বসুন্ধরার কাব্যার্থ। 'প্রবাসী' প্রভৃতি কবিতার নিম্নলিখিতরূপ পঙ্‌ক্তিতেও ঐ অনুরাগ ও আত্মীয়তাসম্পর্ক ব্যঞ্জিত—

ধন্য রে আমি, অনন্ত কাল
ধন্য আমার ধরণী।
ধন্য এ মাটি, ধন্য সুদূর
তারকা হিরণবরণী।

এসব জায়গায় পৃথিবীর সৌন্দর্যে চমৎকার বা বিস্ময়ের স্পর্শ লাগলেও তা এ ধরনের sublime-এর অর্থাৎ রুদ্র-সুন্দর-সমন্বিত অসাধারণের বোধ থেকে মুক্ত। 'পৃথিবী-প্রণাম' বিবেকহীন শুদ্ধ অনুরাগ অতিক্রম ক'রে অনেকটা যথাস্থিত বোধের উপর নির্ভরশীল। কবির একালের প্রত্যক্ষানুগ দৃষ্টিকোণের জন্য তা সম্ভব হতে পারে। তা ছাড়া মানুষের মহিমা সম্পর্কে কবির নূতন ধারণাও এর আংশিক কারণ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

কবিতাটির বিশেষণ-বক্রতা লক্ষণীয়। বিশেষণ প্রয়োগের মধ্যেই এর চিত্র-সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। আবার এর মধ্য দিয়ে কবির বন্ধনহীন আবেগ-উচ্ছ্বাসের পরিচয়ও ব্যক্ত হয়েছে। এরকম স্থানগুলি সংযমকে যেন ঘৃণাবশতঃ ত্যাগ করেছে, যেমন—'রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল-পরিচয়-গ্রাসী নিঃশব্দ মহাধূলিরাশির মধ্যে' এবং 'জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে' প্রভৃতি। বিচিত্র রূপের বিস্ময়ে পৃথিবীকে পুনঃপুনঃ স্মরণের নিম্নলিখিতরূপ প্রকার যদ্যপি আকর্ষণীয়, যেমন—

'অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী'

এবং

'স্নিগ্ধ তুমি; হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্যনবীনা'

—তবু বর্ণনবাহুল্য যে কবিতাটির সৌন্দর্যের আংশিক অপহরণ করেছে তাও অযথার্থ মনে হয় না। যেমন, 'সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন

মুছে নেয় শিশিরবিন্দু' প্রভৃতি এবং 'আবার ফাল্গুনে দেখেছি তোমার আতপ্ত দক্ষিণে হাওয়া' প্রভৃতি কয়েক পঙ্‌ক্তি। দুই বিপরীতের একত্র বর্ণনের বিদগ্ধতা কয়েকটি ক্ষেত্রে যেমন উপভোগ্য হয়েছে (তু°—'ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা, বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র' 'অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা') তেমনি বাক্যের শিথিল গ্রন্থন দুএকটি ক্ষেত্রে পীড়াদায়কও হয়ে উঠেছে, যেমন—'দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে মহৎ জীবনে যার অধিকার' 'সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা' প্রভৃতি। নিম্নলিখিত বর্ণনায় মৌখিক শব্দাবলীর গ্রন্থনও কবির পূর্বোক্ত আবেগের আতিশয্য থেকে সংক্রামিত মনে করা যেতে পারে—

বৈশাখে দেখেছি বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেন পাখির মতো তোমার ঝড়,
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-ফোলা সিংহ
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু ক'রে
হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুড় হয়ে।

মোটের উপর 'পৃথিবী-প্রণাম' কল্পনা নিয়ে, আবেগ-আতিশয্য নিয়ে, প্রকাশগত গুণদোষ নিয়ে একটা বৃহৎ স্বচ্ছন্দ ও গতিবেগসম্পন্ন রচনা ব'লে মনে করা যেতে পারে।

পত্রপুটের 'চার' সংখ্যক কবিতাটি কবির স্বকীয় বারমাস্যা বলা চলতে পারে। এর মধ্যে বর্ষা-শরৎ-শীত-গ্রীষ্মের নিসর্গ-স্বাদের চমৎকৃত পরিচয় গ্রথিত হয়েছে। 'মাস যায়, মাস গেল' প্রভৃতি বর্ণনসূত্রে নিসর্গের শুদ্ধ সৌন্দর্যের সঙ্গে উদাসীন কালের গতিশীলতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ফলে এসব কবিতার সৌন্দর্য কবির পূর্বেকার নিসর্গ-রম্যতা থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে। 'সারা হ'ল শিশিরজলে স্নানব্রত' 'কাশের গুচ্ছ ঝরে পড়ল তটের পথে পথে' প্রভৃতি বর্ণনেও চ'লে যাওয়ার কারুণ্যময় অনিবার্যতা আভাসিত হয়েছে। কবিতাটির উপসংহারে বিদায় মনোভাবকে ঘনীভূত ক'রে সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সর্বজনীন ও স্থায়ী করুণরসবস্তুর দিকে কবি সংকেত জানিয়েছেন—

সে যে বিদায়ের নিত্য ভাঁটায় ভেসে-চলা
মহাকালের দীর্ঘনিশ্বাস,
যে কাল, যে পথিক পিছনের পান্থশালাগুলির দিকে

আর ফেরার পথ পায় না,
এক দিনেরও জন্যে।

'ফাল্গুনী'তে ও ঋতুরঙ্গের গানে নানা স্থানেই কবি নিসর্গের মধ্যে চলা ও বিদায়ের প্রকাশ দেখেছেন। গদ্যচ্ছন্দের বহু রচনায় বয়ঃপ্রযুক্ত জীবনবোধের স্পর্শে কবিচিত্তের এই অনুভব প্রসারিত ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পত্রপুটের পাঁচ সংখ্যক 'সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে' প্রভৃতি কবিতাটি কবির একালের একটি অত্যন্ত রমণীয় সৃষ্টি। কবিতাটি প্রকাশের দিক দিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক, আদর্শবোধ এবং মননের স্পর্শলেশমুক্ত, প্রসন্ন কবি-অনুভবের উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত। তা ছাড়া নিসর্গ সম্বন্ধে কবির এমন একটি নির্লিপ্ত তটস্থ দৃষ্টির পরিচয় কবিতাটি বহন করছে যা কবির পূর্বকাব্যজীবনের রচনায় দেখা যায় না। গীতিকাব্যে কবি-মনোভাব উপস্থাপনের রীতিবিষয়ে যে একটি অলিখিত নিয়ম-বন্ধন থাকে, এ-কবিতাটি তার অনুবর্তন করেনি, স্বগত-ভাষণের সহজ ও অন্তরঙ্গ নিয়মে চালিত হয়েছে। সুরমিশ্রিত চিত্রের মুখ্যভাবে উপস্থাপনে এবং তার উপর কবির স্বল্প সুভাষিত মন্তব্যে অলংকৃত হয়ে কবিতাটি খাঁটি আধুনিক কবিতার রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এর প্রারম্ভিক বর্ণনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, কবি ভূমিকার কোনও নিয়ম-শৃঙ্খলা মানছেন না, যা দেখছেন ঠিক তাই দিয়েই প্রবন্ধ গেঁথেছেন—

সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে
অস্তসমুদ্রে স্নান ক'রে।
মায়াবিষ্ট নিবিড় সেই স্তব্ধ ক্ষণে—
তার নাম করব না—
সবে সে চুল বেঁধেছে, পরেছে আশমানি রঙের শাড়ি,
খোলা ছাদে গান গাইছে একা।

এই বাস্তবাশ্রিত চিত্রের পর চলেছে ঐ গান আর ঐ নারী নিয়ে কবিচিত্তের হর্ষবেদনামিশ্র অনুভবের গুঞ্জরণ কখনও নিতান্ত ভাবরসে, কখনও চিত্রে—যাকে বলা যায় রোম্যান্টিক, যেমন—

আমার মন বললে—
মৃত্যু, ওগো মধুময় মৃত্যু,
তুমি আমায় নিয়ে চলেছ লোকান্তরে
গানের পাথায়। ......

আমি ওকে দেখলেম,
যেন আলো-নেবা বাসরঘরে নববধূ···
আমি ওকে দেখলেম,
ও যেন ফিরে গিয়েছে পূর্বজন্মে
চেনা-অচেনার স্পষ্টতায়।

কিন্তু রোম্যান্‌টিকতার পরিতৃপ্তিকে কবি অগ্রসর হতে দেননি। কল্পনার প্রতিরোধ ঘটিয়েছেন প্রত্যাশিত বাস্তব ঘটনার বিপর্যয়ে—

মধুময়ের উপরে পড়ল ধুলার আবরণ

এ যেন রোম্যান্‌টিকতার উপর আধুনিক কবির নিঃসন্দিগ্ধ কটাক্ষ! কিন্তু এ কবিতাটির সবচেয়ে বড় বিস্ময় হ'ল কবির 'হাটের ছবি' দেখা এবং পূর্বেকার ছবি এবং এই ছবির তুল্যমূল্য সাদৃশ্য অনুভব। হাটের একটি ছবি হ'ল এই—

নির্বিশেষে ছড়িয়ে পড়ল আলো মাঠে বাটে,
মহাজনের টিনের ছাদে,
শাক-সবজির ঝুড়ি-চুবড়িতে,
আঁটিবাঁধা খড়ে,
হাঁড়ি-মালসার স্তূপে,
নতুন গুড়ের কলসীর গায়ে।

এ শুধু আলোরই নির্বিশেষ ছড়িয়ে পড়া নয়, কবির দৃষ্টিরও। ফলে কাব্যের গতি গেছে বদলে এবং পূর্ব-পরিবেশিত চিত্রের বৈপরীত্যে বাস্তবতা অধিকতর উজ্জ্বল হয়েছে। পরবর্তী আর একটি চিত্র এই—

একজোড়া মোষ উদাস চোখ মেলে
বয়ে চলেছে বোঝাই গাড়ি,
গলায় বাজছে ঘণ্টা।

এই চিত্র যে পূর্বেকার স্বপ্ন-সরোবরে সুরের-ঢেউ-তোলা অপ্সরীর ছবি থেকে কম রমণীয় নয় তা বোঝা যায় এর মধ্য দিয়ে কবির আনন্দময় অমৃতলোকে যাত্রার পরিচয়ে—

বেদমন্ত্রের ছন্দে আমার মন বললে—
মধুময় এই পার্থিব ধূলি।

পরিশেষে একটি অদ্ভুত অসংগত ছবিতেও কবির মন ভুলেছে দেখা গেল। সে ছবি কেরোসিনের দোকানের সামনে তালি-দেওয়া-আলখাল্লা-পরা বাউলের। বাউলের গানের যে চরণ-দুটি কবি উদ্ধৃত করেছেন তার মধ্যে চিরকালের রোম্যান্টিক কবির সাম্প্রতিক প্রত্যক্ষ লৌকিকেব মধ্যে কাব্যরস-সিদ্ধির পরিচয় ফুটেছে—

হাট করতে এলেম আমি অধরার সন্ধানে
সবাই ধ'রে টানে আমায় এই যে গো এইখানে।

কবিতাটি যেমন কবির অনায়াস চিত্রাঙ্কন এবং অ-পূর্বকল্পিত গ্রন্থনের নৈপুণ্যে মূল্যবান, তেমনি বাক্‌রুচির চলতি স্বচ্ছন্দ খেয়ালের বশেও আকর্ষণীয়। হাটের ছবিটিকে স্বরূপে রমণীয় ক'রে উপস্থাপিত করার কৃতিত্বও অবিসংবাদিত। লক্ষণীয় এই যে, কবির দৃষ্টি বাস্তবে সংসক্ত হ'লেও বুদ্ধিসর্বস্বতা, নৈরাশ্য এবং তিক্ততার অবকাশ ঘটে নি। 'মধুময়ের উপরে পড়ল ধুলার আবরণ' এটি বাস্তব আবেদনের ক্ষণদীপ্ত উজ্জ্বল প্রকাশ হয়েও কবিকে অবসাদগ্রস্ত হতে দেয় নি। স্বপ্নচারিতার আতিশয্যে যা দুর্লভ হ'ল তাকে সহজেই কবি পেলেন নির্বিশেষ আলোকে—একেবারে হাটের মাঝখানে। সুতরাং রূপে, রসে কবিতাটি আধুনিক বাস্তবের অন্তর্ভুক্ত হয়েও রবীন্দ্র-কবিস্বভাবকে ত্যাগ করে নি। গদ্যচ্ছন্দের আশ্রয়ে কবির দৃষ্টিকোণেব যে-ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে তাকে বহুমান ক'রে আমরা স্বচ্ছন্দে এই কবিতাটিকে কবির একালের কাব্যস্বরূপের নির্দেশক অন্যতম কবিতা হিসাবে গ্রহণ করতে পারি।

ছয় সংখ্যক 'অতিথিবৎসল, ডেকে নাও পথের পথিককে' কবিতাটি মানুষপ্রীতির। নিতান্ত সাধারণ অবহেলিত মানুষের মনুষ্যত্ব উপলব্ধি কবিতাটির বীজ। কবিতাটির ভাবার্থে পূর্বেকার থেকে কোনও অসামান্যতা নেই এবং কাব্যরসেও 'ওরা কাজ করে' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তির কবিতা থেকে এ রমণীয় নয়। তবু কবির মানুষপ্রীতির চমৎকারিতায় আর একটি সংযোজন ব'লে গৃহীত হতে পারে। সাত সংখ্যক 'চোখ ঘুমে ভরে আসে' প্রভৃতি কবিদৃষ্ট নিসর্গরূপ এবং কবিমনোগত রসতত্ত্বের মিশ্রিত প্রকাশ। হেমন্তের দিন এবং রাত্রির রমণীয়তার পার্থক্যও কবিতাটিতে অনায়াসে ফুটেছে। বার্ধক্যের সৌন্দর্যস্বপ্নজড়িমা যে-সব চিত্রে রূপ পেতে চেয়েছে, পাঠক সেগুলির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করবেন পদে পদে, আর, এই সূত্রে কবিমানসের নিবিড়

নিমগ্ন অবস্থার সঙ্গে চমকিত সৌহার্দ্য গড়ে তোলারও অবকাশ লাভ করবেন। এরকম চিত্র হ'ল—

সংসারের ঘাটের থেকে রশি-ছেঁড়া এই দিন
বাঁধা নেই কোনো প্রয়োজনে।
রঙের নদী পেরিয়ে সন্ধ্যাবেলায় অদৃশ্য হবে
নিস্তরঙ্গ ঘুমের কালো সমুদ্রে।

এখানে রূপক এবং সমাসোক্তি দুই-ই কবির সংক্ষেপের কাজ নির্বাহ করেছে সাধারণভাবে, কিন্তু অসাধারণ হয়েছে কবির উপমান যোজনা। নিম্নলিখিত চিত্রে 'বসুন্ধরা' কবিতায় বা ছিন্নপত্রে অঙ্কিত আমাদের পূবপরিচিত পৃথিবীর আভাস মাত্র অনুভব করা যায়, কিন্তু সব মিলে এ নূতন বস্তু—

রাস্তায়-চলা ব্যস্ত যে পৃথিবী
এখন আঙিনায়—আঁচল-মেলা তার স্তব্ধ রূপ।
লক্ষ্য নেই কাছের সংসারে,
শুনছে তারার আলোয় গুঞ্জরিত পুরাণকথা।

কবির নিজ আনন্দ-অনুভব-মুহূর্ত সম্পর্কে বর্ণনায় সমাহিত সাধকের মনোভঙ্গির ছাপ পড়েছে—

ঐ চাঁদ ঐ তারা ঐ তমঃপুঞ্জ গাছগুলি
এক হ'ল, বিরাট হ'ল, সম্পূর্ণ হ'ল
আমার চেতনায়।

আট সংখ্যক কবিতায় একটি চারাগাছকে সৃষ্টির বিশাল ভূমিকায় সত্তাবান ক'রে দেখেছেন কবি। নিঃসন্দেহে তাঁর নিজ অস্তিত্বের রহস্যানুভব এর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। সৃষ্টির ধারা সম্পর্কে এবং সেই ধারার অন্তর্নিহিত অদৃশ্য শক্তি সম্পর্কে কোনো তত্ত্বের পথে না গিয়ে বিস্ময়-বাহিত নিজ ভাবনাকেই কবি লিপিবদ্ধ করেছেন ব'লে কবিতাটি গীতিকাব্যগত আন্তরিকতায় মণ্ডিত হয়েছে। কাল-মধ্যবর্তী সৃষ্টির ধারা সম্পর্কে অভিনিবেশ কবির একালের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য—

যে ধারায় উঠল নামল কত শৈলশ্রেণী,
সাগরে মরুতে হ'ল কত বেশপরিবর্তন,
সেই নিরবধি কালেরই দীর্ঘ প্রবাহে এগিয়ে এসেছে
এই ছোটো ফুলটির আদিম সংকল্প।

এই ধরনের আত্মস্বরূপ অনুভবের আগ্রহ নিয়ে লেখা বিশিষ্ট কবিতা হ'ল দশ সংখ্যক 'এই দেহখানা বহন ক'রে আসছে দীর্ঘকাল' প্রভৃতি। বর্ণনায়—দেহমন এবং কল্পিত দেহাতিরিক্ত সত্তার, বাইরের জীবন এবং অন্তরের জীবনের পার্থক্য অনুধাবনযোগ্য। কবি নিজ বহির্জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছেন নিম্নলিখিত ভাষায়—

স্তুতিনিন্দার বাষ্প বুদ্‌বুদে ফেনিল হয়ে
পাক খায় ওর হাসিকান্নার আবর্ত।
বক্ষ ভেদ ক'রে ও হাউইয়ের আগুন দেয় ছুটিয়ে,
শূন্যের কাছ থেকে ফিরে পায় ছাই—
দিনে দিনে তাই করে স্তূপাকার।

দেহমনের তুচ্ছতা কবি যত প্রবলভাবেই প্রকাশ করুন না কেন, প্রশ্ন একটা থেকেই যায় যে, উপরে বর্ণিত অবস্থা নিয়েই তো পৃথিবীতে কাব্যের স্বাধিকার! এবং কবিগুরুর অর্ধেক রচনাই প্রত্যক্ষভাবে এই আগুন আর ছাই নিয়ে, সন্দেহ কী? কিন্তু যুক্তি যে-কথাই বলুক, কবির দৃষ্টিকোণের পার্থক্যে নূতনতর ভাব পরিবেশিত হয়ে থাকে অহরহ এবং চিত্রগীতের সংস্পর্শে তা ক্বচিৎ অপূর্বও হয়ে থাকে। এই অংশে কবির 'অন্তরতম সত্য' উপলব্ধি এবং 'কল্যাণতম রূপ' দর্শন পৌরাণিক-বৈদিক কোনও ধারণার দ্বারা নিয়মিত হয় নি। দেহমনকে উল্লঙ্ঘন করতে চাইলেও কবি স্বভাবের বশবর্তী থেকেই গেছেন। কবির স্বকীয় সেই নিগূঢ় দর্শনের পরিচয় উৎসারিত হয়েছে নিম্নলিখিতরূপ পঙ্‌ক্তিতে—

তোমার জ্যোতির স্তিমিত কেন্দ্রে মানুষ
আপনার মহৎস্বরূপকে দেখেছে কালে কালে,
কখনো নীল-মহানদীর তীরে,
কখনো পারস্যসাগরের কূলে,
কখনো হিমাদ্রিগিরিতটে—

নয় সংখ্যক ঝড়ের বর্ণনায় আদ্যন্ত স্বভাবোক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে, ঝড়ের পশ্চাদ্‌বর্তী কল্পসত্তার কথা উচ্চারিত হয় নি, ঝড়কে অবলম্বন ক'রে কোনও আদর্শলোকেও কবি যাত্রা করছেন না, আর একেবারে মৌখিক ভাষাভঙ্গিকেই মান্য করেছেন। আমাদের মনে হয়, গদ্যছন্দের প্রেরণার

প্রাবল্যে নিজ পূর্বস্বভাবের এবং ভাষাভঙ্গির পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় ব'লে কবি কখনও কখনও মনে করেছেন, এসব কবিতা সেই মুহূর্তের রচনা।

এগারো সংখ্যক ('ফাল্গুনের রঙিন আবেশ') কবিতা নিসর্গ-শক্তি এবং তার কার্যকারিতার কল্পনা নিয়ে এবং বক্রোক্তিতে বিন্যস্ত সৌন্দর্য নিয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হিসাবে আমাদের চিত্ত অধিকার ক'রে আছে। কবিতাটিতে বাধর্ক্যের অবসন্নতার ছবি ফুটেছে, যা বাস্তব ব'লে পরিগণিত হতে পারে, আর কবি-অভিলাষে রোম্যান্টিক বাসনার পরিচয়ও নিবদ্ধ হয়েছে। কবিতাটির ভাষাভঙ্গির মনোহরণ সাধারণ বৈচিত্র্য এবং স্থানিক বক্রভাষণের সুরম্যতা এর চিত্রগীত-মিশ্রিত সৌন্দর্যকে পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ করেছে। কবিতাটিতে অতিকথন নেই, আবেগ-উচ্ছ্বাসের বন্ধনহীনতা নেই, আর কথ্যভঙ্গির রূঢ়তা থেকেও কবিতাটি মুক্ত। উত্তম বক্রভাষণের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ্য—'সরিয়ে ফেলেছ, হে প্রমদা, তোমার মদির মায়া অনাদরে অবহেলায়' 'তুই চক্ষুর বিস্ময়কে ডাক দিতে ভুলে গেলে' 'আমি বাস করি তোমার ভাঙা ঐশ্বর্যের ছড়ানো টুকরোর মধ্যে' 'আর তুমি আছ আপন কৃপণতার পাণ্ডুর মরুদেশে' 'সেই বাণীহারা চাঁদ তুমি আজ আমার কাছে'—ইত্যাদি। চিত্রগীতাত্মক মাধুর্য বিশেষভাবে স্ফুরিত হয়েছে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলির চাঁদের বর্ণনায়, অপহৃত নিসর্গ-শক্তির বর্ণনায়। শেষাংশে চাঁদের চারিত্র্যের আরোপ লক্ষণীয়—

'আজ শুধু তার মধ্যে আছে
আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন দ্বন্দ্ব—
ফোটে না ফুল,
বহে না কলমুখরা নির্ঝরিণী।'

'তোমার মাধুর্যযুগের ভগ্নশেষ
রইল আমার মনের স্তরে স্তরে—
সেদিনকার তোরণের স্তূপ,
প্রাসাদের ভিত্তি,
গুল্মে-ঢাকা বাগানের পথ।'

'আর তুমি আছ
আপন কৃপণতার পাণ্ডুর মরুদেশে,

পিপাসিতের জন্যে জল নেই সেখানে,
পিপাসাকে ছলনা করতে পারে
নেই এমন মরীচিকারও সম্বল।'

কল্পিত নিসর্গ-শক্তির উপর সহচরী নারীর ব্যবহার আরোপ এবং চাঁদের রূপের অভেদারোপ চমৎকৃতির কারণ হয়েছে। ভাবের দিকে সেঁজুতির 'জন্মদিন' কবিতার কিয়দংশের সঙ্গে এটি তুলনীয়। বারো সংখ্যক 'বসেছি অপরাহ্নে পারের খেয়াঘাটে' কবির আত্মস্বরূপবিবৃতির কবিতা, কিন্তু বলিষ্ঠ ভঙ্গির। কবিহৃদয়ের আন্তরিক ভাবনার মূল্যেও কবিতাটি মূল্যবান। কবিতাটির বাচ্যার্থে শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে এবং কর্মীর জীবনের সঙ্গে কবির নিজ ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাববোধ প্রকাশিত। প্রারম্ভে কবি তাঁর কাব্যরচনার প্রেরণাদাত্রী সম্পর্কে বলেছেন এবং তাঁর বিচ্ছেদ-বিরহ থেকেই যে যাবতীয় কাব্যগীতনির্ঝর উৎসারিত হয়েছে তা জানিয়েছেন—

বিরহের কালোগুহা ক্ষুধিত গহ্বর থেকে
ঢেলে দিয়েছে ক্ষুভিত সুরের ঝর্ণা রাত্রিদিন।
সাত রঙের ছটা খেলেছে তার নাচের উড়নিতে
সারাদিনের সূর্যালোকে··· ইত্যাদি।

তার পর জীবনে প্রকাশিত নিজ স্বরূপের বর্ণনায় নিজকে পাহাড়তলির অনুত্তরঙ্গ সরোবরের সঙ্গে বিস্তৃতভাবে তুলনা করেছেন। এই তুলনায় আত্যন্তিক চমৎকারিতা কিছু ফোটেনি, নিজ চারিত্র্য ব্যঞ্জিত হয়েছে মাত্র। শেষাংশে কবি যেখানে বুদ্ধিজীবী এবং ভোগী মানবশ্রেণীর অনুশাসনে কর্মী-মানুষের লাঞ্ছনা এবং কর্মের জীবনের প্রতি অবহেলার বিষয় ব্যঞ্জিত করেছেন সেখানে কাব্যগত রমণীয়তা ফুটে উঠেছে—

মানবের অভ্রভেদী বন্ধনশালা
তুলেছে কালো পাথরে গাঁথা উদ্ধত চূড়া
সূর্যোদয়ের পথে ;
বহু শতাব্দীর ব্যথিত ক্ষত মুষ্টি
রক্তলাঞ্ছিত বিদ্রোহের ছাপ
লেপে দিয়ে যায় তার দ্বারফলকে ;

এই অংশের দ্বিতীয় বাক্যে মানুষের অবমাননা এবং দৈহিক শ্রমের অমর্যাদার ফলে সমাজবিদ্রোহের আভাস অসামান্যভাবে ব্যক্ত হয়েছে। লক্ষণীয় এই যে,

কবি এ বিষয়টিকে তাঁর পুনঃ পুনঃ উপলব্ধ দুঃখ মৃত্যুকে বরণ, সর্বনাশকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গনের মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত ক'রে নিয়েছেন। কবিতাটিতে কবির ভাবগত আন্তরিকতা যে প্রবলতার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে তার প্রমাণ নিম্নলিখিতরূপ পঙ্‌ক্তি—

'মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।'

'যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়।'

এই নব ভাবের মর্মেই 'নবজাতক' কাব্যের 'রোম্যান্‌টিক' কবিতা, 'জন্মদিনে' কাব্যের 'ঐকতান' এবং 'আরোগ্য' কাব্যের 'ওরা কাজ করে' প্রভৃতি কর্মী মানুষের মহিমা প্রকাশক স্মরণীয় কবিতা একসূত্রে গ্রথিত। শুদ্ধ সৌন্দর্যের মূল্যে এসব কবিতা মূল্যবান নয়, কিন্তু ভাবার্থের চমকপ্রদ নবীনতায় স্মরণীয় হয়েছে। বলা বাহুল্য, সাধারণ-মানব-মহিমার অর্থগৌরবপূর্ণ বহু কাব্য-কবিতা এর পূর্বেও কবি যদ্যপি লিখেছেন, কর্ম বা শ্রমের উচ্চমূল্য দিয়ে ভারতবর্ষের অবহেলিত জনসমাজের চিন্ময়ত্ব ও আনন্দস্বরূপের প্রতি শ্রদ্ধাও জানিয়েছেন বার বার, তবু যেহেতু এসব কবিতা নিতান্ত পরিণত বয়সের রচনা এবং সাধারণ পাঠকের ধারণায় পরিণত বয়সেই পরিণত ভাবনার ও সত্যতর উপলব্ধির প্রকাশ সম্ভব, সেইহেতু অনেকেই কবির এ সব কবিতার উচ্চমূল্য নির্ধারণ করতে চান। সেই জন্য একেবারে শেষলেখার অবসরে লিখিত 'রূপনারানের কূলে জেগে উঠিলাম, জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়' ভাবার্থের দিক থেকে কোনও নূতন কথা না জানালেও একমাত্র শেষ লেখা ব'লেই এবং বিদায়ী প্রিয় কবির প্রতি আমাদের প্রবল আত্মীয়তার বশেই অনেকের কণ্ঠে আবৃত্ত হয়েছে। আমরা এ কবিতাটির যাবতীয় সৌন্দর্য ঐ প্রথম বাক্যের নির্মাণের উপর নির্ভরশীল মনে করেছি। কবি সার কথা যা-ই বলুন, ঐ রূপক-সংকেতময় 'রূপনারান' এবং জেগে ওঠার চিত্রের উপরেই

সে সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শেষ কথা কবি কী ব'লে গেছেন তা জানবার কৌতূহল এবং মনে রাখবার আগ্রহের জন্যই 'তোমার সৃষ্টির পথ' প্রভৃতি সকলের দৃষ্টিতে এসেছে। তবে, একথা অনস্বীকার্য যে কবির শেষ জীবনের কাব্যসমূহে যেখানে যেখানে সাধারণ মানবানুরাগ ও জীবননিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে সেখানে কল্পনার মায়ারূপ ত্যাগ ক'রে মর্মার্থ বাস্তবের স্পষ্টতা গ্রহণ করেছে, আর রসের চেয়ে ভাবেরই প্রশ্রয় ঘটেছে।

তেরো-সংখ্যক 'হৃদয়ের অসংখ্য পত্রপুট' কবি-পরিচিতি মাত্র, আলংকারিক গদ্যে এবং সাধুরীতির উত্তম গদ্যে ব্যক্ত হয়েছে। চোদ্দো সংখ্যক কবিতায় ভাবিকালের তরুণীর সঙ্গে সখ্য কল্পনা ক'রে কবি রমণীয়ভাবে তাঁর তাত্ত্বিকতাশূন্য বিশুদ্ধ কবিধর্মের দিকে আবেগ সহকারে অঙ্গুলিসংকেত করেছেন। পনেরো সংখ্যক 'ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত' প্রভৃতি দীর্ঘ কবিতায় কবি বাউল-শ্রেণীর ভাবসাধকদের জীবন ও চরিত্রের মহিমাকীর্তন ক'রে নিজকে তাদের সগোত্র ব'লে নিরূপণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিস্বরূপ ও আত্মস্বরূপ যাঁরা ঠিকভাবে জানতে চান, এই কবিতাটি তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পূর্বে রবীন্দ্র-কবিমানসের স্বরূপ নির্ণয়ে এই কবিতাটির গুরুত্বের প্রসঙ্গ তুলেছি। এ কবিতাটিও বাচ্যার্থপ্রধান এবং ভাবাবেগ-স্পন্দিত। ভাষাভঙ্গিতে কবির ছন্দোবদ্ধ উত্তম গদ্যস্টাইলের রমণীয়তা কবিতাটির একমাত্র কাব্যগত আকর্ষণ। যেমন—

কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।
…আমার চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া
অনাদিকালের কোন্ অস্পষ্ট বার্তা,
প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণ।
হেমন্তের রিক্তশস্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে
আলোর নিঃশব্দ চরণধ্বনি
শুনেছি আমার রক্ত-চাঞ্চল্যে।
…তাকে বলেছি হাত জোড় ক'রে—

হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো
ভেদচিহ্নের-তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান্ পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

ছন্দোবদ্ধ সাধু গদ্যের এই সাবলীলতা সংক্ষিপ্ত দুচারটি কবিতায় স্ফুরিত হয়েছে মাত্র।

আফ্রিকা সম্বন্ধে লেখা 'উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে' আমাদের প্রীতি-পক্ষপাত লাভ করেছে কয়েকটি কারণে। প্রথমতঃ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে কবির প্রবল ঘৃণা এবং লাঞ্ছিত আফ্রিকাবাসীদের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি, দ্বিতীয়তঃ কবিতাটিতে আলংকারিক চিত্রের ও উত্তম ছন্দোভঙ্গির প্রয়োগ, তৃতীয়তঃ বর্ণনায় বিশেষণাদির ভাবসৌন্দর্যবিধায়ক বক্র নির্মাণ। দেশের উপর মানুষের ব্যবহার আরোপে এর প্রাথমিক চারুতার উদ্ভব হয়েছে, যেমন, 'রুদ্র সমুদ্রের বাহু প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে আফ্রিকা'। এর ভৌগোলিক বর্ণনাতেও কবির সহানুভূতি ফুটে উঠেছে। এইভাবে প্রথম স্তবকে আফ্রিকার নিসর্গ এবং মানুষের হার্দ্য পরিচয় কবির লেখনীতে ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'মন্ত্র জাগাচ্ছিল তোমার চেতনাতীত মনে' 'আপনাকে উগ্র ক'রে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায়' প্রভৃতিতে আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মন্ত্রতন্ত্রাদিময় পরিচয়কে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে তাতে আদিম আরণ্য জীবনের গৌরবই ফুটে উঠেছে। পরবর্তী স্তবকেও কবির করুণা-মধুর বর্ণনা—

হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নিচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।

এরই সঙ্গে বৈপরীত্যে যাদের চিত্র উপস্থাপিত করা হয়েছে, বর্ণনায় তাদের উপর কবির ঘৃণা এবং বিদ্বেষ কত তীব্র তার প্রমাণ নিম্নলিখিতরূপ বাক্যসমূহে পাওয়া যাবে—'নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে' 'যখন গুপ্ত গহ্বর

থেকে পশুরা বেরিয়ে এল' 'দস্যু-পায়ের কাঁটামারা জুতোর তলায়'। এই কবিতাটির গদ্যছন্দও ভাষারীতিতে স্থানে স্থানে অপুর্ব হয়েছে—

তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে ;

এই অভিজাত চালের গদ্যচ্ছন্দ-বিরচনের পালা পত্রপুটেই শেষ হয়েছে বলা যায়। তা ছাড়া দেশ, সমাজ, আত্মজীবনগত সত্যবস্তুর উপলব্ধির আগ্রহ এবং মানুষ নিয়ে আদর্শপ্রবণতা ও আবেগময় ভাবুকতার যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাও সাঙ্গ হতে চলেছে। পরিবেশগত প্রত্যক্ষের রমণীয়তা কবিকে অধিকতর আকর্ষণ করছে, অথবা নিজ মনের ক্ষণিক আবেশ ও জল্পনা নিয়ে তার সহজ প্রকাশ কবি খুঁজছেন। সর্বত্র নিবিড় অথচ নিতান্ত সহজ অন্তরঙ্গ অনুভবের পালা চলেছে প্রায় শেষ পর্যন্ত।

'শ্যামলী'র গোড়ার দিকের কয়েকটি কবিতা গার্হস্থ্য দাম্পত্য প্রেমজীবনের সাময়িক অনুভব ও পরিবেশচিত্র নিয়ে লেখা। বিরহিত স্মৃতিচারণা ছাড়া বাস্তব সংসারের দাম্পত্য জীবনের কোনও ছবি এর পুর্বে কবি স্মরণীয় ক'রে তোলেন নি। মহুয়াতেও নিস্তরঙ্গ বিবাহিত জীবনের সাধারণ প্রেম মূর্ত হয় নি। মহুয়ার প্রেমই স্বতন্ত্র জাতের, বৃহত্তর বাস্তব থেকে উদ্দীপিত এক বিশিষ্ট আদর্শলোকের। বার্ধক্যবশতঃ এহেন রোম্যান্স্-এর আতিশয্য-মুক্ত অপ্রগল্ভ এবং 'নিরুদ্দেশ বেদনার জোয়ার'হীন প্রণয়াসক্তি কতকটা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, গার্হস্থ্য সংসারের মধ্যবর্তী প্রণয়-রহস্য, বাহ্য অচঞ্চলতার মধ্যবর্তী চাঞ্চল্য নিরীক্ষণ সমগ্রভাবে একালের প্রত্যক্ষ-প্রীতির সমসূত্রেই গ্রথিত। রবীন্দ্র-কবিস্বভাবের বিশেষ দু'চারটি চিহ্নও এসব কবিতার মধ্যে লক্ষ্যগোচর করা যেতে পারে, যেমন, একটি হ'ল চেনার মধ্যেও অচেনার রহস্য অনুভব। এরই মর্মে অর্থাৎ একটি রোম্যান্টিক ভাবের মধ্যে পরিচিতকে দেখার বৈশিষ্ট্য সেকাল থেকে একালে অবিচ্ছেদে অগ্রসর হয়ে রবীন্দ্র-কবিমানসের একত্ব ঘোষণা করছে।

'দ্বৈত' কবিতায় প্রিয়ার আবির্ভাবের রূপে ঐ অতিমর্ত্য অচেনালোকের আভাস জাগাতে চেয়েছেন কবি। 'যেমন ভোরবেলার একটুখানি ইশারা' প্রভৃতি ক্রমে ঐ অচেনার প্রাথমিক প্রভাব এবং ক্রমে পরিচয়ের মধ্য দিয়ে ভাবের রঙে স্বকীয় ক'রে গড়ে তোলার রহস্যকথা বিবৃত হয়েছে। 'শেষ পহরে' প্রবল দাম্পত্য অভিমানের একটি ছবি এবং ছবি হিসাবেই এর মূল্য

যথেষ্ট। কলহান্তরিতার বেদনার মিশ্রকরুণও কবিতাটির আনন্দরস বর্ধিত করেছে। এই বেদনার অবস্থাবিবৃতিতে যদি অমরুশতক অথবা পদাবলী আমাদের মুগ্ধ ক'রে থাকে এ কবিতাও নিঃসংশয়ে করবে। সংসারে পরিচিত একান্ত ঘরোয়া পরিবেশের বর্ণনা কল্পনার অতিকৃতি থেকে কবিতাটিকে রক্ষা করেছে, যেমন—

দরজার বাইরে জ্বলছে
ধোঁওয়ায় কালি-পড়া হারিকেন লণ্ঠন,
বারান্দায় নিবো-নিবো শিখার গন্ধ।
ছেড়ে-আসা বিছানায় খোলা মশারি
একটু একটু কাঁপছে বাতাসে।

'সম্ভাষণ' কবিতায় নিত্যপ্রাপ্ত দাম্পত্য প্রণয়ের বর্ণহীনতার মধ্যেকার একটি অসামান্য ক্ষণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অভ্যাসের জীর্ণতার মধ্যে সহসা এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন প্রতিদিনের পরিচিত অপরিচিতের রহস্যময় সৌন্দর্য নিয়ে দেখা দেয়, কবির ভাষায় তখন আসে দুর্লভ গোধূলিলগ্ন, তখন প্রাত্যহিকতার মালিন্য চলে গিয়ে প্রেমের অমরাবতী ফুটে ওঠে, এবং যে-কথা, যে-সম্ভাষণ বাস্তব সংসারে হয় বেমানান, বাস্তবের কোনো বিশেষ অবসরেই তা স্বরূপে দেখা দেয়। এসব কথা রবীন্দ্র-কণ্ঠেই আমাদের বহুবার শ্রুত, কিন্তু তারই আভাস নিয়ে কবিতাটি রচিত হয়েছে। পরিবেশের মধ্যে আধুনিকতা কবিতাটিকে স্বাদে পূর্বেকার গান ও কবিতা থেকে স্বল্প ভিন্নতর করেছে। দূরবিহারী স্বপ্নলোকে যাবার পথে নায়ক নায়িকার যে রূপসজ্জা ও ভাবুকতা প্রত্য[illegible] করছে তার মধ্যে অপ্রত্যক্ষতার ছায়া কবি একটুও মেশান নি, বাস্তব রূপ ও ভাবকেই মায়াসৃজনের কাজে লাগিয়েছেন, যেমন—

বাঁধছিলে চুল আয়নার সামনে
বেণী পাকিয়ে পাকিয়ে, কাঁটা বিঁধে বিঁধে।
…দেখিনি এমন বাঁকা করে মাথা-হেলানো
চুল বাঁধার কারিগরিতে,
এমন দুই হাতের মিতালি
চুড়িবালার ঠুনঠুনির তালে।

শেষে ঐ ধানি রঙের আঁচলখানিতে
কোথাও কিছু ঢিল দিলে,
আঁট করলে কোথাও বা…

এর পূর্বেকার প্রসাধন-চিত্র হিসাবে 'আবেদন' কবিতার রাণীর[১] অথবা 'পূজারিণী'র শ্রীমতীর কবরী-বন্ধন[২] অথবা অন্য বহু গীতে ও কবিতায় সন্নিবেশিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পার্থক্যে তুলনা-যোগ্য। অথচ এ দুই বিভিন্নতার ভাবগত আবেদন কবির ধারণামতে সমানই। ফলতঃ আধুনিক সংসারের 'পুরানো বউ' অনায়াসেই কল্পযুগের অভিসারিকার স্থান গ্রহণ করেছে—

সাজের ঘর থেকে বসবার ঘরে
ঐ যে আসছে অভিসারিকা,
ও যেন কাছের কালে আসছে
দূরের কালের বাণী।

কল্পনা-রশ্মি-সংযমনের একালে আরও নানান্ কবিতায় আধুনিকার মধ্যেই চিরন্তনীকে কবি দেখেছেন, যেমন সানাই-এর 'অধীরা' কবিতায়—

মুক্ত বেণীতে স্রস্ত আঁচলে
উচ্ছৃঙ্খল সাজে
দেখা যায় ওর মাঝে
অনাদিকালের বেদনার উদ্‌বোধন—
সৃষ্টিযুগের প্রথম রাতের রোদন—

'হারানো মন' ঠিক প্রেমের কবিতা নয়। 'আদি'র আভাস-মিশ্রিত মুগ্ধতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়বাহী মাত্র। 'দেখেছি শাড়ির কালো পাড়ের নিচে থেকে তোমার কনক-গৌরবর্ণ পায়ের দ্বিধা' এবং 'আজ ডাকব না তোমাকে'—এরই মধ্যে প্রণয়-সংস্পর্শ কিছু এসে পড়েছে মাত্র। তার পর বক্তব্য হিসাবে

১ যেথায় নিভৃত কক্ষে ঘন কেশপাশ
তিমিরনির্ঝরসম উন্মুক্ত-উচ্ছ্বাস
তরঙ্গ-কুটিল এলাইয়া পৃষ্ঠ'পরে,
কনকমুকুর অঙ্কে, শুভ্রপদ্মকরে
বিনাইবে বেণী।

২ সমুখে রাখিয়া স্বর্ণমুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘচিকুর
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর
সীমন্তসীমা'পরে।

কবির কৈফিয়ৎও অবশ্য গৌণ হয়ে পড়েছে—'আজ কোনো সীমানা-দেওয়া নয় আমার মন' প্রভৃতি। কিন্তু বার্ধক্যের রাগবৃত্তি এরকমই হয়ে থাকে, এ ব্যাখ্যা এখানে অচল। 'আমার ভালোবাসা যেন সেই আল-ভেঙে-যাওয়া খেতের মতো' প্রভৃতিতে প্রণয়ের স্বরূপ ব্যক্ত হয় নি, অন্য বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে মাত্র। বার্ধক্যের স্বপ্নদৃষ্টি বরং ঠিক ঠিক প্রকাশ পেয়েছে নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনে—

এ কান্না নয়, হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
যত-কিছু ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া রূপ,
ফিকে-হয়ে-যাওয়া গন্ধ,
কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান,
তাপহারা স্মৃতিবিস্মৃতির ধূপছায়া—

আকাশ-প্রদীপের রূপকথা ও ছড়ার জগতে সঞ্চরণশীল প্রবৃত্তির মধ্যে বার্ধক্যের এই মনোমহিমা বরং লক্ষণীয়। প্রেমকবিতায় বাস্তব আবেগ-উত্তাপের মৃদুতা এবং বাস্তব নায়িকাকে কল্পমায়ার মূর্তিতে রূপান্তরিত ক'রে নেওয়ার স্বভাব কবির চিরন্তন। একালে বরঞ্চ প্রত্যক্ষ রাগরঞ্জনের এবং আমাদের অভ্যস্ত মিলন-বিরহ-কথার স্বাদগন্ধ অল্পবিস্তর পাওয়া যাচ্ছে।

ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে 'হঠাৎ-দেখা' কবিতাটির আকস্মিক ঘটনা-বাহিত বাস্তব প্রীতিরসের পরিচয় পাওয়া যাবে। মায়ালোক এ-চিত্রকে কিছুমাত্র স্পর্শ করেনি, না রূপ-দর্শনে, না স্বভাব-বর্ণনে।

দেখা হবে না আর কোনোদিনই।
তাই যে প্রশ্নটার জবাব এতকাল থেমে আছে,
শুনব তোমার মুখে।

পূর্ব-প্রণয়ের প্রতি আকর্ষণের বিষয়টির গ্রন্থনেও অবাঞ্ছিত অত্যুক্তির সাহায্য নেননি কবি। বর্ণনগত চিত্ররীতিই এসব জায়গায় প্রাধান্য পেয়েছে। গীতাত্মকতা রয়েছে ব্যঞ্জনার মধ্যে, যেমন থাকে সার্থক ছোটগল্পে। 'কনি' কবিতা হিসাবে এর থেকে ভালো নয়। বর্ণনা-প্রাধান্যে এটি গল্পের রূপ নিয়েছে, যেমন নিয়েছে 'পুনশ্চ'র কয়েকটি কবিতা। এর চিত্রমাহাত্ম্যের খর্বতাও ঘটেছে ভিন্ন প্রসঙ্গের উত্থাপনে। 'মিলভাঙা' এবং 'অকালঘুম'

কবির নিজ জীবনস্মৃতি অবলম্বনে লেখা, প্রথমটি কবির কৈশোরের ক্ষণসখীর স্মৃতি নিয়ে জল্পনা, দ্বিতীয়টি দয়িতা-সম্পর্কের একটি বিশেষ দিনের ছবি নিয়ে অপরূপের রসে নিমগ্ন হওয়ার রমণীয়তার পরিবেশন। কবিতাটির বর্ণনরীতিতেও বাস্তবাশ্রিত চমৎকারের অপরূপতা ফুটেছে। নিদ্রিতা রমণীর এই সৌন্দর্যচ্ছবিতে পুর্বদৃষ্ট মাদকতার স্পর্শ নেই, তার জায়গায় অনুভূত হচ্ছে অপরিমেয় প্রীতিস্নেহমিশ্রিত রসাবেশ—

ঈষৎ খোলা ঠোঁটদুটিতে মিলিয়ে আছে
মুদে-আসা ফুলের মধুর উদাসীনতা।
দুটি ঘুমন্ত চোখের কালো পক্ষ্মচ্ছায়া
পড়েছে পাণ্ডুর কপোলে।

নিদ্রিতার রূপ এবং প্রভাব বর্ণনায় কবি কালক্ষেপ মন্দ করেন নি এবং একালেও শুদ্ধ সৌন্দর্যনির্মাণের উত্তম পরিচয় দিয়েছেন। নিম্নলিখিত কল্পনাময় চিত্র দুটি লক্ষ্য করা যাক—

(১) ক্লান্ত জগৎ চলেছে পা টিপে
ওর খোলা জানালার সামনে দিয়ে

(২) চলতি মুহূর্তগুলি গতি হারাল ওর স্তব্ধ চেতনায়,
মিলল একটি অনিমেষ মুহূর্তে ;
ছড়িয়ে দিল তার অশরীরী ডানা
ওর নিবিড় নিদ্রার 'পরে।

এই কল্পচিত্র এবং বাহ্য রূপের অসামান্যতা কবিকে অনির্বচনীয় অনুভবের মধ্যে নিয়ে গেছে, রহস্যময়তার মধ্যে কবিচিত্তকে নিমগ্ন করেছে। নিম্নলিখিত প্রশ্নময় বিস্ময়-ব্যাকুলতার ভাষায় কবি অনির্বচনীয় মাধুর্য-উপলব্ধিকে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। বক্র ভাষাভঙ্গি গ্রন্থনের মধ্যেই গদ্যচ্ছন্দে এই অংশে অতুলনীয় কাব্যসৌন্দর্য স্ফুরিত হয়েছে একথা স্বীকার করতে হয়—

সে কি অস্তিত্বের সেই বিষাদ
যার তল মেলে না,
সে কি সেই বোবার প্রশ্ন
যার উত্তর লুকোচুরি করে রক্তে,

সে কি সেই বিরহ
যার ইতিহাস নেই,
সে কি অজানা বাঁশির ডাকে অচেনা পথে স্বপ্নে-চলা।

গদ্যচ্ছন্দ রচনার পালার মধ্যে যে ক'টি কবিতা আমাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে তার মধ্যে এটির উল্লেখ করা যায়।

'শ্যামলী' কাব্যের শেষের দিকে দুচারটি কাহিনী-কাব্য গ্রথিত হয়েছে, বিষয় যার প্রেম। 'অমৃত' এর মধ্যে বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে পরিবেশ-বর্ণন এবং ঘটনা-পরিণামের দিক থেকে। 'অমিয়া'র কাছে প্রেম এবং দাম্পত্য-সম্পর্কের চেয়ে আদর্শে উৎসর্গীকৃত জীবনই বরণীয় হয়েছে—এবিষয়টি কবি আধুনিক জীবন-দ্বন্দ্বের পটভূমিতেই সার্থক ক'রে তুলেছেন। তবু গল্পের রস এর কবিতার স্বাদকে অতিক্রম করেছে বলতে হয়। 'বঞ্চিত' ও 'অপর পক্ষ' একই বিষয়ের নায়িকা-পক্ষ এবং নায়ক-পক্ষ অবলম্বনে দুটি নাতিরম্য ঘটনা-চিত্র মাত্র। এগুলির মধ্যে করুণের অনুভবের চেয়ে ঘটনাচক্রের বা ভাগ্যবিধাতার পরিহাস-রসিকতাই অধিক পরিস্ফুট হয়েছে।

প্রায় নিঃশেষ গদ্যচ্ছন্দের পালা 'শ্যামলী'তেই শেষ হয়েছে। এর পর কবি পদ্যচ্ছন্দে কেন এলেন এ প্রশ্ন নিরর্থক, কারণ কবি এবং আর্টিস্ট হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বহুবিচিত্রের সাধক। তাঁর কবিতাতেও, বিশেষতঃ একালে, কাল্পনিকতা বাস্তবমুখিতা মনন-প্রাধান্য সবই একাধারে প্রকাশ পেয়েছে। দৃষ্টিকোণ এবং মেজাজ হিসাবে কখনও বা ভিন্ন কারণে কবিতার ভাব এবং রূপ যায় বদলে। কাব্যগুলিও এজন্য কোনও বিষয়বস্তু বা ভাবধারা অনুসারে গ্রথিত হয় নি। ফলে কেন্দ্রগত ভাবার্থ ধ'রে এসব কাব্যের সাধারণ বিচারও সম্ভব নয়।

'শ্যামলী'র একটি মননধর্মী কবিতা 'সঞ্চয়িতা'র পাতায় স্থান পেয়ে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেটি হ'ল 'আমি'। কবিতাটিতে শুদ্ধ কাব্যসৌন্দর্য নেই, এবং তা কবির অভিপ্রেতও নয়, মনোভাব ব্যক্ত করাই উদ্দেশ্য। তবু কবিতাটি সম্পর্কে দুচার কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি। এখানে তত্ত্ব যদি কিছু থাকে সে কাব্যতত্ত্ব, বার্কলি-প্রমাণিত বিষয়ী-সর্বস্বতার বা এদেশীয় বিজ্ঞানবাদের তত্ত্ব নয়। কবি কখনও বিষয়কে অগ্রাহ্য করতেই পারেন না, শুধু সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে বিষয়কে গ্রহণ করেন এই মাত্র। 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ' এর কাব্যার্থ এই যে, কবির চেতনা এমনই বিশিষ্ট যে তাতে পান্নার সবুজের অপূর্বতার দিকটি

ধরা পড়ে, যেমন পড়ে আকাশে আলোর প্রকাশের অনির্বচনীয় রহস্য অথবা গোলাপের সুষমা। এই ধরনেরই আরও চমৎকার বাক্য হ'ল 'পুষ্পবনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে'। এসব যে কবি-কথা, তত্ত্ব নয়, তা 'আমি' কবিতায় পরক্ষণেই কবি বলেছেন—'তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে, না, না, না—' ইত্যাদি। কবি সৌন্দর্যরসিক ব'লেই যে অস্তি-বাদী এবং ভাববাদী সে-কথা এখানকার নূতন কোনও কথা নয়, কবিতায় প্রবন্ধে শতবার তা ব্যক্ত হয়েছে। বরঞ্চ কিছু নূতন কথা হ'ল বিজ্ঞানের ধারণার উপর ভিত্তি ক'রে পৃথিবীর বিনাশের দিনের কল্পনা—'মানুষের যাবার দিনের চোখ বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ' প্রভৃতি। এও কোনও দৃঢ় প্রত্যয় বা কল্পনাসিদ্ধ দর্শন নয়। ক্ষণিকের একটা চিন্তার প্রকাশ মাত্র।

অতঃপর কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে সেই সব কবিতাই আমরা আলোচনা করব যেগুলির মধ্যে কিছু অভাবনীয়তা ফুটেছে অথবা কাব্যসৌন্দর্যের অসামান্যতা লক্ষিত হয়েছে।

সেঁজুতির একটি চমৎকার কবিতা হ'ল 'তীর্থযাত্রিণী'। এতে প্রবল সহানুভূতির সাহায্যে কবি বৃদ্ধা তীর্থযাত্রিণীর মানস-চিত্র এঁকেছেন। এ চিত্র যেমন যথাযথ তেমনি বর্ণনাকৌশলে মনোরম হয়েছে। জীবনের না-পাওয়ার ব্যর্থতা কল্পিত স্বর্গে সকল প্রাপ্তিতে সার্থক হয়ে উঠবে এই আশায় বার্ধক্যে তীর্থযাত্রা এবং ঠাকুরের কাছে আত্মনিবেদন। এই সাধারণ ব্যাপারটি বর্ণনা ক'রে কবি বৃদ্ধার ফিকে-হয়ে-আসা পূর্বজীবন-স্মৃতির সেই পরিচয় দিয়েছেন যার সঙ্গে এখন আর তার কোনও সম্পর্কই নেই। পরিশেষে সর্বজনীন ট্র্যাজেডির বিষয় উপস্থাপিত ক'রে কবি তীর্থযাত্রিণীকে আমাদের অন্তরের সহানুভূতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ করেছেন—

হায়, সেই কিছু
যাবে ওর আগে প্রেতসম, ও চলিবে পিছু
ক্ষীণালোকে, প্রতিদিন ধরি-ধরি করি তারে
অবশেষে মিলাবে আঁধারে।

একালে এরকম বহু কবিতা সাধারণ চিত্রধর্মেই মূল্যবান হয়েছে, কল্পনার অনুরঞ্জনে স্বাদে ভিন্নরীতির হয় নি। এর ঠিক পরবর্তী 'নতুন কাল' কবিতায় পুরাতন কালের আমাদের একটি চমৎকার ছবি গ্রথিত ক'রে একালের

সঙ্গে পার্থক্য এবং সকলকালের মধ্যে প্রবাহিত চিরন্তনতার সূত্র উপলব্ধি করেছেন কবি। সে সূত্র হ'ল নিসর্গের এবং নিসর্গাশ্রিত পল্লীজীবনের—

যে হোক রাজা যে হোক্ মন্ত্রী কেউ রবে না তারা,
বইবে নদীর ধারা—
জেলেডিঙি চিরকালের, নৌকো মহাজনি,
উঠবে দাঁড়ের ধ্বনি।
প্রাচীন অশথ আধা ডাঙায় জলের 'পরে আধা,
সারারাত্রি গুঁড়িতে তার পানসি রইবে বাঁধা।

এই চিরন্তনতার স্বপ্নচিত্র কবি ছড়ার একটি বহু-উচ্চারিত পঙ্‌ক্তির মধ্যে গ্রথিত দেখেছেন। সেটি একাল-সেকালের বহিরঙ্গ পার্থক্য এবং অন্তরঙ্গ একত্বের দিক কবির কাছে ব্যঞ্জিত করছে মন্ত্রের মত—'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।' পরবর্তী 'চলতি ছবি' কবিতায়ও অনুরূপ স্বপ্নদৃষ্টি নিয়ে গ্রামজীবনকে দেখেছেন, এবং এই বাহ্যতঃ নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে নায়েগ্রার জলপ্রপাতের মত বিস্ময়কর রহস্য অনুভব করেছেন। সেঁজুতির এরকম কয়েকটি কবিতাতেই কবির নিসর্গ ও সাধারণ মানুষের প্রতি প্রীতিরস উচ্ছলিত হয়েছে। একালে ছড়া-সংকেতিত চিত্রের প্রতি কবির অনুরাগ লক্ষণীয় হয়েছে।

'ছড়ার ছবি' **'আকাশ-প্রদীপ'** প্রভৃতি লেখার সময় বহুবিচিত্র কল্পনায় কবি যেন তাঁর শৈশবে ফিরে এসেছেন, রূপকথা এবং ছড়ার জগতের সম্ভব-অসম্ভবে মেশামেশি অসংলগ্ন চিত্রের মায়ায় আকৃষ্ট হয়েছেন এবং বাল্যস্মৃতির রূপে-রসে আবিষ্ট হয়েছেন। 'আকাশ-প্রদীপে'র এরকম কতকগুলি কবিতার উপর কাব্য-রমণীয়তার বিচারের সাধারণ মানদণ্ড প্রয়োগ করা চলে কিনা সন্দেহ ; ছড়ার চিত্রজগৎকে আমরা যে-দৃষ্টিতে দেখে থাকি, ছড়া এবং রূপকথার স্মৃতিচারণায় যে বিশেষ মানসিকতার পরিচয় এবং বিশুদ্ধ রোম্যান্স্-এর মায়ালোক দর্শনে যে আনন্দ, তা-ই হ'ল এজাতীয় কবিতা-পাঠের ফলশ্রুতি। শিশু-মানসিকতা বয়স্কের চিত্তলোক থেকে মুছে যায় না। স্বপ্নচারী কবিচিত্তে অবচেতন এবং চেতনের মধ্যে পার্থক্যও অন্যাপেক্ষা স্বল্প।

ছড়ার রাজ্যের স্পষ্ট ও অস্পষ্টে মেশা চিত্রাবলীকে যে দুটি কবিতায় কবি আত্মপ্রকাশের কাজে প্রবলভাবে ব্যবহার করেছেন সে দুটি কবিতা হ'ল 'সময়হারা' এবং 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।' 'সময়হারা' কবিতায়

কবির একটা বক্তব্য রয়েছে। কবির কাল্পনিকতা-প্রধান কবিতার কাল চলে গেছে—এই অভিমতের একটা প্রত্যুত্তর তিনি দিতে চান। কিন্তু প্রত্যুত্তর যে-রীতিতে দিয়েছেন তাতে অর্থহীন জল্পনা এবং পরিহাস-রসই কবিতাটিতে প্রাধান্য পেয়েছে। শিশুমনের ও কবিমনের সাজাত্যের রহস্য উদ্‌ঘাটিত ক'রে কবি শুদ্ধ কল্পচ্ছবি ও নিরর্থকতার মূল্যে তাঁর কাব্যকে পরিচিত করেছেন—

সময় আমার গেছে বলেই সময় থাকে পড়ে,
পুতুল গড়ার শূন্য বেলা কাটাই খেয়াল গ'ড়ে।
সজনে গাছে হঠাৎ দেখি কমলাপুলির টিয়ে—
গোধূলিতে সূয্যিমামার বিয়ে;
—ইত্যাদি।

বস্তু এবং মনন, সমস্যা ও সমাধান যাঁরা কবির কাছে প্রত্যাশা করেন কবি তাঁদের কাছে নিজ শূন্য ভাণ্ডারের দিক দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন পরিহাস-রস-রমণীয়তার সঙ্গে—

সময় আমার গিয়েছে তাই, গাঁয়ের ছাগল চরাই।
রবিশস্যে ভরা ছিল, শূন্য এখন মরাই।
খুদকুঁড়ো যা বাকি ছিল ইঁদুরগুলো ঢুকে
দিল কখন ফুঁকে।

কবি যে-ভাবে প্রত্যুত্তর নির্মাণ করেছেন তাতে ছড়ার ছবি এসে যোগ দিয়েছে অনায়াসেই, ফলে এ কবিতাটির সর্বত্র মূল বক্তব্যটি যেন কবির অনভিপ্রেত এবং তাকে অবলম্বন মাত্র ক'রে লঘু খাপছাড়া খেয়ালী ছবির ধ্যান এবং পরিবেশনই অভিপ্রেত হয়ে উঠেছে—

পাস নি খবর, বাহান্ন জন কাহার
পাল্‌কি আনে—শব্দ কি পাস তাহার?
বাঘনাপাড়া পেরিয়ে এল ধেয়ে,
সখীর সঙ্গে আসছে রাজার মেয়ে।

'ঢাকিরা ঢাক' প্রভৃতি উল্লিখিত দ্বিতীয় কবিতাটিতেই শিশুস্বপ্নরসে এবং শিশুসুলভ কারুণ্যে কবির অধিকতর তদ্‌গত হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। সংগতিহীন অদ্ভুত কল্পনা, যা বয়স্কের কাছে প্রলাপ অথচ শিশুর কাছে অর্থপূর্ণ, তার স্বাক্ষর কবিতাটির প্রারম্ভেই রয়েছে—'পাকুড়তলীর মাঠে বামুন-মারা

দিঘির ঘাটে' ইত্যাদি। এর পর 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' প্রভৃতি পঙ্ক্তির চিত্রকে ঘিরে কবিমানসে পরিচিত অন্য একটি করুণ ঘটনার রেখাপাত ব্যক্ত করা হয়েছে, যেমন সচরাচর ঘটে থাকে শিশুদের মনোলোকে— 'কই আমাদের পাড়ার কালো মেয়ে—' প্রভৃতিতে। 'জমিদারের বুড়ো হাতি হেলে দুলে চলেছে বাঁশতলায়' প্রভৃতি নিসর্গ-পরিবেশ-চিত্রও শিশুস্বভাবকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

'আকাশপ্রদীপে'র কয়েকটি কবিতায় রূপকথার রহস্যের আস্বাদ পাওয়া যায়। কবির শৈশবের স্মৃতিচারণার কবিতাগুলিতে রূপকথার জগতের প্রতি আকর্ষণ কখনও প্রাসঙ্গিকভাবে কখনও বা প্রধানভাবেই রূপকথাচিত্র উপস্থাপিত করেছে, যেমন 'যাত্রাপথ' কবিতায়—

সব-জানা দেশ নয় এ কভু, তাই তো তেপান্তরে
রাজপুত্তুর ছোটায় ঘোড়া না-জানা কার তরে।

'ধ্বনি' কবিতায় কবির শিশুমনে ধ্বনি থেকে উদ্ভূত চিত্রসমষ্টির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এ-চিত্র 'জীবনস্মৃতি' পাঠকের পরিচিত। ছিন্নপত্রেও কবিচিত্তে ধ্বনি-প্রভাবিত ইন্দ্রজাল গঠনের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। কোন্ ধ্বনি কবিকে কোন্ চিত্রকল্পনায় নিয়োজিত করছে, কোথায় বর্ণে ও ধ্বনিতে একাকার হয়ে যাচ্ছে এসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ক'রে গ্রন্থ নির্মিত হওয়া উচিত। আমরা কবিজীবনের বাহ্য ঘটনাবলী এবং সনতারিখ নিয়ে বহু কালক্ষেপ করেছি, এখন কবির কল্পলোক ও চিত্রনির্মাণশালার দিকে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন। এই পুস্তিকায় আমরা মাত্র দিগ্‌দর্শন করতে চেয়েছি, তার অধিক কিছু নয়। 'ধ্বনি' কবিতায় কবি তাঁর শিশুকালের শ্রুতিগত রমণীয়তা এবং সম্ভব-অসম্ভব মিশ্রিত চিত্র-কুহকের পরিচয় দিয়েছেন—

ফেরিওলাদের ডাক সূক্ষ্ম হয়ে কোথা যেত চলি,
যে-সকল অলিগলি
জানি নি কখনো
তারা যেন কোনো
বোগদাদের বসোরার
পরদেশী পসরার
স্বপ্ন এনে দিত বহি।

…… স্পর্শ দিয়ে চেতনারে জাগাইত ধোঁয়ালি চিন্তায়,
নিয়ে যেত সৃষ্টির আদিম ভূমিকায়।
চোখে-দেখা এ বিশ্বের গভীর সুদূরে
রূপের অদৃশ্য অন্তঃপুরে
ছন্দের মন্দিরে বসি রেখা-জাদুকর কাল
আকাশে আকাশে নিত্য প্রসারে বস্তুর ইন্দ্রজাল।

এই হ'ল রবীন্দ্র-কবিস্বভাবের মৌল স্বরূপ। সৃষ্টির অন্তর্নিহিত ইন্দ্রজালকে চিত্রে ছন্দে ইঙ্গিতে পরিস্ফুট ক'রে তোলার মধ্যেই বাঙ্‌লা সাহিত্যে ও বিশ্বের কলাবিভাগে তাঁর আসন সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এই বিষয়টিই আমাদের বিশেষভাবে জানতে হবে এবং পৃথিবীকে জানাতে হবে।

'বধূ' কবিতায় কবি ছড়ার রসে নিমগ্ন ও রূপকথা-লুব্ধ শৈশব-পরিচয় দিয়ে এবং প্রত্যক্ষানুভবের কাহিনী মিশ্রিত ক'রে পুনশ্চ আমাদের অজানা সুদূরের জন্য ব্যাকুল করেছেন। বধূ-আগমনের ছড়ার প্রভাব যে তাঁর রোম্যান্টিক স্বভাবের গঠনে সাহায্য করেছে তা নিম্নলিখিত রম্য পরিচয় থেকে জানা যায়—

বেজেছে বর্ষণঘন শ্রাবণের বিনিদ্র নিশীথে;
মধ্যাহ্নে করুণ রাগিণীতে
বিদেশী পান্থের শ্রান্ত সুরে।

কিন্তু প্রত্যক্ষে যখন বধূ এল, দেখা গেল সেও অজানার রহস্যচ্ছবি মাত্র। কবি ঠিক যাকে চান, তাকে কোনও কালেই পাওয়া যায় না, আভাসে অনুভব এবং প্রত্যাশার আনন্দ-বেদনাময় বিকারবিশেষই সেই দূরচারিণী সৌন্দর্যমূর্তির দান—এই বিষয়টির পরিচয় কবির রচনায় অসংখ্যবার ফুটে উঠেছে। 'বধূ' কবিতার শেষে এই চির-অনাগতার আগমনকথা কল্পচিত্রে ও গীতধর্মী ভাষায় অপূর্বতার সঞ্চার করেছে—

সে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে,
নিত্যকাল সে শুধু আসিছে।
…… ফিরিছে সে চির পথভোলা
জ্যোতিষ্কের আলোছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।

শৈশবগত আত্মপরিচয়ের অন্য কয়েকটি কবিতায়ও রূপকথাসঞ্চারী কবিপ্রবৃত্তি কোথাও কাব্যালোকে চকিতে দীপ্ত হয়ে উঠেছে, যেমন 'জল' কবিতায়—'নাগকন্যা মানিকদর্পণে সেথায় বাঁধিছে বেণী।' আবার কোথাও নিরুদ্দেশ-যাত্রীর ব্যাকুলতার স্পর্শে কোনও কবিতার শেষাংশ চিত্রগীতসমৃদ্ধ হয়ে অপূর্ব হয়ে উঠেছে, যেমন—

চৈত্রের আকাশতলে নীলিমার লাবণ্য ঘনালো,
আশ্বিনের আলো
বাজালো সোনার ধানে ছুটির সানাই।
চলেছে মন্থর তরী নিরুদ্দেশ স্বপ্নেতে বোঝাই।

এই কাব্যের 'পাখির ভোজ' এবং 'বেজি'র চরিত্রের রহস্যানুভবও ঐ শিশুসুলভ কৌতূহল থেকে সঞ্জাত নিতান্ত সহজ অভিব্যক্তি। কিন্তু একেও হার মানিয়েছে 'জানা-অজানা' কবিতার পরিচিত ও নিত্যব্যবহার্য গৃহের উপকরণকে রহস্যের মায়া নিয়ে দেখা, চেতন-অচেতনের মধ্যবর্তী স্তিমিত মনের কুহক-জল্পনা—

পিতলের ফুলদানিটাকে
বহে নিয়ে টিপাইটা এক কোণে মুখ ঢেকে থাকে।
ক্যাবিনেটে কী যে আছে কত,
না-জানারই মতো।
...... কার্পেটের ডিজাইন
স্পষ্টভাষা বলেছিল একদিন;
আজ অন্যরূপ,
প্রায় তারা চুপ।
...... ঝাপসা পুরানো ছেঁড়া-ভাষা
আসবাবগুলো যেন আছে অন্যমনে।
সামনে রয়েছে কিছু, কিছু লুকিয়েছে কোণে কোণে।

শ্যামলী থেকে আকাশপ্রদীপ পর্যন্ত এবং সানাই থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত কবিচিত্তের একরকম সহজ রসাবেশের পর্যায় চলেছে। এর মাঝখানে 'নবজাতক' কবিচিত্তের সাময়িকতায় উদ্দীপিত হওয়া, মননপ্রবৃত্তি প্রভৃতি প্রকাশ করছে এবং ভাষাধর্মে ওজস্বিতা, নব সাংকেতিকতা ও ছন্দে বৈচিত্র্যের প্রয়াসকে লক্ষণীয় করে তুলেছে।

'নবজাতক' বিশিষ্ট সন্দেহ নেই, এবং খেয়ালী কবির স্বভাবের হাওয়া-বদলও নির্দেশ করে ঠিকই। কিন্তু 'নবজাতক' বিচিত্র খেয়ালের রচনাও বটে। এর বহু কবিতাই ভাবার্থে এবং সুরে পূর্বেকার অনুবৃত্তি মাত্র। যেমন প্রথম দিকের উদ্‌বোধন, শেষদৃষ্টি; মাঝখানের অস্পষ্ট, মংপু পাহাড়ে, ইস্‌টেশন, সাড়ে নটা, প্রবাসী ও অবর্জিত; শেষের দিকের জয়ধ্বনি, প্রজাপতি, প্রবীণ, শেষ বেলা, শেষ কথা। নবজাতকের অন্য কবিতাগুলিতে ক্বচিৎ বস্তু অর্থাৎ উপকরণের নূতনত্ব, ক্বচিৎ ভাবের, কখনও শব্দ-বাক্য-নির্মাণের, আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল ছন্দের।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে চরণপাতের বৈষম্য কখনও সার্থকভাবে কখনও নিরর্থক-ভাবে অনুসৃত হয়েছে। সার্থক ও শ্রুতির অপ্রত্যাশিত নয় এমন বৈষম্যের উদাহরণ, যেমন 'বুদ্ধভক্তি' কবিতায়—

প্রথম স্তবক—

হুংকৃত যুদ্ধের ॥ বাদ্য	৮+৩
সংগ্রহ করিবারে ॥ শমনের খাদ্য	৮+৭
সাজিয়াছে ওরা সবে ॥ উৎকট দর্শন,	৮+৮
দন্তে দন্তে ওরা ॥ করিতেছে ঘর্ষণ;	৮+৮
হিংসার উষ্মায় ॥ দারুণ অধীর	৮+৬
সিদ্ধির বর চায় ॥ করুণানিধির	৮+৬

ইত্যাদি।

দ্বিতীয় স্তবক—

গর্জিয়া প্রার্থনা ॥ করে	৮+২
আর্তরোদন যেন ॥ জাগে ঘরে ঘরে।	৮+৬
গ্রামপল্লীর রবে ॥ ভস্মের চিহ্ন	৮+৭

ইত্যাদি।

অথচ তৃতীয় স্তবকের পঞ্চম-ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তির চরণ—

মিথ্যায় কলুষিবে ॥ জনতার বিশ্বাস	৮+৮
বিষবাষ্পের বাণে ॥ রোধি দিবে নিঃশ্বাস	৮+৮

অর্থাৎ স্তবকগত চরণবিন্যাসের রূপকল্পে সাম্য নেই। তবু মিলে-আশ্রিত চরণযুগলের মধ্যে বিষমতা নেই। প্রতি স্তবকান্তে 'তূরী ভেরী বেজে ওঠে' ইত্যাদি ধ্রুবপদ যুদ্ধযাত্রার ধ্বনিচিত্র দেওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রথিত।

'ইস্‌টেশন' কবিতায় শ্বাসমাত্রিক ছন্দের চালের মধ্যে মাত্রাবৃত্তের চার চরণের তালফেরতা নিঃসন্দেহে ধ্বনিগত চিত্রের মহিমা বৃদ্ধি করেছে। এই কবিতা-টিরও স্তবক নির্মাণে স্বাধীনতা লক্ষণীয়। স্পষ্টতই স্তবক এবং চরণের বন্ধন-রীতি কবি উল্লঙ্ঘন করতে চেয়েছেন। মিলের মধ্যবর্তী তাল-সুষমা যদি বজায় থাকে স্তবক-বন্ধন শিথিল হলেও কবিতায় রসের ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু নবজাতকের দু-একটি কবিতায় এই সাম্যও কবি উপেক্ষা করেছেন। সেখানে পরপর দু'চরণও প্রায় ভিন্নজাতের গ্রন্থন হয়ে উঠেছে, যেমন—

ক্ষণ আলো ইঙ্গিতে উঠে ঝলি,
পার হয়ে যায় চলি
…মনোহীন বলে তারে, তবু অন্ধের হাতে
প্রাণমন সঁপি দিয়া বিছানা সে পাতে।

নিম্নলিখিতরূপ স্থানে পর্ব-পর্বাঙ্গ-সামঞ্জস্য উপেক্ষিত হয়েছে—

যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
…সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম,
সেথায় নির্মম কর্ম; (রোম্যান্‌টিক)

একই বিশ্ব লক্ষকোটি ক'রে জানে
রূপে রসে নানা অনুমানে।
…প্রজাপতি বসে আছে যে কাব্য পুঁথির 'পরে
স্পর্শ তারে করে
…ও জানে কাহারে বলে মধু তবু (প্রজাপতি)

লক্ষণীয় এই যে, আটের সঙ্গে আটের বা চারের পর্ব-পর্বাঙ্গ গ্রন্থনে তালের সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হয়, ছয় বা দশের সঙ্গেই এর যোগ।

নবজাতকে কবির যুদ্ধবিরোধী সমাজমুখিতা ও ক্বচিৎ মননপ্রিয়তা কবিকে নূতন রীতির শব্দ নির্মাণে উদ্‌যোগী করেছে, কখনও বা নূতন অলংকারচিত্রে উৎসাহিত করেছে, যেমন,

উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ-আলো—
নিম্নে নিবিড় অতিবর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে—

ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।

অথবা 'ভগ্নজানু প্রতাপের ছায়া' 'রাজ্যহীন সিংহাসনে অত্যুক্তির রাজা' 'প্রেতের প্রগল্‌ভ প্রহসন' 'নিষ্কর্মার স্বাদু উত্তেজনা' 'আশাহীন পূর্ব-আসক্তির কাঙাল শিকড়জাল' 'সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে' 'রক্তের নিঃশব্দ স্বর সদা চলে নাড়ীতন্তু বেয়ে' 'দৃষ্টির সম্মুখে মোর হিমাদ্রিরাজ্যের সমগ্রতা' 'কাল বৈশাখীর পণ্যঝড়' প্রভৃতি।

এই কাব্যের যে ক'টি কবিতায় দার্শনিকতার প্রতি আগ্রহ অথবা মননমুখিতা প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে 'কেন' ('জ্যোতিষীরা বলে') একটি। সূর্যের তাপ ও রশ্মির বিকিরণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের অভিমত থেকে কবি স্বকীয় চিন্তার মধ্যে উপনীত হয়েছেন। কিন্তু কবিতাটিতে মনন প্রাধান্য না পেয়ে বিস্ময়রসকে নিজ অধিকার বিস্তার করতে দিয়েছে। এই বিস্ময়ের প্রকাশ ঘটেছে প্রথম স্তবকের নিম্নলিখিতরূপ অংশে—

সর্বত্যাগী অপব্যয়,
আপন সৃষ্টির পরে বিধাতার নির্মম অন্যায়।
কিংবা একি মহাকাল কল্প-কল্পান্তের দিনে রাতে
এক হাতে দান ক'রে ফিরে ফিরে নেয় অন্য হাতে।

এই বিস্ময়-দৃষ্টিতে কবি মানুষ-জীবনের বিচিত্র সূক্ষ্ম অপরিমেয় প্রকাশ-গুলির দিকে অভিনিবেশ করেছেন এবং সেখানে প্রত্যয় ন্যস্ত করার মতো কোনও স্থান খুঁজে পান নি। এ অংশেও মননের থেকে চিত্রদর্শন এবং বিস্ময়মূলক জিজ্ঞাসার ভাব প্রবল, যেমন—

মানুষের চিত্ত নিয়ে সারাবেলা
মহাকাল করিতেছে দ্যূতখেলা
বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন—
কিন্তু কেন।

কিন্তু আমাদের কাছে আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কবি সৃষ্টির অর্থবত্তা

সম্পর্কে বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত কল্পনাকে ত্যাগ করেছেন। পূর্বেকার কল্পনা-সমূহ কবিচিত্তে রাগপ্রাপ্ত হয়ে স্থায়ী সংস্কারে পরিণত হয় নি, রবীন্দ্রনাথের শুদ্ধ কবিস্বরূপেরই জয় হয়েছে এটি একটি লক্ষণীয় ব্যাপার এবং রবীন্দ্র-কবি-স্বরূপ অনুধাবনে পাঠকদের স্মরণযোগ্য। 'প্রথম বয়সে কবে ভাবনার কী আঘাত লেগে' যে প্রশ্ন কবিচিত্তে জেগেছিল এবং কল্পনায় তার যে সমাধান তিনি পেয়েছিলেন, সে সমাধান পরিণত কবিদৃষ্টিতে স্থায়ী হয় নি, বিস্ময়-ব্যাকুলতা প্রশ্নেই থেকে যাচ্ছে—এর পরিচয় পাঠককে নিশ্চয়ই চমৎকৃত করবে—

··· এ বিশ্বের কোন্ কেন্দ্রস্থলে
মিলিতেছে প্রতি দণ্ডে পলে
··· পূর্ণ করি ঋতুর উৎসব
জীবনের মরণের নিত্য কলরব
আলোকের নিঃশব্দ চরণপাত
নিয়ত স্পন্দিত করি দ্যুলোকের অন্তহীন রাত।
··· কল্পনায় দেখেছিনু প্রতিধ্বনিমণ্ডল বিরাজে
ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরকন্দর-মাঝে।
··· অনুভব করেছি তখনি,
বহু যুগযুগান্তের কোন্ এক বাণীধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথহারা
সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর মাঝে এসে।

কবির এই কল্পনা ও স্বপ্নময় ভাবদৃষ্টির সঙ্গে আমরা নিতান্ত পরিচিত, এ বিষয়ে কোনও সংশয়ই বরং আমাদের সচকিত করে। কিন্তু কবিকে কবি ব'লে জানলে বোধ হয় সংশয়, সমাধান, তর্ক, পাথিবতা, অপার্থিবতা সব কিছুরই সুসমঞ্জস আশ্রয় তাঁর মধ্যে দেখতে পাব। কবির কাছে সারগর্ভ কোনও কিছু প্রাপ্তির আশা আপাততঃ তিরোহিত হোক, স্থানবিশেষে বিচিত্র কল্পনার আশ্রয়ে যে সব শুদ্ধ সৌন্দর্যের দুর্লভ মুহূর্তগুলি চিত্রগীতে রমণীয় হয়ে মূর্তিলাভ করছে তা-ই আমাদের চরম প্রাপ্তি হোক। 'কেন' এই ব্যাকুল প্রশ্নের উপসংহারে আত্মভাবুক কবি যে সংশয় কল্পনা করেছেন সেই সর্বজনীন ও বাস্তবানুগত কল্পনার অনুসরণ করা যাক—

প্রশ্ন মনে আসে আরবার,
আবার কি ছিন্ন হয়ে যাবে সূত্র তার—
রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে
চলে যাবে বহু কোটি বৎসরের শূন্য যাত্রাপথে ?
উজাড় করিয়া দিবে তার
পান্থের পাথেয়পাত্র আপন স্বল্পায়ু বেদনার—
ভোজশেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাণ্ড হেন ?
কিন্তু কেন।

আর এরই সঙ্গে কবির শেষ লেখা পর্যন্ত মিলিয়ে নিয়ে কবিস্বভাবের শুদ্ধতার জয়ধ্বনি দেওয়া যাক—

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে
কে তুমি।
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিমসাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেলনা উত্তর।

'দিবসের শেষ সূর্য' অর্থে নিঃসন্দেহে এই কবি ব্যঞ্জিত।

'ভারত-তীর্থ' কবিতার সঙ্গে 'হিন্দুস্থান' কবিতা দৃষ্টিকোণের বৈচিত্র্যের দিক থেকে স্মরণীয়। 'মোরে হিন্দুস্থান বারবার করেছে আহ্বান' এই প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে কবির বিস্ময়-মিশ্র প্রবল আকর্ষণ ব্যঞ্জিত হয়েছে। এই সম্মোহের কারণরূপে ঐতিহাসিক ভারতকেই কবি কল্পনায় দেখছেন, পৌরাণিক এবং প্রাক্-পুরাণিক অধ্যাত্ম-মহিমার ভারতকে নয়। যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং রাষ্ট্রের উত্থান ও বিলয় কবির কল্পনায় রমণীয় চিত্রমহিমা লাভ করেছে।

এ-বিষয়ে কবির ভাবগত প্রেরণা হ'ল বৈদেশিক রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পুনঃ পুনঃ বিলয়। এর রমণীয় চিত্র কবি নিম্নলিখিতভাবে দিচ্ছেন—

দিল্লীতে আগ্রাতে
মঞ্জীর-ঝংকার আর দূর শকুনির ধ্বনি-সাথে।
... রাত্রিরে ভুলিল তারা ঐশ্বর্যের মশাল-আলোয়—
পীড়িত পীড়নকারী দোঁহে মিলি সাদায়-কালোয়
যেখানে রচিয়াছিল দ্যূত-খেলাঘর......

অবশ্য এ চিত্র আরও মনোরমভাবে আমরা পূর্বেই পেয়েছি কবির শিবাজী সম্পর্কিত কবিতায়—'তার পর শূন্য হ'ল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে' প্রভৃতিতে। এ কবিতাটিতে সমগ্রভাবে কবির দৃষ্টিকোণের পার্থক্যই অনুধাবনযোগ্য হয়েছে। নিম্নলিখিত অংশে ব্যঞ্জনায় ইংরেজ রাজশক্তির পতনের বিষয় কথিত হয়েছে—

আরো ছায়া ঘনাইছে অস্তদিগন্তের
জীর্ণ যুগান্তের।

'রাজপুতানা' কবিতাটির মূলে রয়েছে মধ্যযুগের রাজপুতদের চরিত্র-গৌরবের প্রতি কবির তীব্র সহানুভূতি, যার ফলে তিনি ইংরেজের অধীন আখ্যামাত্র-সম্বল রাজপুত রাজন্যবর্গের লাঞ্ছিত অবস্থায় প্রবল দুঃখ অনুভব ক'রে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই অবস্থার চেয়ে নিশ্চিহ্ন বিনাশও শ্রেয়স্কর হ'ত—

না থেকেও তবু আছে।
একি আত্মবিস্মরণমোহ,
বীর্যহীন ভিত্তি 'পরে কেন রচে শূন্য সমারোহ।
রাজহীন সিংহাসনে অত্যুক্তির রাজা,
বিধাতার সাজা।

কবিতাটি বর্ণনাবহুল, এবং ভাবাবেগ-প্রধান। এই ধরনের মিলযুক্ত অথচ প্রবাহিত ছন্দোভঙ্গিতে 'বলাকা'র ভাষারীতির পুনরাবৃত্তিও লক্ষণীয়।

'ভাগ্যরাজ্য' কবিতাটির বিষয় কবি-মনস্তত্ত্ব। পুরাতন আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা নিয়ে লেখা বহু কবিতার আয়ু কবির কাছে শেষ হয়ে গেছে এবং বর্তমানে সেগুলি প্রত্নরূপে কোনও ক্রমে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র, কারণ, সে সব বাসনাকে কবি পূর্বেই পূর্ণ প্রকাশরূপ দিয়েছেন, এখন আর সে সবের

পুনরাবৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই ব্যাপারটি কবি ভগ্নাবশিষ্ট নগরীর চিত্র দিয়ে আভাসিত করেছেন। এ চিত্র রমণীয়—

আশাহীন পূর্ব আসক্তির
কাঙাল শিকড়জাল
বৃথা আঁকড়িয়া ধরে প্রাণপণে বর্তমান কাল
আকাশে তাকায় শিলালেখ

তাঁর কবিবাসনার ইতিহাসের অন্যদিক হ'ল নিগূঢ় অপ্রাপ্তির বেদনাময়তা। এ ব্যাপারটির সঙ্গে আমরা পূর্বাপর পরিচিত। 'রোগশয্যায়' সংগ্রহের বাইশ সংখ্যক কবিতাতেও এই দূরব্যাপ্ত নিরুদ্দেশ বাসনার পরিচয় গ্রথিত হয়েছে—

যা-কিছু হারাল মোর
সব চেয়ে কার লাগি বাজিল বেদনা।
সে মোর অতীত নহে
যারে লয়ে সুখে দুঃখে কেটেছে আমার রাত্রিদিন।
সে আমার ভবিষ্যৎ
যারে কোনো কালে পাই নাই,
যার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা আমার
ভূমিগর্ভে বীজের মতন
অঙ্কুরিত আশা লয়ে
দীর্ঘরাত্রি স্বপ্ন দেখেছিল
অনাগত আলোকের লাগি।

এর থেকে স্পষ্ট উক্তি আর কিছুই হতে পারে না। এই অপ্রাপ্তিবোধের অতি প্রবলতার জন্য তিনি রোম্যান্টিক কবিসম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য এবং শেষ কবিও, কারণ, এর পর থেকে সাহিত্য-জগৎ স্বপ্ন ও সুরের ইন্দ্রজাল-বেষ্টন আর মানছে না। 'ভাগ্যরাজ্য' কবিতাটির এই অংশে অপূর্ণ নগরীর চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে, অবশ্য সংক্ষিপ্তভাবে, যেমন—'অসংলগ্ন ভিত্তি 'পরে' 'শৈবালে ঢাকেনি তার বাঁধা-পড়া ঘাটে-লাগা স্রোতে'। অজানার এবং অপ্রাপ্তির বেদনাময় ব্যর্থতার পরিচয়, যা কবিতাটির গীতধর্ম বজায় রেখেছে তা হ'ল—

লক্ষ্যচ্যুত কামনায় রয়েছে আদিম রক্তরাগ।
............সেই শেষ না-জানার
নিত্য নিরুত্তরখানি মর্মমাঝে রয়েছে আমার ;
স্বপ্নে তার প্রতিবিম্ব ফেলি
সচকিত আলোকের কটাক্ষে সে করিতেছে কেলি।

'রাতের গাড়ি' কবিতায় কবি দেহ-সীমিত গতিবেগ-সম্পন্ন অজ্ঞাত লক্ষ্যে ধাবমান নিজ প্রাণসত্তাকে বিস্ময়-সহকারে লক্ষ্য করেছেন এবং এর মধ্যে চেতন-অবচেতনের যে-লীলা চলেছে, স্পষ্ট-অস্পষ্টে মিলিত হয়ে যে-রূপ এর ফুটে উঠেছে তাকে সংক্ষেপে আভাসিত করতে চেয়েছেন। রেলগাড়ির রাত্রির যাত্রীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রাণের অভিজ্ঞতার মিলের চমৎকৃতি লক্ষণীয়—

নামহীন যে-অচেনা বার বার পার হয়ে যায়
অগোচরে যারা সবে রয়েছে সেথায়,
তারি যেন বহে নিশ্বাস,
সন্দেহ-আড়ালেতে মুখ-ঢাকা জাগে বিশ্বাস।

কবিতাটির কয়েক স্থানের পদপাতের অসমতা সম্বন্ধে পূর্বেই মন্তব্য করা গেছে। কিন্তু জাগরণ ও তন্দ্রা, চেতনা এবং অবচেতনের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে নিলে এই অসামঞ্জস্য কাব্যগুণের অঙ্গীভূত ব'লে অনুভূত হতে পারে। 'অস্পষ্ট' কবিতায় চিহ্নিত দোলপূর্ণিমারজনীর স্বপ্নাবেশ নবচিত্রনির্মাণে ও নূতন ভঙ্গিতে আমাদের আকর্ষণ করেছে। কবিতাটিকে বাস্তবের মায়া রূপেও অভিহিত করা যেতে পারে। আবছায়া-অস্পষ্টতাময় রাত্রির পৃথিবীর রঙ্ ও রেখার এই পরিচয় কবির বার্ধক্যের উল্লেখযোগ্য দানরূপে স্মরণ করা যেতে পারে—

ফিস্‌ফিস্ করে পাতায় পাতায়
উস্‌খুস্ করে হাওয়া।
ছায়ার আড়ালে গন্ধরাজের
তন্দ্রাজড়িত চাওয়া।
চন্দনিদহে থইথই জল
ঝিক্ ঝিক্ করে আলোতে,
জামরুল গাছে ফুলকাটা কাজে
বুনুনি সাদায় কালোতে।

কাছগুলো সব ঘুমে ডুবে আছে,
তন্দ্রা তারায় তারায়।
কাছের পৃথিবী স্বপ্নপ্লাবনে
দূরের প্রান্তে হারায়।

এপারে-ওপারে' কবিতাটি 'ওপারে'র অর্থাৎ শহরবাসি মধ্যবিত্তদের প্রতিক্ষণে পরিবর্তনশীল দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সমগ্র একটি ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। রূপদর্শী কবির আর এক পরিচয় এই অংশে পাওয়া যাবে। 'এপারে'র বর্ণনায় তত্ত্বদর্শী কবি ঐ জীবনের থেকে নিজ জীবনের পার্থক্য নির্দেশ ক'রে ঐ জীবনের অংশভাক্ হওয়ার অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন নিম্নলিখিত স্মরণীয় পঙ্ক্তিতে—

আপনার উচ্চতট হতে
নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।

'ইস্‌টেশন' কবিতায়ও কবির এই চিত্রানুরাগ অভিব্যক্ত হয়েছে, স্বভাবোক্তিময় অর্থচিত্রের সঙ্গে কবি ছন্দধ্বনিচিত্রও মিশ্রিত করেছেন। 'সাড়ে নটা' কবিতায় বিদেশিনীর কণ্ঠ কবিকে অলক্ষ্য অশ্রুত বাণীর রাজ্যে নিয়ে গেছে, প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের বিশ্ব কবির কাছে গৌণ হয়ে পড়েছে। এই ভাবুকতা পুরাতন হলেও প্রত্যক্ষের চিত্রের সংস্পর্শে কতকটা রমণীয় হয়েছে বলা যায়। 'প্রশ্ন' কবিতায় মনন এবং বিস্ময় একত্র স্থান পেয়েছে এবং ভাবার্থের দিক দিয়ে কবিতাটি 'কেন' কবিতার সদৃশ হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মহাকাশ-পরিচিতির সঙ্গে আত্মপরিচয়ের পার্থক্য অনুভব ক'রে কবি অজ্ঞেয়তায় আবিষ্ট হয়েছেন। পূর্ব-কথিত যুক্তিতে সান্ত্বনা পান নি ('বলি তারে মায়া—যাই বলি শব্দ সেটা অব্যক্ত অর্থের উপচ্ছায়া') এবং রহস্যময়তার কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছেন—

বাজিতে থাকিবে শূন্যে প্রশ্নের সুতীব্র আর্তস্বর।
ধ্বনিবে না কোনোই উত্তর।

'রোম্যান্‌টিক' কবিতাটি কবির আত্মস্বরূপের বিবৃতি মাত্র। উৎসুক পাঠক এর মধ্যে কবির কাব্যরচনার মূল প্রকৃতির পরিচয় লাভ করবেন, যেমন—

যে-কল্পলোকের কেন্দ্রে তোমারে বসাই
ধূলি-আবরণ তার সযত্নে খসাই—
আমি নিজে সৃষ্টি করি তারে।

আর পাবেন নিম্নলিখিত অংশে কর্ম ও বাস্তব জগৎ সম্পর্কে কবির করণীয়তার নির্দেশ—

তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম ;
সেথায় নির্মম কর্ম ;
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক মাভৈঃ
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।

'জয়ধ্বনি' কবিতাতেও অভিজ্ঞতায় ও বোধে কবিকর্তৃক বাস্তব বিশ্বের স্বীকৃতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, বাস্তবকে স্বরূপে দেখতে গিয়ে কবি মানুষের দৈন্য ও গ্লানির দিক লক্ষ্য করেছেন (বলাকার 'দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে' এবং মহুয়ার 'যাচে দেশ মোহের দীক্ষারে' প্রভৃতি তুলনীয়) কিন্তু আশাবাদী ব'লেই বিকৃতি পেরিয়ে মানুষের আত্মিক মুক্তি লক্ষ্য করেছেন। উপসংহারে রূপক-সংকেতে বলিষ্ঠভাবে ঐ ধারণা প্রকাশ করতে চেয়েছেন—

দৃষ্টির সম্মুখে মোর হিমাদ্রিরাজ্যের সমগ্রতা,
গুহা গহ্বরের যত ভাঙাচোরা রেখাগুলো তারে
পারে নি বিদ্রূপ করিবারে—

অবশ্য তথ্য হিসাবে কবিতাটি মূল্যবান, কাব্য হিসাবে নয়।

নবজাতকের 'রাত্রি' কবিতা কল্পনা-কাব্যের 'রাত্রি'র সঙ্গে বৈপরীত্যে তুলনীয়। রাত্রিকে কবি স্রষ্টার অপূর্ণ সৃষ্টির পরিচয়, আদিমতার অভিব্যক্তি বলে মনে করেছেন এবং সম্ভবতঃ মানুষের কর্মের তপস্যায় মূল্যবান বলেই দিবালোকের পক্ষপাতী হয়েছেন। রাত্রির রূপে দেখছেন 'আধা অন্ধ, আধা বোবা বিরাট অস্পষ্ট মূর্তি' এবং এর মধ্যে অনুভব করেছেন—

'ছায়া করে আনাগোনা সংশয়ের মুখোশ-পরানো'

আসলে রাত্রিকে জীবনের তমিস্রা-বেষ্টন ব'লেই কবি মনে করেছেন এবং কামনা-মোহ-বিলাসের ধাত্রীর সংসর্গ তীব্রভাবে অস্বীকার করেছেন—

নহি নহি আমি নহি অপূর্ণ সৃষ্টির
সমুদ্রের পঙ্কলোকে অন্ধ তলচর

অর্ধস্ফুট শক্তি যার বিহ্বলতা-বিলাসী মাতাল
তরলে নিমগ্ন অনুক্ষণ।

মোটের উপর নবজাতকের কিছু কবিতায় ভাব এবং রূপ দু-দিক থেকেই কিছু কিছু অভিনবতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এ কাব্যে কবির ভূমিকা সৌন্দর্য সৃষ্টিতে তেমন কিছু নয়, যেমন বিশেষ ধরনের কোনও কোনও ধারণার দ্বারা চালিত হওয়ার মধ্যে। 'রূপ-বিরূপ' কবিতাটিতে সৃষ্টির বিরূপতার দিকে কবি লক্ষ্য নিবদ্ধ করেছেন, বাস্তবে রূঢ়তা, কুশ্রীতা যে সৌন্দর্যের সমান রেখায় একত্র অবস্থিত রয়েছে তা অনুভব করে নিজ লেখনীর দৈন্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন—

সুকুমারী লেখনীর লজ্জা ভয়
যা পরুষ, যা নিষ্ঠুর, উৎকট যা, করে নি সঞ্চয়
আপনার চিত্রশালে ;
তার সংগীতের তালে
ছন্দোভঙ্গ হল তাই,
সংকোচে সে কেন বোঝে নাই।

ভাবের দিক থেকে কবিতাটি বিখ্যাত 'ঐকতান' কবিতার অন্তরঙ্গ, অথচ 'ঐকতানে' কবির কল্পনা এবং আবেগ সংলগ্ন হয়েছে এবং নিবিড় আন্তরিকতায় বক্তব্য মধুময় হয়েছে, এখানে মাত্র ভাববিবৃতিতে কবিতাটির বাচ্যপ্রাধান্যই ফুটে উঠেছে।

'সানাই' নামটির উপর নিরুদ্দেশ স্বপ্নের কবির অনুরাগ বোঝা দুষ্কর নয়। এর পূর্বে আকাশপ্রদীপেই অবকাশ-কল্পনার সংকেত 'ছুটির সানাই' দিয়ে কবি জ্ঞাপন করেছেন। 'সানাই' সংগ্রহে যে কবিতাবলী ধৃত হয়েছে তার প্রধান কাব্যলক্ষণ হ'ল সংগীতধর্ম। কয়েকটি সংগীত হিসাবেই সৃষ্ট। এর মধ্যে কল্পনা-ক্ষণিকা-খেয়া-গীতাঞ্জলি কালের শুধু কাব্যার্থই নয়, ছন্দ ধ্বনিচিত্র এবং অর্থচিত্রও প্রত্যাবৃত্ত হয়েছে। এই পালাবদলের জন্য চঞ্চল কবিস্বভাব ছাড়া অন্য কিছুকে কারণরূপে অনুমান করা যায় না। কবি বলেছেন—

এ ধূসর জীবনের গোধূলি,
ক্ষীণ তার উদাসীন স্মৃতি।
মুছে আসা সেই ম্লান ছবিতে
রঙ দেয় গুঞ্জনগীতি।

ফলে পূর্ব কাব্য-কল্পনার খণ্ড ছিন্ন স্মৃতিরূপেও সানাইকে দেখা যেতে পারে। 'পুনশ্চ' থেকে 'নবজাতক' পর্যন্ত দীর্ঘ পর্যায়ের মধ্যে একমাত্র 'বীথিকা'র কয়েকটি কবিতায় এই ধরনের গীতধর্মের প্রবলতা অনুভব করা গেছে। তবু পূর্বেকার প্রণয় ও সৌন্দর্যস্বপ্নের আবেগ ও দীপ্তি একালের অনুরূপ ভাবনায় অবিদ্যমান, সে উল্লাসের অজস্র বৈচিত্র্যও একালে নেই। বীথিকা কিংবা সানাইয়ের যে-কোনও গীতিকার সঙ্গে সদৃশ পূর্ব কবিতার তুলনাতেই তা ধরা পড়বে। সানাইয়ের এই মাধুর্যসম্পদকে পূর্বকালের ভগ্নাবশেষ হিসাবে গ্রহণ করাই ভাল। তবু একালকার উপেক্ষিত গীতধর্মের যুগে স্বপ্নের আলো-ছায়া, চকিত দর্শনের মোহ এবং উৎসুক প্রতীক্ষার অঙ্গীভূত ছন্দ ও ধ্বনির অকাল-বর্ষণ পাঠককে পুলকিত করবেই।

সানাইয়ের কয়েকটি গানে যে সব চিত্র-সংকেত কবিভাবনার সংক্ষেপ-করণে ও সহজ রমণীয়তা উৎপাদনে সহায়তা করেছে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—

(১) গানের খেয়া সে মাগিতেছে বুঝি
আমার তীরেতে এসে (গানের খেয়া)

(২) বলাকা-পাঁতির পিছিয়ে-পড়া ও পাখি
বাসা সুদূরের বনের প্রাঙ্গণে (অধরা)

(৩) ভাসান-খেলার তরীখানি চলবে বেয়ে
একলা ঘাটে রইব চেয়ে। (বিদায়)

(৪) শুক্লা নিশার অভিসার পথে
চরম তিথির শশী (পূর্ণা)

(৫) লিপিখানি তার নিয়ে এসে তবু
কেন যে দিলে না হাতে। (কৃপণা)

(৬) বারিঝরা বনের গন্ধ নিয়া
পরশহারা বরণমালা গাঁথে আমার প্রিয়া। (ছায়াছবি)

(৭) সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে
যাই ভেসে দূর দিশে,
পরীর দেশের বন্ধ দুয়ার দিই হানা। (রূপকথায়)

(৮) বাতায়ন হতে উৎসুক দুই আঁখি
তব মঞ্জীর-ধ্বনি পথ বেয়ে
তোমারে কি যায় ডাকি। (আহ্বান)

(৯) পিছে পিছে তব ছায়ারৌদ্রের
খেলা গেলে তুমি খেলে। (দ্বিধা)

(১০) শুধু কুন্ঠিত বিশীর্ণ ধারা
তীরের প্রান্তে
জাগালো পিয়াসী মন। (উদ্‌বৃত্ত)
—ইত্যাদি।

গীতিকবিতার সার গীতে সমর্পিত হয় ব'লে এই ধরনের সংক্ষিপ্ত প্রায়-অর্থহীন চিত্রযোজনার মূল্য যথেষ্ট। ব্যঞ্জনার বিচিত্র বর্ণের সম্পাতে গীতের মাধুর্যকে এরা রমণীয়তর ক'রে তুলেছে।

এ কাব্যের কয়েকটি কবিতায় ছন্দ ও অনুপ্রাস-বক্রতার পূর্বদৃষ্ট শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। মাত্রাবৃত্তের ষণ্মাত্রিক পর্বে যৌগিক অক্ষরের ধ্বনি-সামঞ্জস্যময় গ্রন্থনে কবি মধ্যযৌবনের ভঙ্গিতে ফিরে গেছেন। 'কর্ণধার' কবিতায় খেলাচ্ছলে কবি-জীবনকে বরণ করার আনন্দে—

গান করে দিন উদ্দেশহীন
অকূল শূন্যতার।
···গোধূলিতে পাল তুলে দাও
ধূসরচ্ছন্দার।

প্রভৃতি পঙ্‌ক্তির মধ্যে। এখানে অন্তিম চরণে পূর্ণপর্বটিতে প্রায় সর্বত্র অনুপ্রাস-যুক্ত যৌগিক অক্ষর প্রত্যাশিত তরল রমণীয়তার কারণ হয়েছে। নিম্নলিখিত অংশে আধুনিক রমণীর রমণীয়তা-বর্ণন অনুপ্রাসে অতিশয়িত মাধুর্যের বিস্তার ঘটিয়েছে—

মৃত্যুরে দেয় টিটকারি তার হাস্যে,
মঞ্জীরে বাজে যে-ছন্দ তার লাস্যে
নহে মন্দাক্রান্তা—
প্রদীপ লুকায়ে শঙ্কিত পায়ে
চলে না কোমলকান্তা।

এরকম শব্দ ও ছন্দের অনুগামী শুদ্ধ সৌন্দর্যবিলাসের উল্লেখ্য একটি কবিতা হ'ল 'জানালায়'। মানুষ এবং প্রকৃতি দুইয়ে মিলে কবিকে নিসর্গ-আশ্রিত রম্য কল্পলোকের যাত্রী ক'রে তুলেছে। এলোমেলো বাতাসে আমলকী শাখার দোলা এবং জানালায় রৌদ্র-ছায়ার খেলা অনায়াসে মানুষের জীবন-যাত্রার ছবির সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়েছে কবির দৃষ্টিতে। প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট সুখদুঃখময় জীবন যে কবিচিত্তে শুধু একটি কল্পচিত্রে পরিণাম প্রাপ্ত হচ্ছে তা নিম্নলিখিত সংকেতবাহী শব্দ যোজনায় ও নিতান্ত মধুর অনুপ্রাস বিন্যাসে উপলব্ধ হতে পারে। 'সুরশৃঙ্গার' বস্তুধর্ম ত্যাগ ক'রে রম্যবোধের সহায়ক হয়েছে—

ছায়া দিয়ে ঢাকা সুখদুঃখের মাঝে
গুঞ্জনসুরে সুরশৃঙ্গার বাজে।

গীতিকাগুলির স্বপ্ন ও মায়াময় প্রণয়বিলাস এবং কয়েকটি কবিতার কল্পনা-সঙ্গিনীর প্রত্যক্ষতা-দুর্লভ স্মৃতিচারণার বিষয় বাদ দিয়ে যে ক'টি কবিতায় বাস্তবিক প্রণয়-কথা চিত্রিত হয়েছে তার মধ্যে 'অসম্ভব ছবি'র আবেদন সর্বোচ্চ। এর পরিবেশ, নায়িকার রূপ ও অনুভাব-চিত্র এবং নায়কের বা কবির ভাববিকার কল্পনায় অতিকৃত হয়ে মায়ামাত্রে পর্যবসিত হয় নি। বাস্তব প্রণয়ের মোহময় রক্তিমাভা এই ক্ষণিকের অভিজ্ঞতার চিত্রে বিচ্ছুরিত হয়ে এটিকে কবির প্রণয়-কবিতাসমূহের মধ্যে স্মরণীয় করেছে। 'অনসূয়া' কবিতার প্রণয় স্বপ্নবহুল ও রোম্যান্টিক, এর নায়ক-কবি প্রত্যক্ষের নায়িকাকেও প্রাচীন কাব্যস্বপ্নে বিজড়িত আদর্শে মায়াময়ীরূপে দেখতে চায়। কবিতাটি গঠনে ও সৌন্দর্যের আবেদনে 'কিনু গোয়ালার গলি'র সঙ্গে তুলনীয়। 'সম্পূর্ণ' কবিতায় কিন্তু স্বপ্নে রচিত বাস্তবেরই মাহাত্ম্য ফুটে উঠেছে। যে তরুণী এক বিয়ের বাসরে চকিত দেখায় ছিল অচেনা, তাকেই মনের রঙ্ দিয়ে নামে রূপে নূতন ক'রে গঠন করলেন, কবি আসক্ত হলেন এবং নায়িকার পূর্বরাগ-পরিচয়ে ধন্য হলেন, এই ছবিটি প্রত্যক্ষ পরিবেশ সহ অঙ্কিত হয়ে বাস্তব প্রণয়ের চারুতা ফুটিয়েছে—

অসময়ে দিই ডাক
কোনো প্রয়োজন থাক্ বা নাই-বা থাক্।
অমনি তখন কাঠিতে-জড়ানো উলে
হাত কেঁপে গিয়ে গুন্‌তিতে যাও ভুলে।

সানাইয়ের কাহিনী-মিশ্র প্রণয়-কবিতা 'পরিচয়ে'র সৌন্দর্যগত আবেদন বর্ণন-বিস্তারে বিলুপ্ত হয়েছে। মনে হয়, নারী-মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিতেই কবি অধিক ব্যগ্র হয়েছেন। 'দূরবর্তিনী' কবিতায় বরং বিবাহোত্তর প্রণয়াভাসে আক্ষেপ-প্রাপ্তা রমণীর অভিব্যক্তি বাস্তবতায় আকর্ষণীয় হয়েছে—

অলস ভালোবাসা
হারিয়েছে তার ভাষাপারের ভাষা।
ঘরের কোণের ভরা পাত্র দুই বেলা তা পাই,
ঝরনাতলার উছল পাত্র নাই।

এ ধরনের আক্ষেপ সহ সম্মিত প্রণয়তত্ত্বভাষণে দাম্পত্য অসম্মানের নায়িকাগত চিত্র ব্যক্ত হয়েছে 'শেষ কথা' কবিতায়। প্রণয়বঞ্চিতার মনশ্চিত্রের রূপায়ণে কবিতাটি মূল্যবান। কবির স্বকীয় প্রণয়ের একটি স্মৃতিচারণার কবিতা হ'ল 'হঠাৎ মিলন'—'মনে পড়ে কবে ছিলাম একা বিজন চরে'। স্বয়মাগতা নায়িকার অন্তর্ধানে কবিচিত্তের বেদনা একটা মধুর ভাবার্থ নিয়ে এসেছে মাত্র, নতুবা কবিতাটিতে চিত্রগীতের বৈচিত্র্য তেমন কিছু নেই।

'মায়া' কবিতাটি কালাতীত বিগত প্রিয়ার কবিমানসধৃত রূপ ও প্রভাবের পরিচয় দিচ্ছে। যে ছিল আবেগে উত্তাপে একদা জীবন্ত, কবির কাছে সে মায়ারূপিণী এবং কল্পমূর্তি হয়ে পড়েছে। এর নিসর্গ-রমণীয়তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার বিষয় কবি নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করছেন—

তাই তো আমার ছন্দে
সহসা তোমার চুলের ফুলের গন্ধে
জাগে নির্জন রাতের দীর্ঘশ্বাস,
জাগে প্রভাতের পেলব তারায়
বিদায়ের স্মিতহাস।

বিরহীর বেদনার পরিচয় কবিতাটিতে গীতের কারুণ্য বিস্তৃত করেছে।

'বিপ্লব' কবিতায় কবিশক্তি বা কল্পিত জীবন-সহচরীর পূর্বরূপ ও বর্তমান রূপের অলংকৃত পরিচয় দিয়ে কবি নিজ নিগূঢ় মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। পূর্বজীবনের কাব্যকল্পনার ঐশ্বর্য এই কল্পিত নারীর নৃত্য ও অভিসারের রূপকে বিবৃত হয়েছে। 'বেণী বন্ধনমুক্ত' প্রভৃতি কয়েক পঙ্‌ক্তিতে এর যৌবনমত্ত পূর্বরূপ এবং প্রগল্‌ভতা-সংহরণ এই দুই অবস্থারই চিত্র-সংকেত। বর্তমানের কল্পনা ও প্রকাশের দৈন্য সংকেতিত হয়েছে মুখর নৃত্যের সংবৃত অবস্থার

বর্ণনায়। ব্যঞ্জিত বিষয়ের থেকে কবির কল্পিত নৃত্যপ্রমত্তা এবং নৃত্যবিরতা সখীর বর্ণনাই চিত্র হিসাবে আকর্ষণীয় হয়েছে—

বেণীর বন্ধনমুক্ত উৎক্ষিপ্ত তোমার কেশজাল
ঝঞ্ঝার বাতাসে
উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম উচ্ছ্বাসে ;
বিদীর্ণ বিদ্যুৎঘাতে তোমার বিহ্বল বিভাবরী
হে সুন্দরী।

এই হ'ল কবির প্রগল্‌ভ কাব্য যৌবনোচ্ছ্বাসের মাদকতার অন্তিম পর্যায়। এর অন্যপৃষ্ঠা হ'ল সংবৃত কল্পনা ও প্রতিহত গীতোচ্ছ্বাসের বর্তমান পর্যায়। এর চিত্ররূপে প্রমত্তযৌবনা প্রাকৃতিক শক্তির—

আভরণশূন্য রূপ
বোবা হয়ে আছে করি চুপ

আর কাব্যরঙ্গভূমির অবস্থা—'বিস্রস্ত দলিত দলে বিকীর্ণ'। বস্তুতঃ কবির এই রূপকল্পনাই কবিতাটিকে আদিরসের মাধুর্যে মণ্ডিত ক'রে একটি স্থায়ী মহিমা দান করেছে। উপসংহারের কাব্যার্থে কাতরতা ত্যাগ ক'রে কবি কল্পনার উষরতাকে বা শক্তির দৈন্যকে বরণ করে নেবেন এই ভাব ব্যঞ্জিত হয়েছে, অথচ প্রণয়কেলিকুটিলতার মণ্ডনচাতুর্যে ভাবার্থ নিতান্ত গৌণ হয়ে কবিতাটিকে দ্বিতীয় রীতির ধ্বনিকাব্যের উত্তম দৃষ্টান্তে পরিণত করেছে। শেষ দুই চরণে দুঃখবরণের প্রয়াস চিহ্নিত হলেও উৎসাহ ক্ষীণ হয়ে শঙ্কা দৈন্যাদির ব্যভিচারি-মিশ্রিত কারুণ্যই প্রকট হয়ে উঠেছে—

বেজে ওঠে ডঙ্কা শঙ্কা শিহরায় নিশীথ গগনে—
হে নির্দয়া, কী সংকেত বিচ্ছুরিল স্খলিত কঙ্কণে।

কবিতাটিতে কবির কল্পসৌন্দর্যনির্মাণশক্তির এবং শব্দসংঘাতবৈচিত্র্যের শেষ নিদর্শন রক্ষিত হয়েছে।

সানাইয়ের একটি পরিচ্ছন্ন প্রসাদগুণসমন্বিত কবিভাবনার কবিতা হ'ল 'মানসী'। এতে পদ্মাতীর-সংসর্গে উচ্ছ্বসিত নিরুদ্দেশ ব্যাকুলতা ও পর পর্যায়ের অরূপানুভবের রমণীয় বর্ণনা দিয়ে কবি এই শেষ জীবনের পরিবর্তিত কল্পনা ও ভাষার নিম্নলিখিত সৌন্দর্যরূপ বিন্যস্ত করেছেন—

শীতের কৃপণ বেলা যায়।
ক্ষীণ কুয়াশায়

অস্পষ্ট হয়েছে বালি।
সায়াহ্নের মলিন সোনালি
পলে পলে
বদল করিছে রঙ মসৃণ তরঙ্গহীন জলে।

পরিশেষে পূর্ব কাব্যজীবনের নিসর্গ ভাবোচ্ছ্বাসময় কাব্যস্বপ্নের প্রতি কবির বেদনাময় মমত্ববোধ বিকীর্ণ হয়েছে—

অফলিত প্রতীক্ষার সেই গাথা আজি
কবিরে পশ্চাতে ফেলি শূন্যরথে চলিয়াছে বাজি।
কোথায় রহিল তার সাথে
বক্ষ-স্পন্দে-কম্পমান সেই স্তব্ধ রাতে
সেই সন্ধ্যাতারা।

কবিতাটি কাব্যস্মৃতিচারণার এবং কবি-মানস ব্যাখ্যানের হ'লেও অনুরাগ-স্পর্শে চিত্তহারী হয়েছে। 'সানাই' কবিতাটি কবির বস্তুত অতীত ইন্দ্রজাল-সৃষ্টিকার্যের বার্তাবহ। উৎসবের বস্তুচিত্রের ভূমিকায় কবির অলক্ষ্য, সুদূর, অনন্ত প্রভৃতি রোম্যান্টিক অনুভবের নির্দেশ অর্থবান হয়ে উঠেছে। কবিতাটির কথঞ্চিৎ রমণীয়তা উদ্ভূত হয়েছে কবি-কল্পিত আনন্দবোধের চিত্ররূপ উপস্থাপনে—

বসন্তের যে দীর্ঘনিশ্বাস
বিকচ বকুলে আনে বিদায়ের বিমর্ষ আভাস,
সংশয়ের আবেগ কাঁপায়
সদ্যঃপাতী শিথিল চাঁপায়
তারি স্পর্শ লেগে
সাহানার রাগিণীতে বৈরাগিণী ওঠে যেন জেগে

এই 'সানাই' কবিতাটির মর্মই যে সানাইয়ের সর্বত্র অভিব্যক্ত হয়েছে এমন নয়, তবে নিসর্গস্বপ্ন এবং প্রণয়মোহের রূপায়ণে বাস্তবের অতিরিক্ততার সংযত ধীর লয় কবিতাগুলিকে একালে দুর্লভ সহজ রম্যতায় সজ্জিত করেছে।

'রোগশয্যায়' সংকলনে বাস্তবিকপক্ষে রুগ্নাবস্থার সম্ভাব্য কিছু ধারণা ও কল্পনা এবং তদুচিত চিত্রদর্শন পরিস্ফুট হয়েছে। এ কাব্যে কবির-কাছে-চাওয়া আমাদের নবীনতার দাবি কবি ঐভাবে রক্ষা করেছেন। পাঁচ সংখ্যক

এবং নয় সংখ্যক কবিতা দুটিতে যন্ত্রণাময় দৈহিক অবস্থার মধ্যে লব্ধ নব কল্পচিত্র-সমূহের পরিচয় পাওয়া যাবে—

এই মহাবিশ্বতলে
যন্ত্রণার ঘূর্ণযন্ত্র চলে
চূর্ণ হতে থাকে গ্রহতারা।
দিক্-বিদিকে অস্তিত্বে বেদনারে
প্রলয়দুঃখের রেণুজালে
ব্যাপ্ত করিবারে ছোটে প্রচণ্ড আবেগে।
পীড়নের যন্ত্রশালে
চেতনার উদ্দীপ্ত প্রাঙ্গণে
কোথা শেল শূল যত হতেছে ঝংকৃত…
এ দেহের মৃৎভাণ্ড ভরিয়া
রক্তবর্ণ প্রলাপের অশ্রুস্রোতে করে বিপ্লাবিত।

এই পাঁচ সংখ্যক কবিতার শেষের দিকে মানবের দুঃখ-সহন-মহিমা ও সেবা-প্রেমের গৌরব প্রকাশিত হয়েছে। নয় সংখ্যক কবিতাটি পীড়াকাতর রাত্রির বর্ণনা। এর মধ্যে সৃষ্টির বিকৃত দিক কবির লক্ষ্যগোচর হয়েছে। রাত্রির রূপে নবজাতকের 'রাত্রি' তুলনীয়। সৃষ্টির অসম্পূর্ণতা বিকৃতি এবং যন্ত্রণা-দুঃখের চিত্র পূর্ব-উল্লিখিত চিত্রের চেয়ে অধিক আকর্ষণীয়—

পঙ্গু উঠিতেছে কাঁদি নিদ্রার অতল-মাঝে,
আত্মপ্রকাশের ক্ষুধা বিগলিত লৌহগর্ত হতে
গোপনে উঠিছে জ্বলি শিখায় শিখায়।

ভূগর্ভ-অভ্যন্তরের রূপে অসম্পূর্ণের সম্পূর্ণ হওয়ার এবং অব্যক্তের ব্যক্ত হওয়ার কল্পনা মিশ্রিত হয়েছে—

আদিমহার্ণব গর্ভ হতে
অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে
প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড,
বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ—
অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে —ইত্যাদি।

পনেরো সংখ্যক কবিতায় ('অসুস্থ শরীরখানা') কবি রুগ্নাবস্থায় প্রকাশের দৈন্য এইভাবে অনুভব করেছেন—

বাণীর ক্ষীণতা
মুহ্যমান আলোকেতে রচিতেছে অস্পষ্টের কারা।...
তোমার আমার রুগ্ন বাণী
স্পর্ধা হারায়েছে তার...
আত্মগত ক্লিষ্ট জীবনের কুহেলিকা
তাহার বিশ্বের দৃষ্টি করেছে হরণ।

কখনও দেখেছেন তাঁর নামখ্যাতি-যুক্ত বহিঃসত্তার আবরণ খসে গেল, ভাবি-জীবনের জন্য উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার ব্যাকুলতা পুনশ্চ তাঁকে অধীর করে তুললে, কখনও বা প্রসন্ন বৈরাগ্যের দৃষ্টিতে তিনি নিজের কাছে তাঁর কাব্যকীর্তির মহিমাকে অশ্রদ্ধেয় ব'লে মনে করলেন এবং পৃথিবীকে ভালোবাসার মধ্যেই তাঁর অস্তিত্বের চরম মূল্য নির্ধারণ করলেন। এসব ধারণা এবং চৈতন্যস্বরূপের মুক্তির আগ্রহ প্রভৃতি অনুরূপ ভাবুকতার আধারে গ্রথিত 'প্রান্তিকে' বরং কিছু কিছু চিত্রসমন্বিত উত্তম প্রকাশ লাভ করেছে।

আরোগ্যের কয়েকটি কবিতায় নিসর্গপ্রীতিরসিক ও মানবপ্রেমব্যাকুল কবির নিরতিশয় সহজ ও প্রসন্ন উচ্চারণের দীপ্তি পাঠকমাত্রকেই আকৃষ্ট করবে। আরোগ্যের কবিতাসমূহে বাক্য সংক্ষিপ্ত, বক্তব্য ভাবের জটিলতা থেকে মুক্ত, উচ্চতর কল্পনা প্রায়শই পরিত্যক্ত। কল্পনা থেকে সহানুভূতি এবং প্রীতি, নিগূঢ়তা থেকে পরিস্ফুটতাই কবিচিত্তের স্বরূপ-লক্ষণ হয়ে উঠেছে।

প্রথম কবিতায় গীতময় রীতিতে কবি অকুণ্ঠভাবে প্রীতি দৈন্য ও বৈরাগ্যের পরিচয় দিচ্ছেন—

শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব ধরণীর
বলে যাব, তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে।

দ্বিতীয় কবিতায় 'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ' এই উপলব্ধির মূলে কবির স্বকীয় নিসর্গপ্রীতির পরিচয় মূল্যবান হয়েছে—

মিলিয়া শ্যামলে নীলিমায়
ধরণীর উত্তরীয়
বুনে চলে ছায়াতে আলোতে।...
প্রভাতের কণ্ঠ হতে মণিহার করে ঝিলিমিলি
বন হতে বনে।

নিরলংকার স্বভাবোক্তির এরকম চারুতা আরোগ্যের সব কবিতার মধ্যেই লক্ষণীয় হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। এখন থেকে অক্ষরমাত্রিক ছাড়া অন্যরীতির ছন্দোগ্রন্থন দুর্লভ বললেই চলে। আর প্রায়শই এক-পর্ব এক-চরণ রীতি কবিতাবন্ধে অনুসৃত হয়েছে।

তিন সংখ্যক কবিতায় পদ্মাতীর-স্মৃতিচারণার শেষে কবির নিসর্গ-সৌন্দর্য-অনুরাগ উচ্ছ্বসিত হয়ে স্মরণীয় নিম্নলিখিত তিন পঙ্‌ক্তিতে অনায়াসে নিঃশেষিত হয়েছে—

ভাষা নাই, ভাষা নাই;
চেয়ে দূর দিগন্তের পানে
মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডুনীল মধ্যাহ্ন-আকাশে।

চার সংখ্যক 'ঘণ্টা বাজে দূরে' প্রভৃতি নিসর্গপ্রীতিতন্ময় কবির দুটি স্মৃতি-চিত্রকে অক্ষয় ক'রে রেখেছে। এর মধ্যে একটি পদ্মাতীরভূমির, সম্ভবতঃ শাজাদপুর-বাসের এবং অন্যটি গঙ্গাতীরভূখণ্ডের, নিঃসন্দেহে গাজিপুরবাসের। অতি-পুরাতন স্মৃতির উদ্বোধন পৃথিবীপ্রীতির মধ্যে পর্যবসিত হয়ে সেই সঙ্গে পৃথিবী-বিরহের রমণীয় ভাবও সঞ্চারিত করেছে—

এই সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।

যাত্রী কবির চিরবিদায়ের বেদনা ও বৈরাগ্যের রাগিণী শ্রুতিগোচর হয়েছে আট সংখ্যক কবিতার নিম্নলিখিতরূপ পঙ্‌ক্তিতে। পথ, পান্থশালা, মন্দিরচূড়া প্রভৃতি চিত্র-সংকেতের কাজ করেছে—

পথরেখা লীন হ'ল অস্তগিরিশিখর-আড়ালে,
স্তব্ধ আমি দিনান্তের পান্থশালা-দ্বারে,
দূরে দীপ্তি দেয় ক্ষণে ক্ষণে
শেষতীর্থমন্দিরের চূড়া।

দশ সংখ্যক 'অলস সময়-ধারা বেয়ে' প্রভৃতি একালের আকর্ষণীয় কবিকৃতির নিদর্শন। কবিতাটি কবির সাধারণ মানুষপ্রীতির পরিচয়ে খ্যাতিলাভ করেছে। আমরা কবিতাটিকে চিত্রযোজনার বৈশিষ্ট্যে রমণীয় এবং প্রীতির ও ভাবদৃষ্টির স্পর্শে সম্পূর্ণ ব'লে মনে করেছি। রাষ্ট্রশক্তির নিরর্থকতা এবং সাধারণ কর্মী মানুষের জয়-ঘোষণার কবিতা আরও অনেক আছে। কবিতাটির প্রথম

অংশে রাষ্ট্র-স্বার্থলুব্ধ প্রতাপ-সম্বল মানুষের ছবি আঁকা হয়েছে—

আসিয়াছে দলে দলে
লৌহ-বাঁধা পথে
অনলনিশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ

এ চিত্রটি সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ। যে ভাবানুভূতির স্পর্শে এ চিত্র অধিকতর রমণীয় হয়েছে তা হ'ল—

জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্ক-লোকের পথে লেশমাত্র চিহ্ন রাখিবে না।

এর পরবর্তী অংশের কর্মী জনতার জীবনচিত্র স্থমিত সংযত ভাষণে নিরলংকার স্বভাবোক্তিতে মাধুর্য লাভ করেছে—

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল
ওরা মাঠে মাঠে,
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে···
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে
পাঞ্জাব-বোম্বাই-গুজরাটে।

কিন্তু এ অংশেও কেবল অসংলগ্ন চিত্র নেই, এর মধ্যে কবির নিগূঢ় সহানুভূতির বর্ণসম্পাত ফুটে উঠেছে, ফলে গীতসমন্বিত চিত্রই মহিমা লাভ করেছে। বৈপরীত্যে গ্রথিত রাষ্ট্রিক প্রতাপের তুচ্ছতার পরিচিতিও অলংকৃত বাক্যের আশ্রয়ে রমণীয় হয়ে সাধারণ মানুষের গৌরবময় অবিনশ্বরতার ভাব পরিস্ফুট করতে সাহায্য করেছে—

রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ় সম অর্থ তার ভোলে,
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।

রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের প্রতি কবির ঘৃণা আমাদের পরিচিত। এখানে কিন্তু বিদ্বেষ তীব্র হয়ে প্রকাশ পায় নি, অভিপ্রেত তুচ্ছতা মাত্র অভিব্যক্ত হয়েছে।

অক্ষরমাত্রিক ছন্দের ছয় আট এবং ক্কচিৎ দশের পর্ব ও সুমিত মিলের বিন্যাসে কবিতাটির সংযত গতি বিস্ময়-মিশ্রিত প্রীতির ভাব ব্যঞ্জিত করতে সহায়তা করেছে।

নয় সংখ্যক 'বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে' প্রভৃতিতে সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে সুখদুঃখময় বিচিত্রবর্ণ মানুষেব জীবনকে দেখায় কবিচিত্তে যে রমণীয় অনুভব জন্মেছে কবি তার স্বাদের অংশ আমাদের দিতে চেয়েছেন। বৈশিষ্ট্য এই যে, জীবনকে কোনও নিগূঢ় অর্থে মহীয়ান করে কবি অনুভব করছেন না, আবার 'a tale told by an idiot' ব'লেও মনে করছেন না, অজানা কোনও বিরাট শক্তির মধ্যে সৃষ্টির যাবতীয় বিলয়কে সমাহিত দেখছেন। তবু নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলি স্তরের অনুভবের সদৃশ কোনও স্থির প্রত্যয় যে কবির রয়েছে এও মনে হয় না। পূর্বসংস্কার কবিচিত্তে বাহিত হয় নি। এ ক্ষণিকের শুদ্ধ ও রমণীয় ভাবুকতা-বিশেষ ও একটি বিশেষ দৃশ্যের কল্পনা মাত্র—

দেখিলাম যুগে যুগে নটনটী বহু শত শত
ফেলে গেছে নানারঙা বেশ তাহাদের
রঙ্গশালা-দ্বারের বাহিরে।
দেখিলাম চাহি
শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাঙ্গণে
নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী।

'রঙ্গমঞ্চ' 'নেপথ্য' প্রভৃতির রূপক নিজ নিজ প্রয়োজনে বহু কবিই ব্যবহার করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথও করেছেন নানা স্থানে। এই উপমান ক্লাসিক হয়ে পড়েছে। কাছাকাছি সময়ে লেখা 'জন্মদিনে' কাব্যের পাঁচ সংখ্যক কবিতায় সৃষ্টির ও নিজের অস্তিত্ব ও বিকাশ সম্পর্কে বিস্ময়বোধের মধ্যে কবি পুনশ্চ এই রূপক-চিত্রের অঙ্কন আবশ্যক মনে করেছেন, যেমন—

অপূর্ব আলোকে
মানুষ দেখিছে তার অপরূপ ভবিষ্যের রূপ,
পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা—
আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ।

বারো সংখ্যক কবিতায় ব্যক্তিগত দুঃখ কিভাবে নিখিলের সঙ্গে সম্মিলনে আনন্দরূপ পরিগ্রহ করলে সেই একমুহূর্তের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে।

কবিতাটিতে 'নৈবেদ্যে' অনুভূত উদার গম্ভীর ভাবসমৃদ্ধি লক্ষণীয়। তেরো সংখ্যক কবিতায় কবির যৌবনে ও প্রথম কাব্য-জীবনে অনুপ্রবিষ্ট প্রেমের স্বভাব বিবৃত হয়েছে এবং তা থেকে একালের ভালোবাসার পার্থক্য সূচিত করা হয়েছে। পূর্বেকার প্রণয়কে কবি বিদ্রোহী বলেছেন, দেখেছেন প্রত্যক্ষ ও পরিমিতের মধ্যে তা বদ্ধ ছিল না। তা যদি অনির্বচনীয়-স্বভাব হয়, একালের ভালোবাসা হ'ল প্রত্যক্ষ নিখিলের সঙ্গে প্রীতির যোগে মধুর। কবিতাটি বাচ্যার্থ-প্রধান। এরকম অর্থময়, সুতরাং রম্যতার আতিশয্যহীন কয়েকটি কবিতা পনেরো থেকে পরপর রয়েছে। এরকম কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রের এই কল্পনারশ্মির সংযমনের কালে আমাদের পুনঃপুনঃ সাক্ষাৎকার ঘটেছে। এরই মধ্যে ছাব্বিশ সংখ্যক—'একথা সেকথা মনে আসে'—কবির খেয়ালি স্বপ্ন-বাসনার চিত্র সম্পদ ও ভাব-মাধুর্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছে। কবি এই স্বভাবের বর্ণনায় বলছেন—

> কখনো রূপালি আঁকে, কখনো ফুটায়ে তোলে সোনা।
> অদ্ভুত মূর্তি সে রচে দিগন্তের কোণে···
> স্বপ্নের এ পাগলামি বিশ্বের আদিম উপাদান।

অবশ্য শেষে কবি সাহিত্যিকের বিশেষে অহংমন্যদের শ্রোতব্য মূল্যবান নিজ অভিজ্ঞতার বিষয় জানিয়েছেন—

> কর্তৃত্ব প্রচণ্ড বলশালী।
> শিল্পের নৈপুণ্য এই উদ্দামেরে শৃঙ্খলিত করা,
> অধরাকে ধরা।

নিঃসন্দেহে আত্মভাবুকতাময় গীতিকাব্যকেও রূপে-রসে সর্বজনীন হতে হবে। নিতান্ত ব্যক্তিচৈতন্যলীন এবং বাহ্য অহংএর আবিলতায় মলিন কবিতা পাঠক-সমাজকে বঞ্চিত করে। গীতিকবি কিভাবে আত্মকেন্দ্রিকতার ত্রুটি থেকে আত্মরক্ষা করবেন? তারই জবাব স্থিতপ্রজ্ঞ কবি দিয়েছেন—কবিকে মুখ্যতঃ আর্টিস্ট হতে হবে। এই খেয়ালি-মনের ক্ষণিক খেলার স্বভাব জানিয়ে কবি আটাশ সংখ্যক 'মিলের চুমকি গাঁথি' কবিতাটিতেও আমাদের মনোহরণ করেছেন। কবি বলছেন—

> অর্থ-ভরা কিছুই-না
> চোখে করে ওঠে ঝিলমিল
> ছড়াটার ফাঁকে ফাঁকে মিল।

এই সূত্রেই আরোগ্যের অন্ততঃ কয়েকটি কবিতা-কণিকার ক্ষণিক-ভাবনা-

বিচ্ছুরণের মূল্য অনুভব করতে হবে, যেমন, 'অলস শয্যার পাশে' কিংবা 'বিরাট মানবচিত্তে'।

ভাষারীতির একরকম আদিম সারল্য যেমন 'আরোগ্য' কাব্যের তেমনি **'জন্মদিনের'** রচনাগুলিতে অনুভবগম্য। তবু 'জন্মদিনে' কাব্যে সারল্যের মধ্যে ঐশ্বর্যের সাক্ষাৎ দুর্লভ নয়। তা ছাড়া ভাষাপ্রবাহের একটা মুক্তবন্ধ উৎসারও অনুভব করা যায়। এর মধ্যে ছড়ার বা মাত্রাবৃত্তের দুএকটি নির্মাণও লক্ষণীয় এবং শব্দগ্রন্থন-পারিপাট্যও স্থানে স্থানে উপভোগ্য। কবি তাঁর এই ক্ষণিকের অর্থ ও ধ্বনির প্রগল্‌ভতা স্বয়ং অনুভব ক'রে আতিশয্য সহকারে বলছেন—

মোর চেতনায়
আদিসমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায়;
অর্থ তার নাহি জানি,
আমি সেই বাণী।
শুধু ছলছল কলকল;
শুধু সুর, শুধু নৃত্য, বেদনার কলকোলাহল;
শুধু এ সাঁতার—
কখনো এ পারে চলা, কখনো ও পার,
কখনো বা অদৃশ্য গভীরে,
কভু বিচিত্রের তীরে তীরে।
ছন্দের তরঙ্গদোলে
কত যে ইঙ্গিত ভঙ্গী জেগে ওঠে, ভেসে যায় চলে।

কবিতাটিতে কবির অবচেতন মনোরহস্যের পরিচয় কিছু মিলবে এবং তাঁর স্বপ্ন-কল্পনার নির্মাণশালার রমণীয় রূপও লক্ষ্যগোচর হবে। কবির উপর—অর্থে, ধ্বনিতে ইঙ্গিতে, কৌশলে যা অপরূপ—চলিতে, সাধুতে, ব্যাকরণে স্খলনে, যা গতিশীল—সেই আদিম ধ্বনির প্রভাব নিম্নলিখিত অংশে অনুভূত হবে—

মনে ভাবিতেছি যেন অসংখ্য ভাষার শব্দরাজি
ছাড়া পেল আজি,
দীর্ঘকাল ব্যাকরণ-দুর্গে বন্দী রহি
অকস্মাৎ হয়েছে বিদ্রোহী,
অবিশ্রাম সারি সারি কুচকাওয়াজের পদক্ষেপে
উঠেছে অধীর হয়ে খেপে।

লঙ্ঘিয়াছে বাক্যের শাসন,
নিয়েছে অবুদ্ধিলোকে অবদ্ধ ভাষণ,
ছিন্ন করি অর্থের শৃঙ্খলপাশ
সাধু সাহিত্যের প্রতি ব্যঙ্গহাস্যে হানে পরিহাস।
সব ছেড়ে অধিকার করে শুধু শ্রুতি—
বিচিত্র তাদের ভঙ্গি, বিচিত্র আকৃতি।......

অসংলগ্ন, অর্থহীন, বিশৃঙ্খল আদিম ধ্বনির এই বিজয়গাথা ইতিপূর্বে গীত হয় নি, যদিচ গদ্যে পদ্যে নানাভাবে অর্থহীন ধ্বনির গুরুত্ব সম্পর্কে ইন্দ্রিয়ানুভব-প্রধান কবি কিছু কিছু বলেছেন (তু° 'ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা'—মানসী)। নিরর্থক ধ্বনির এবং কেবল-ধ্বনির স্থায়ী আসন একালে কবির মনস্তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, এর সবচেয়ে ভালো প্রমাণ হ'ল "ছড়া" এবং "খাপছাড়া"। এগুলিতে শুধু মিলের অনুগত অদ্ভুত শব্দনির্মাণের দৃষ্টান্ত মিলবে। মাত্র ধ্বনিরসিক শিশুমনকে যদি একবার অবচেতন থেকে আমরা কিছুক্ষণের জন্য জাগিয়ে তুলতে পারি তাহ'লেই এই প্রলাপময় ধ্বনিলোকে কবির মত আমরা নবজীবনের স্বাদ পেতেও বা পারি—

মনে মনে দেখিতেছি সারা বেলা ধরি
দলে দলে শব্দ ছোটে অর্থ ছিন্ন করি—
আকাশে আকাশে যেন বাজে
আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।

এ কাব্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালীন ব'লে কয়েকটি কবিতায় কবির অন্যায়-বিরোধী মানবমুখী মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। তা ছাড়া একটি কবিতায় (২২) ইংরেজ-শাসনের প্রজাশোষণও কবিকে আত্মভাব-প্রকাশের অবসর দিয়েছে। কোনও গূঢ় সংকেত বা উচ্চ কল্পনাপ্রবণতা এ কবিতাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে নি, সুতীক্ষ্ণ অসংকোচ স্পষ্ট উক্তিই এগুলির বৈশিষ্ট্য। এগুলির কাব্যবিন্যাস সম্পর্কে যে-নীতি অনুসৃত হয়েছে, কবি পূর্বাহ্নেই তা উপমাসহকারে বিবৃত করেছেন—'যেন রসনায় মম সত্যবাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গসম তোমার ইঙ্গিতে'। এরই মধ্যে লক্ষণীয় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে চব্বিশ সংখ্যার কবিতা 'পোড়ো বাড়ি, শূন্য দালান—' প্রভৃতি। এর সবটাই অসংলগ্ন খেয়ালের এবং সেই জন্যই খেয়ালি সমালোচকের এতে আসক্তি। বস্তুতঃ খেয়ালখুশীর রূপনির্মাণের স্বরূপই এতে পরিস্ফুট হয়েছে, যেমন হয়েছে আকাশ-প্রদীপের

'সময়হারা' 'ঢাকিরা ঢাক' অথবা নবজাতকের 'অস্পষ্ট' কবিতায়। 'পোড়ো বাড়ি' কবিতাটির একটা পরিবেশ-ভূমিকা রয়েছে, যা রচনাগুণে বাস্তবতাকে লঙ্ঘন ক'রে অস্পষ্ট হতেই চেয়েছে—

> পোড়ো বাড়ি, শূন্য দালান—
> বোবা স্মৃতির চাপা কাঁদন হুহু করে,
> সারা দিনের কবর-দেওয়া ভিতের অন্ধকার।

একটা গলির কথাও রয়েছে, কিন্তু তার মূর্তি ঢাকা পড়ে গেছে চিকের আবরণে, আর গলির আকাশে কোনও একটা সংকেত বেজে ওঠে, কিন্তু তা শুধু ধ্বনিময়—

> পাশের গলির চিক-ঢাকা ঐ ঝাপসা আকাশতলে
> হঠাৎ যখন রণিয়ে ওঠে
> সংকেতঝংকার

এর সঙ্গে শিল্পী বা রূপকারের চারিত্র্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি নিঃসন্দেহে তাকে বস্তুগত জীবনের দৈন্যের ও অর্থ-প্রতিষ্ঠার উপরেই স্থান দিয়েছেন এবং সাহিত্য-রচনায় শিল্পের মহিমার বিষয়ও উপস্থাপিত করেছেন, কিন্তু এসব বক্তব্যও কবিতাটিতে আত্যন্তিক হয়ে ফোটে নি, কবির খাপছাড়া স্বপ্ন-বিজল্পিতের অদ্ভুতচিত্রগত রসপরিবেশনই অধিকতর অর্থময় হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে—

> মনের মধ্যে ঘোলা-স্রোতের জোয়ার ফুলে ওঠে,
> ভেসে চলে ফেনিয়ে-ওঠা অসংলগ্নতা।
> রূপের বোঝাই ডিঙি নিয়ে চলল রূপকার
> রাতের উজান স্রোত পেরিয়ে
> হঠাৎ-মেলা ঘাটে।
> ডাইনে বঁয়ে সুর-বেসুরের দাঁড়ের ঝাপট চলে,
> তাল দিয়ে যায় ভাসান-খেলা শিল্পসাধনার।

ছন্দোবিধি লঙ্ঘনের মধ্যে বোধহয় এরকম কবিতার অসামান্যতা রক্ষিত হয়েছে।

'জন্মদিনে'র বেশ কয়েকটি কবিতায় দেখা যায় গীতিকবির আত্মভাবুকতাকে ঘিরে রয়েছে দিনশেষের অনুভব। এগুলিকে ঠিক তত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখা চলে না, কবি তত্ত্ব করেনও নি, কল্পনায় ও অনুমানে যা পেয়েছেন তা-ই ছন্দে

গ্রথিত এবং চিত্রে রূপময় ক'রে তোলবার প্রয়াস করেছেন। এ-প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষণীয় হ'ল কবির সংযত অথচ গভীর পৃথিবী ও মানুষের প্রতি অনুরাগ এবং অকাতরে বিদায়কে বরণ করার আগ্রহ। এই মনোভাবের সঙ্গে বিদায়ের কারুণ্য যুক্ত হয়ে কবিতাগুলিকে শুধু শ্রোতব্য এবং বিশ্লেষণের বিচারের অযোগ্য ক'রে তুলেছে। এর মধ্যে আমরা দুটি কবিতার উল্লেখ করতে পারি যা শোনামাত্র করুণ মাধুর্যে চিত্তকে আবিষ্ট করে রাখে এবং কাব্যকে ছাড়িয়ে কবিব্যক্তি পর্যন্ত পাঠকের অনুরাগ প্রসারিত করে। একটি হ'ল 'আরবার ফিরে এল উৎসবের দিন'। এর প্রকাশাবস্থায় লেখক আর দুর্নিরীক্ষ্য সহস্রশীর্ষ হিমাদ্রি নন, তিনি আমাদের আত্মীয়, দ্রুত অগ্রসর বিদায়-দিনের কল্পনায় বিধুর—

> জানি, জন্মদিন
> এক অবিচিত্র দিনে ঠেকিবে এখনি,
> মিলে যাবে অচিহ্নিত কালের পর্যায়ে।
> পুষ্পবীথিকার ছায়া এ বিষাদে করে না করুণ,
> বাজে না স্মৃতির ব্যথা অরণ্যের মর্মরে গুঞ্জনে
> নির্মম আনন্দ এই উৎসবের বাজাইবে বাঁশি
> বিচ্ছেদের বেদনারে পথপার্শ্বে ঠেলিয়া ফেলিয়া।

অন্য কবিতা হ'ল বারো সংখ্যক 'করিয়াছি বাণীর সাধনা'। এর মধ্যে বিষাদ বেদনা নেই, কারুণ্যের স্পর্শ অবশ্য আছে, কিন্তু বৈরাগ্যময় শান্তের নিবিড়তাই প্রধান হয়ে শেষজীবনের কবি-ভাবনার সম্পূর্ণ একটি চিত্র উন্মুক্ত করেছে। এই বিচ্ছেদ-বিরহ-স্পৃষ্ট বৈরাগ্যের মুখে কবি তাঁর সাহিত্য-কীর্তিকে ঔদাসীন্যের মনোভাব নিয়ে দেখেছেন—

> করিয়াছি বাণীর সাধনা
> দীর্ঘকাল ধরি,
> আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস করি। ······
> আজ সব কথা
> মনে হয়, শুধু মুখরতা। ······
> দিনশেষে কর্মশালা ভাষা রচনার
> নিরুদ্ধ করিয়া দিক দ্বার।

স্বনাম-প্রেম ও লোকখ্যাতিকে তুচ্ছ করার মনোভাব পূর্বেই বহু কবিতায় কবি প্রবলভাবে ব্যক্ত করেছিলেন, এখন অত্যন্ত সহজে বলার জন্য আন্তরিকতা

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাহিরে সহজ-নিরলংকার অথচ অভ্যন্তরে বক্রোক্তিময় যেসব লিখনভঙ্গি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তির নিদর্শন হয়ে থাকে তার পরিচয় নিম্নলিখিতরূপ পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে রক্ষিত হয়েছে—

আসন্ন বর্ষের শেষ। পুরাতন আমার আপন
শ্লথবৃন্ত ফলের মতন
ছিন্ন হয়ে আসিতেছে। অনুভব তারি
আপনারে দিতেছে বিস্তারি
আমার সকলকিছু-মাঝে।
প্রচ্ছন্ন বিরাজে নিগূঢ় অন্তরে যেই একা,
চেয়ে আছি পাই যদি দেখা।
পশ্চাতের কবি
মুছিয়া করিছে ক্ষীণ আপন হাতের আঁকা ছবি।

যাঁরা কবির শেষজীবনের মূল্যবান কোনও বাণী শুনতে চান তাঁদের এই নিঃসঙ্গ যাত্রীর গীতসদৃশ কবিভাবনার অন্তরঙ্গ হবার অনুরোধ জানাই। হ'লে দেখবেন, বাণী থেকেও নেই, শেষ পর্যন্ত অনির্বচনীয় রম্যতাতেই চিত্ত নিবদ্ধ হয়ে পড়ছে। পরবর্তী নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তি দুটিতে সংহত অথচ সম্পূর্ণ চিত্রের সঙ্গে অনুচ্ছ্বসিত গীতমাধুর্যের যোগে যে রম্যতা ফুটে উঠেছে তাকে গৌণ ক'রে কোন্ অরসিক উপনিষদের তত্ত্ব খুঁজে বেড়াবে?—

সুদূর সম্মুখে সিন্ধু, নিঃশব্দ রজনী,
তারি তীর হতে আমি আপনারি শুনি পদধ্বনি।

কবির সংস্কারহীন এই স্বচ্ছ অনুরাগের শ্রেষ্ঠ দলিল রক্ষিত হয়েছে 'ঐকতান' কবিতায়। কবিতাটি রচনা-মাহাত্ম্যে কবির সৃষ্টিসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি ব'লে সাধারণ্যে গৃহীতও হয়েছে, কিন্তু সে কি কবির কোনও যুক্তিবিন্যস্ত সুশৃঙ্খল সিদ্ধান্তের জন্য? সন্দেহ নাই, কবিতাটিতে কবি তাঁর কাব্যজীবনের এবং কবিস্বরূপের প্রায় যথাযথ পরিচয় সংক্ষেপে নিবদ্ধ করেছেন এবং বাচ্যার্থে অবহেলিত সাধারণ মানুষের জীবনের শরিক না হতে পারার আক্ষেপ প্রকাশ ক'রে এর জন্যে কর্মী মানুষের জীবন থেকে উদ্ভূত ভিন্নতর কবির প্রয়োজনও অনুভব করেছেন, কিন্তু এই বক্তব্যকে ছাপিয়ে দৈন্য-খ্যাপনের মধ্যে কবির অকপট অনুরাগের সুরই প্রবল হয়ে কবিতাটিকে কাব্যসৌন্দর্যে সমুত্তীর্ণ করে দিয়েছে। 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি'—

এই কথাটিই কবির রোম্যান্টিক স্বভাবের লক্ষণ। পরবর্তী পঙ্ক্তিগুলিতে এই স্বভাবেরই বিশ্লেষণ চলেছে। 'এই স্বর-সাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক' এ একদিকে বিশ্বের সর্বকবিসাধারণ সত্য কথা অন্যদিকে অতিশয়িত দৈন্য। এর পর কবি যেখানে মানুষের পরিচয় দিচ্ছেন সেখানেও সাধারণ যুক্তিমত্তাকে অগ্রাহ্য ক'রে বাণীবন্ধনের গৌরব ও অর্থের অলংকারযুক্ত রমণীয়তাই আমাদের আকর্ষণের কারণ হয়েছে, যেমন—'সবচেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে' 'না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা' 'গেলেও বিচিত্রপথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী' 'ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি'। 'জীবনে জীবন যোগ করা'র সত্যমূল্য না দিয়েই সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জনের প্রয়াস অথবা ভঙ্গিমাত্র-সম্বল নকল মানুষ-দরদীদের রচনাকে সাহিত্য ব'লে কবি স্বীকার করছেন না· এই বাচ্যার্থটুকু খুব স্পষ্টভাবে যদিচ প্রকাশলাভ করেছে, তবু এ প্রতিধ্বনিত করছে সহানুভূতিতে আর্দ্র মানবানুরাগকেই। বাচ্যার্থকে মুখ্য ব'লে এখানে স্বীকার করা যায় না, বাচ্যার্থের যে বক্রতা রয়েছে তা ভাবধ্বনির মধ্যে সমাহিত হচ্ছে। শেষ স্তবকে যেমন—'প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার' 'মূক যারা দুঃখে সুখে' প্রভৃতি বর্ণনায় কবির চিরপ্রসিদ্ধ মমত্বের সুর উচ্ছলিত হয়েছে, তেমনি অখ্যাতজনের কবিকে আহ্বান জানানোর মধ্যেও। এতক্ষণ যা আভাসে ব্যক্ত হচ্ছিল তা-ই এই অংশে ঘনীভূত হয়ে পরম রমণীয় কাব্যানন্দ স্ফুরিত ক'রে সমাপ্ত হয়েছে। এই অংশে পাঠক এই কয়টি শব্দের বক্রতার মধ্যে প্রয়োগ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন—গানহীন, মরুভূমি, ঐকতান, একতারা, কাছে থেকে দূরে, নমস্কার। কবিতাটি কবির শেষ আশ্চর্য সৃষ্টি ব'লে, এটিকেই বাঙলার ভাবী কাব্যরসিকদের হাতে তুলে দেওয়া কবির শেষ উপহার বলে মনে করা যায়।

আর একবার রবি-প্রদক্ষিণ শেষ হ'ল। অবশ্য এবার—পৃথক কারণে। কবির 'শেষ লেখা'গুলিকে আমাদের স্থূলহস্তাবলেপ থেকে দূরে রাখছি। এগুলি সম্পর্কে আমাদের মানস-সংস্কার ভিন্ন প্রকৃতির।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

নাম-নির্দেশিকা

———